KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৪০৮/৯, [illegible] লেন, [illegible]
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 26/4 27/1 27/3	Year of Publication : Oct - Dec 2005 Jan - March 2006 July - Sept 2006
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, [illegible] সেন	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

শরৎ ১৪১৩

প্রবন্ধ সংকলন

প্রধান সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক ॥ রাহুল সেন

সম্পাদকমণ্ডলী
কলকাতা
পবিত্র সরকার ❖ প্রদীপ দাশগুপ্ত
শান্তিনিকেতন
অরুণ মুখোপাধ্যায় ❖ অনাথনাথ দাশ ❖ স্বপনকুমার ঘোষ

সম্পাদক
রাহুল সেন

প্রধান সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যোগাযোগ কেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল)। কলকাতা - ৬৮।
দূরভাষ : ২৪৭৩ ৩৬০০
চলভাষ : ৯৮৩১৩ ০৯৪০৯

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

রূপারোপ : অভিজিৎ নাথ

প্রাপ্তিস্থান : *পাতিরাম*
দে বুক স্টোর্স

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৬৮ থেকে প্রকাশিত,
'বর্ণনা', ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৩২ থেকে অক্ষরবিন্যস্ত ও
'বর্ণনা প্রকাশনী', ৪/১০এ বিজয়গড়, কলকাতা - ৩২ থেকে মুদ্রিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
শরৎকালীন সংখ্যা
১৪১৩

সূচি

সম্পাদকীয়

রূপান্তর
একরাত্রি (গল্প) ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩
একরাত্রি (গল্প অবলম্বনে নাটক) ❑ সন্তোষ কুমার ঘোষ ৯

চিঠিপত্র
দ্বিতীয়া স্ত্রী এলসাকে লেখা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের চিঠি (প্রতিলিপি) ২১
সাধারণ মানুষ আইনস্টাইন (অনুবাদ ও প্রসঙ্গ নির্দেশ) ❑ রঞ্জিত সেনগুপ্ত ২৩

বিশেষ রচনা
রবীন্দ্রনাথ অভিনীত অনুষ্ঠানের স্মারকপত্র : প্রসঙ্গকথা ❑ পার্থ বসু ১১৩
পুরোনো কলকাতার কোর্ট-কাছারি ❑ অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ১২১

অনুবাদ
নিজের গোলকধাঁধায় রাষ্ট্রপতি ❑ গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস্
(অনুবাদ : অমিতাভ রায়) ১৮৪

গল্প
সব সোনা সোনা নয় ❑ নবেন্দু ঘোষ ২৯
প্রসাদ ❑ বাণী বসু ৫৬

সে এবং জীবনানন্দ দাশ ❑ সমরেশ মজুমদার ৫৯
সোনার বল ❑ সুনীল দাশ ৬৪
উত্তরমেঘের ছায়া ❑ দীপঙ্কর দাস ৭২
আকাশের নীচে ❑ কল্যাণ মজুমদার ৮৩
তৃতীয় পক্ষ ❑ শচীন দাশ ৯২
খসে পড়া পালকের মতো ❑ চিত্ররথ দত্ত ১০৩
দাহন ❑ তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২
দেবী ❑ রবিশংকর বল ১৪৪
আমদরবার ❑ সুব্রত মুখোপাধ্যায় ১৫০
এই পরবাসে ❑ কামাল হোসেন ১৬২
ধনপতির সিংহলযাত্রা ❑ রামকুমার মুখোপাধ্যায় ১৭০
বিলকিস ভালো আছে ❑ অলোককুমার বসু ১৭৫
গতানুগতিক প্রেমের গল্প অথবা পিকাসোর ছবি ❑ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১৯২
দু-রকম জীবন ❑ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০১

বভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

RN 30017/76

Declaration U/S of the Press & Registration of Book Act.

১। **প্রকাশের স্থান** : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮
২। **প্রকাশের কালানুক্রম** : ত্রৈমাসিক
৩। **প্রধান সম্পাদকের নাম** : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদকের নাম : রাহুল সেন
জাতীয়তা : ভারতীয়। **ঠিকানা** : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮
৪। **মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম** : রাহুল সেন
জাতীয়তা : ভারতীয়। **ঠিকানা** : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮
৫। **স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা** :
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও রাহুল সেন। ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮

আমি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বা) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয়

আকাশের শাদা মেঘ দেখে বোঝা যাবে না এই ভূমধ্যপৃথিবীর কালিমা কী পরিমাণ বেড়ে চলেছে। ভোরে সূর্য উঠছে, আলো-উৎসাহিত পাখি যথারীতি বৃক্ষনীড় ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে রৌদ্রের দিকে। কিন্তু আমরা মাটির মানুষেরা খুশি হতে পারছি কই! সংবাদ-পত্রগুলি হয়ে উঠছে ভোর নষ্ট করা দুঃসংবাদপত্র। প্রথম পাতাটি পড়তে আজকাল সত্যি ভয় হয়।

এই শঙ্কা অবশ্য নতুন নয়, গত এক দশক ধরেই কম-বেশি দেশের স্বাস্থ্য মলিন, উদ্বেগেরও। তবু এরই মধ্যে আমরা বত্রিশ বছর পেরিয়ে এলাম। প্রকাশিত হল বিভাবের আটানব্বইতম সংখ্যাটি। এটি মূলত গল্প সংখ্যা। এবার বেশ কিছু স্মরণযোগ্য গল্প প্রকাশ করতে পেরে আমরা তৃপ্ত । এছাড়াও রয়েছে প্রণিধানযোগ্য প্রবন্ধ, অনুবাদ ও অন্যান্য বিশেষ রচনা। আছে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রমাণ। আসলে যোগ্য মানের লেখা সংগ্রহ ও তার নির্ভুল মুদ্রণ খুব সহজ কৃত্য নয়।

আগে শোনা যেত শরৎকাল রাজাদের মনে পররাজ্যলোলুপতা বৃদ্ধি করে। এই সময়ে তাঁরা হিংসার প্রশ্রয়ে, পরের রাজ্য জয়ের লক্ষে বেরোতেন। এখন তো সব ঋতুতেই দেখছি আমেরিকা এর-ওর-তার দেশে শুধু নাক নয়, ধ্বংসের নানা উপাদান নিয়ে ইচ্ছে হলেই গলে যাচ্ছে। নিজেরা সন্ত্রাসবাদের জনক হয়ে কাগজের সমস্ত সংবাদকে করে তুলছে দুঃসংবাদ। তাদের মৌখিক সন্ত্রাসবাদের নিন্দা এখন কেউই আর বিশ্বাস করছে না।

অল্প কিছুদিন আগে প্রয়াত হলেন দুই বাংলার এবং বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল নিকট অগ্রজ-অনুজের মতো। বিভাবের প্রত্যেকটি বিশেষ কবিতাসংখ্যার জন্য পরম আগ্রহে এবং যথাসময়ে শুধু কবিতাই দিতেন না, প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে অতি ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে সদ্য রচিত কবিতাবলী থেকে বেছে নেবার অধিকারও দিতেন। এ এক অভাবনীয় পক্ষপাত। আশ্চর্য, এমন একজন মহৎ কবিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হল না। এই অবিশ্বাস্য অমর্যাদার জন্য কোনো হতাশাই যথেষ্ট নয়। আমাদের পরম সৌভাগ্য পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রতিনিয়তই কবি সাহিত্যিকদের যে মর্যাদা দেন, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমরা আর কখনোই তা পাইনি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে মৃত্যুর পর যে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্মানিত করা হয়েছিল, সে-জন্য পশ্চিমবঙ্গের কবিরা চিরকাল তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও প্রয়াত শামসুর রাহমানকে অপরিসীম মর্যাদায় স্মরণ করেছিলেন। স্মরণসভায় উপস্থিত থাকাই শুধু নয়, নিজে শামসুরের

দুটি সময়োচিত কবিতাও পাঠ করেছিলেন বুদ্ধদেব। শামসুরের প্রয়াণ-সংবাদ বাংলাভাষার সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সাম্প্রতিককালে আরেকটি মৃত্যু আমাদের গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। 'প্রমা' সম্পাদক সুরজিৎ ঘোষ অকালেই চলে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উজ্জ্বল ছাত্র, পেশায় একদা ইঞ্জিনিয়ার সুরজিৎ সবকিছু ত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এর জন্য ব্যক্তিগত জীবনেও তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। নাটক, কবিতা থেকে শুরু করে, সাহিত্যের এমন কোনো অঞ্চল ছিল না, যে-সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন। নিজে যোগ্য কবি হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত কম লিখে তিনি 'প্রমা' সাহিত্যপত্রের মাধ্যমে সাহিত্যসেবাকেই শেষজীবনে শ্রেয় মনে করতেন। অসুস্থ হবার পর নিজে কবিতালেখা প্রায় থামিয়েই দিয়েছিলেন। যে নাটক তাঁর পরম প্রিয় বিষয় ছিল, সেখানেও আর তেমন আগ্রহ দেখা যেত না। কিংবদন্তিতুল্য ছিল তাঁর সাহিত্যস্মৃতি। নিকটকালে বাংলা সাহিত্যের এমন স্মৃতিধর কোনো দ্বিতীয় মানুষ অন্তত আমাদের স্মৃতিতে নেই। সুরজিৎ ঘোষকে আমরা চিরকাল মনে রাখব।

বিভাবের আগামী সংখ্যাই বিশেষ কবিতাসংখ্যা।

বইমেলার কাছাকাছি সময়েই তা প্রকাশিত হবে। এখানেই কবিদের সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিই, তাঁরা যেন স্পষ্টাক্ষরে পাতার একদিকে পাঠযোগ্য হস্তলিপিতে লেখার কপিটি পাঠান। বিভাবের শততম সংখ্যাটি বিশেষ পরিকল্পনায় প্রকাশিত হবে এপ্রিল বা মে মাসের কোনো এক সময়ে। দু-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে আমরা তা স্মরণ করব। এ-সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হবে।

পরিশেষে পাঠক, আমাদের শুভানুধ্যায়ী, সকল সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের শরৎ ঋতুর শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আকাশের শাদা মেঘ, এই কালো হতে থাকা সমতল মাটি, আমাদেরও কিছুটা শাদা করুক আর অর্থহীন নির্বোধ বারুদের হিংসা অবসিত হোক এই প্রার্থনা।

বিনীত নমস্কারান্তে
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
প্রধান সম্পাদক : বিভাব

সম্পাদকীয় সংযোজন : আজ থেকে একশো চোদ্দো বছর আগে ১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ 'একরাত্রি' গল্পটি লিখেছিলেন। বর্তমান সময় থেকে বছর তিরিশ আগে (আনুমানিক) সন্তোষকুমার ঘোষের মনে হয়েছিল একক বাচিক অভিনয়ের জন্য এই গল্প অবলম্বন করে একটি নাটিকা লেখা চলে। নিজস্ব মনন, মেধায় ও অনুপম গদ্যশৈলীতে সন্তোষকুমার তা লিখে ফেলেন। এই সর্বাংশে আধুনিক মানুষটি তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্মেও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় রেখে গিয়েছেন। বাংলা সংবাদপত্রের নতুন চরিত্রনির্মাণে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সাংবাদিক জীবন তাঁর সাহিত্যজীবনের পূর্ণবিকাশ কিছুটা অবশ্যই রোধ করেছিল। এটা বাংলা কথাসাহিত্য পাঠকদের কাছে এক চিরস্থায়ী ক্ষোভ।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পগুলির তুলনায় 'একরাত্রি' কিছুটা যে দুর্বল, তাঁর সমালোচকেরা একবাক্যে এ-সত্য স্বীকার করেন। কেউ কেউ গল্পটিকে অসম্পূর্ণও বলেছেন। তবু সন্তোষকুমার ঘোষ রূপান্তরের জন্য কেন এই গল্পটিকেই বাছলেন সেটা খানিকটা বিস্ময়ই জাগায়! এই রূপান্তরে সন্তোষকুমারের এক অতি উন্নত বিশ্লেষণী মননের পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পের মূল প্রতিপাদ্যটি তাকে নিশ্চিত আকর্ষণ করেছিল।

রবীন্দ্রপ্রাণ সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর এই অপ্রকাশিত রচনাটি প্রথম পাঠ করেন তার প্রধান সহকারী রাধানাথ মণ্ডল আয়োজিত এক গল্পসভায়। পরে অন্য কোথাও পাঠ করেছিলেন কি না তা আমাদের জানা নেই। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের মূল গল্পটির, পরে সন্তোষকুমার ঘোষের অপ্রকাশিত রচনাটি ছাপা হল। সন্তোষকুমার ঘোষের কন্যা, খ্যাত সাংবাদিক শ্রীমতী কাকলী চক্রবর্তীর সৌজন্যে এই অপ্রকাশিত রচনাটি আমরা পেয়েছি। তাঁকে কৃতজ্ঞতা , উভয় লেখকেরই বানানরীতি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রাখা হল।

গল্প
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্প অবলম্বনে নাটক
সন্তোষকুমার ঘোষ

একরাত্রি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউ-বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড়ো যত্ন করিতেন এবং আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, "আহা, দুটিতে বেশ মানায়।"

ছোটো ছিলাম কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম বুঝিতে পারিতাম। সুরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবি ছিল, সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকলরকম ফরমাশ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গৌরব ছিল না, — আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধুরী-জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারির-সেরেস্তার কাজ শেখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি মনে মনে তাহাতে নারাজ ছিলাম। আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ অত্যুচ্চ ছিল — কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি তো জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব, ইহা আমি মনে মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

সর্বদাই দেখিতাম, আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন — নানা উপলক্ষে মাছটা তরকারিটা টাকাটা শিকেটা লইয়া যে তাঁহাদের পূজার্চনা করিতে হইত তাহাও শিশুকাল হইতে আমার জানা ছিল, এইজন্য আদালতের ছোটো কর্মচারী এমন-কি পেয়াদাগুলাকে পর্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে খুব একটা সম্ভ্রমের আসন দিয়াছিলাম। ইঁহারা আমাদের বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা। তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নূতন সংস্করণ। বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইঁহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর ঢের বেশি,— সুতরাং পূর্বে গণেশের যাহা কিছু পাওনা ছিল, আজকাল ইঁহারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া একসময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতায় পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম, তাহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধ্যয়নের সাহায্য পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া যথানিয়মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণ-বিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কী করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না।

কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনো ত্রুটি ছিল না। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে, কলিকাতার ইঁচড়ে-পাকা ছেলের মতো সকল জিনিসকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই, সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না-খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টো টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বেঞ্চি চৌকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। শহরের ছেলেরা এই-সব লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙাল বলিত।

নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হইয়া সুরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন।

আমি পনেরো বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় পালাইয়া আসি, তখন সুরবালার বয়স আট; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে আমার বিবাহের বয়স ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এদিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব—বাপকে বলিলাম, বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।

দুই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনবাবুর সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।

এন্ট্রেন্স পাস করিয়াছি, ফার্স্ট আর্টস দিব, এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই, মাতা এবং দুটি ভগিনী আছেন। সুতরাং কালেজ ছাড়িয়া কাজের সন্ধানে ফিরিতে হইল। বহু চেষ্টায় নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোটো শহরে এন্ট্রেন্স স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম, ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগ্‌জামিনের তাড়া ঢের বেশি। ছাত্রদিগকে গ্রামার অ্যাল্‌জেব্রার বহির্ভূত কোনো কথা বলিলে হেডমাস্টার রাগ করেন। মাস-দুয়েকের মধ্যে আমার উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল।

আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে ল্যাজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে; লম্ফে-ঝম্ফে আর উৎসাহ থাকে না।

অগ্নিদাহের আশঙ্কায় একজন করিয়া মাস্টার স্কুলের ঘরেতেই বাস করিত। আমি একা মানুষ, আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বড়ো আটচালার সংলগ্ন একটি চালায় আমি বাস করিতাম।

স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূরে। একটি বড়ো পুষ্করিণীর ধারে। চারিদিকে সুপারি নারিকেল এবং মাদারের গাছ, এবং স্কুলগৃহের প্রায় গায়েই দুটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধ নিমগাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে।

একটা কথা এতদিন উল্লেখ করি নাই এবং এতদিন উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারি উকিল রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুলঘরের অনতিদূরে। এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী — আমার বাল্যসখী সুরবালা — ছিল, তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। সুরবালার সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল, তাহা রামলোচনবাবু জানিতেন কিনা জানি না, আমিও নূতন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করিলাম না। এবং সুরবালা যে কোনোকালে আমার জীবনের সঙ্গে কোনোরূপে জড়িত ছিল, সে-কথা আমার ভালো করিয়া মনে উদয় হইল না।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচনবাবুর বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। মনে নাই কী বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, বোধ করি বর্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে। তিনি যে সেজন্য বিশেষ চিন্তিত এবং ম্রিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিষয়টা এমন যে তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘণ্টাখানেক-দেড়েক অনর্গল শখের দুঃখ করা যাইতে পারে।

এমন সময়ে পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খস্‌খস্‌ এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝিতে পারিলাম জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতূহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল — বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশবপ্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখিপড়ি যাহা করি কিছুতেই মনের ভার দূর হয় না; মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মতো হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন। মনের মধ্যে হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সুরবালা কোথায় গেল।

আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, আমি তো তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্যে বসিয়া থাকিবে।

মনের ভিতরে কে বলিল, তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না। সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।

আমি বলিলাম, তা থাক্‌-না, সুরবালা আমার কে।

উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত।

সে-কথা সত্য। সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত, — সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ। আর, একটা রামলোচন কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত; কেবল গোটা-দুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরবালাকে পৃথিবীর আর-সকলের নিকট হইতে একমুহূর্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাহি না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন-মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত। রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে-সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ-কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসংগত এবং অন্যায় তাহা স্বীকার করি কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোনো কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপুরবেলায় ক্লাসে যখন ছাত্রেরা গুন্ গুন্ করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত ঝাঁ ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিমগাছের পুষ্পমঞ্জরির সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত — কী ইচ্ছা করিত জানি না — এই পর্যন্ত বলিতে পারি, ভারতবর্ষের এই-সমস্ত ভাবী আশাস্পদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন করিয়া জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিত না।

স্কুলের ছুটি হইয়া গেলে আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকিতে মন টিকিত না, অথচ কোনো ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেও অসহ্য বোধ হইত। সন্ধ্যাবেলায় পুষ্করিণীর ধারে সুপারি-নারিকেলের অর্থহীন মর্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতাম, মনুষ্যসমাজ একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাঁজ করিতে কাহারো মনে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।

তোমার মতো লোক সুরবালার স্বামীটি হইয়া বুড়াবয়স পর্যন্ত বেশ সুখে থাকিতে পারিত, তুমি কিনা হইতে গেলে গারিবাল্‌ডি এবং হইলে শেষে একটি পাড়াগেঁয়ে স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার। আর, রামলোচন রায় উকিল, তাহার বিশেষ করিয়া সুরবালার স্বামী হইবার কোনো জরুরি আবশ্যক ছিল না; বিবাহের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার পক্ষে সুরবালাও যেমন ভবশংকরীও তেমন, সেই কিনা কিছুমাত্র না ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিবাহ করিয়া সরকারি উকিল হইয়া দিব্য পাঁচটাকা রোজগার করিতেছে — যেদিন দুধে ধোঁয়ার গন্ধ হয় সেদিন সুরবালাকে তিরস্কার করে, যেদিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়। বেশ মোটাসোটা, চাপকান-পরা, কোনো অসন্তোষ নাই, পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া কোনোদিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।

রামলোচন একটা বড়ো মকদ্দমায় কিছুকালের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। আমার স্কুলঘরে আমি যেমন একলা ছিলাম সেদিন সুরবালার ঘরেও সুরবালা বোধ করি সেইরূপ একা ছিল।

মনে আছে সেদিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া হেড্‌মাস্টার

সকাল সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ যেন একটা কী মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরদিন বিকালের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। যত রাত্রি হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে চলিল। প্রথমে পূর্বদিক হইতে বাতাস বহিতেছিল, ক্রমে উত্তর এবং উত্তরপূর্ব দিয়া বহিতে লাগিল।

এ রাত্রে ঘুমাইবার চেষ্টা করা বৃথা। মনে পড়িল, এই দুর্যোগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। আমাদের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবুত। কতবার মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি পুষ্করিণীর পাড়ের উপর রাত্রিযাপন কবির। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা-দেড়টা হইবে হঠাৎ বানের ডাক শোনা গেল — সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। সুরবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদের পুষ্করিণীর পাড় — সে পর্যন্ত যাইতে না-যাইতে আমার হাঁটুজল হইল। পাড়ের উপর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বিতীয় আর-একটা তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের পুকুরের পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ-এগারো হাত উচ্চ হইবে।

পাড়ের উপরে আমিও যখন উঠিলাম, বিপরীত দিক হইতে আর-একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত বুঝিতে পারিল। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর-সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল হাত-পাঁচছয় দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে — তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না — কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না।

কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা, কোন্-এক জন্মান্তর, কোন্-এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া, এই সূর্য-চন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল; আর, আজ কতদিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ংকর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্রোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে — এখন কেবল আর-একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু হইতে খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আসুক। স্বামীপুত্রগৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক। আমি এই একরাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল — ঝড় থামিয়া গেল, জল নামিয়া গেল — সুরবালা কোনো কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোনো কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্‌ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল — আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

একরাত্রি

(রবীন্দ্র-কাহিনী অবলম্বনে কল্পনাট্য)

সন্তোষকুমার ঘোষ

Theme Music : পুরোনো সেই দিনের কথা

আজ এই মঞ্চে একা আমি। কিন্তু কবে যেন, কে যেন আমাকে বলেছিল, এত উঁচু করে কাপড় পরেছিস কেন? তোর পায়ের গোছ আর হাঁটু — সব দেখা যাচ্ছে।

আমি কী বলেছিলাম? বলেছিলাম এই যে, কেন আমি যখন ফ্রক পরি?

সে নাছোড়বান্দা, বলেছিল, তখন তো তুই ছোট্ট খুকিটি। এখন যে তুই আমার বউ! দে দে, ওই খাটো আঁচলটাকে যতটা পারিস সামলে মাথায় তুলে দে। ওকে ঘোমটা বানা।

(একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে)

আসল ব্যাপারটা কী জানেন? আসল ব্যাপারটা এই, আমরা তখন বউ-বউ খেলতাম। পাঠশালায় যেতাম একসঙ্গে। সেই এক বয়স। থাকেনি। পিছলে কোথায় কোথায় কত দূরে কে জানে, চলে গেছে। হয়তো আকাশে। হয়তো সমুদ্রে। হয়তো সময় নামে রাক্ষসটা সেই বয়সটা গ্রাস করে ফেলেছে।

ফেলেছে তো ফেলুক, আমি সেই বয়সসমেত সময়টাকে ফিরিয়ে আনি। যখন পাঠশালায় ঢং ঢং ছুটির ঘণ্টা পড়লেই বাড়ির দিকে হাঁটা দিতাম সে আমার পাশে আছে কি নেই, খেয়ালও করতাম না। কড়া নাড়লে দরজা খুলে দিতেন আমার মা। বলতেন, এসেছিস? বলতাম, দেখতে পাচ্ছো না, এসেছি? তখন আসাটাকে মস্ত একটা ব্যাপার বলে জানতাম। আসার পরে যে যাওয়াও থাকে, এসব বোধ, অভিজ্ঞতা হয়নি তখনও।

তখন আমার পাশে সে। মা বলতেন, আহা, দুটিতে বেশ মানায়। ছোট ছিলাম তখন, কিন্তু মেয়ে কিনা তাই পাকাও ছিলাম। মানানোর মানেটা বুঝতাম। পুরোপুরি বুঝতাম কিনা জানি না, শরীরের শিরাগুলো তখন এত চেঁচাত না তো! তাই মানানোর সঙ্গে খালি মনকে মিলিয়েছিলাম।

Music

পুরোনো সেই দিনের কথা আজ আবার বলছি, বলতে খুব ভালো লাগছে, অথচ ভীষণ খারাপ লাগছে। এই ভালো আর খারাপ একসঙ্গে লাগার ব্যাপারটা আপনাদের কী করে বোঝাই বলুন তো? কী করে বোঝাই আমি, যে-আমি এক মফস্বলের সরকারী উকিলের স্ত্রী। পতিই যার ব্রত, এমন এক পতিব্রতা আমি। লালপেড়ে শাড়ি, কপালে সিঁদুর, আমাকে কিংবা আমাদের আপনারা অনেকবার দেখেছেন। এই যুগে সাজ যদিও-বা বদলে থাকে, কিন্তু ভিতরটা বদলায়নি।

আলোকসম্পাতকারী, অন্তরীক্ষে যে-যেখানে আছো, আরও আরও আলো ফেলো। লাল, হলুদ, কামরাঙ্গা। এই গল্প যতক্ষণ বলছি, ততক্ষণ সরকারী উকিল, রামলোচন মুছে যাক। সে আসুক।

মা, আমার মা বলতেন, দুটিতে বেশ মানায়! যা মানায়, তা হয় না কেন? আমি না হয় তখন খুব মুকুলিকা বালিকাবয়সী। কিন্তু সেই মুকুল প্রজাপতি পাখার সঙ্গে মিলে মিলে উড়ে যেতে পারল না কেন?

গান : মৌমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,/ পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা... ইত্যাদি।

মুকুল আজ ফুটেছে, ছোট্টটি আজ বড়ো হয়েছে বলেই বলছি। চাওয়াগুলো পাওয়া হয় না কেন? *(চিৎকার করে)* কেন, কেন, কেন? তার তো দাবি ছিল। আমার উপর আর সকলে যত, তার চেয়ে বেশি বলব না, তবে বিশেষ দাবি। তার ছিল। সেই ধারণা আমার মনের মাটিতে শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছিল। প্রবেশ করেছিল অন্ধকার স্তরে স্তরে সব ভেদ করে। সেই ভেদ করাটা অন্ধকার না আলো? না, আমি আজও জানি না।

খুব শক্ত হয়ে যাচ্ছে? তবে একটু বউ-বউ খেলি! ধরো, আমি তোমাকে একটা চিমটি কাটলাম। তুমি আমার দুটো পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিলে। দূর বোকা!

আমি এখন শাড়ি পরে আছি না? পা ধরে টান দিলে শাড়িসুদ্ধ অনেকখানি যে উঠে যাবে! এই বয়সে যদি বা মানায়, এই পোশাকে মানাবে না।

আমার বোন ছিল। তার ছিল গানের গলা। মাঝে মাঝে জানালার বাইরে কার যেন বাঁশি শুনতাম। বোনকে বলতাম, ও কে রে? সে বলত, তুমি জানো না দিদি? বলে যার নাম বলত, মনে মনে কত দিন থেকে সে আমার সে।

গান

আমার বোন ওই বাঁশির সুরে যে-গান তার কথাও জানত। সে সুর করে বলত, মধুযামিনী রে দুজনে দেখা হল।

আমার ভালো লাগত। তখন এসব গান বেশি শুনিনি তো। তাই একটু অচেনা, একটু অজানা লাগত। অচেনা আর অজানাকেও যে ভালো লাগে, সেই প্রথম জানলাম।

ওই গানটার আমার সবচেয়ে ভালো লাগত সেই জায়গাটা কিন্তু নয়, যেখানে মধুযামিনীর কথা আছে। বয়স তো ওই, শিক্ষাদীক্ষা তার চেয়ে বেশি নয়। সব চেয়ে ভালো লাগত সেই অংশটা, যেখানে আছে — কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ধীরে।

আমি অবিশ্যি আমার বোনকে এসব বুঝতে দিতাম না। বলতাম, এটা আবার কী হল? দুজনে দেখা হল, আকাশে জ্যোৎস্নাও ছিল, কিন্তু কেউ কাউকে কিচ্ছু বলল না? এ কি হয়? দুজনে গেল ফিরে?

আমারই তো বোন। এসব প্রশ্নের উত্তর ও জানবে কোত্থেকে? আমার মনে একটু বৃষ্টি ঝরত, আর একই সঙ্গে একটা না-বুঝ হাওয়া বয়ে যেত। আমার বোন অবিশ্যি এসব কিছু টের পেত না, সে শুধু গেয়ে যেত। আর ওই বাঁশি? বাজত বাজত, বাজতেই থাকত।

যাঁরা দেখছেন, তাঁরা বুঝতেই পারছেন, আমি সেই বয়স আর এই বয়স — দুটোকে মিলিয়ে সংলাপ তৈরি করছি। আমি সবজান্তা কিনা, আমি জানি, আপনারা বালিকা বধূকে নেন, যুবতী প্রেমিকাকে দেখে যে-যাঁর সিটে বসে আছেন সেই সিটে বসে একটু সকলের নজর এড়িয়ে চনমনে হন, কিন্তু বালিকা আর যুবতীকে মেলানোর ব্যাপার? আপনারা নেবেন কি নেবেন না, আমি নিজেই জানি না।

নাই-বা নিলেন, বয়েই গেল। আমি, এই আমি যুবতীর শরীর নিয়ে আপনাদের জ্বলজ্বলে চক্ষের সমক্ষে সমুপস্থিত। কিন্তু আমার মন বালিকার। অন্তত সেই মনকে ফিরিয়ে আনতে চাইছি। বয়সকে বধ করেছি। সময়কে করেছি দালাল।

কার কথা বলব? *(হাতের মুদ্রা দেখিয়ে)* আমার কথা বলা হল না, হল না। তবে কি তার কথা? সে কে, কী, কোথায়, তাই-ই জানি না। কবি হলে বলতে পারতাম তুমি কোথায় ছিলে, কবে ছিলে, হে দিব্যরূপী, তোমার নাম জানি না। এখনকার স্বর? তাও না। এটুকু জানি, আর কিছু যেন হওয়ার কথা ছিল আমার। অন্য কোথায় যেন যাওয়ার কথা ছিল। কোথাও যাইনি। কিচ্ছু হইনি।

কিচ্ছু না? বোধ হয় একটু ভুল বললাম। অন্তত ওই যে, পর্দায় দেখুন, সরকারী উকিলের ছবি। ওঁর নাম রামলোচন। উনি আমার স্বামী।

আচ্ছা, উনি আমার স্বামী হলেই আমি কি ওঁর স্ত্রী হয়ে যাই? ঠিক বুঝতে পারছি না। এই বহাল নিয়মের কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে। সামান্যি মেয়েমানুষ আমি ধরব কী করে?

Music : আধুনিক সুর

জানি জানি, হাওয়া পালটেছে। এখন কোনও নারী যদি নিজেকে বিবাহিতা জেনেও নিজেকে কোনও স্বামীর সর্বতোভাবে স্ত্রী বলে জ্ঞান না করে, তাহলেই সে এমন কিছু অসতী হয়ে যায় না। সতীত্ব আর অসতীত্ব বিচারের ধরন-ধারণই বদলে গেছে।

(গলা অবধি ঘোমটা টেনে)

আমাদের সময় কিন্তু এরকম ছিল না মশাইরা। সাত পাক ঘোরা হল তো ব্যাপারটা বরাবরের মতো পাকাপাকি হয়ে গেল। সেই পাকা বন্দোবস্তে যদি পচ্‌ও ধরে, তবু তো খোলে না, খুলত না। অন্তত আমাদের সময় তো নয়ই।

ভাবছেন আমি অসুখী? দূর! তাহলে তো গল্পটা একেবারে সোজা আর শস্তা হয়ে যেত। জাঁদরেল উকিলদের বউয়েরা কখনও অসতী হয়? তারা তৃপ্ত, তারা পূর্ণ, তারা সুখী। আমিও তা-ই। তবু

(হঠাৎ ঈষৎ উদ্বেলিত আকুল গলায়)

কোনও দূর কেন আমাকে মাঝে মাঝে ডাকে ডাকে ডাকে? গাছের পাতায় পাতায় কী যে ফিসফিস চক্রান্ত হয়, জোয়ারের ঢেউয়ের জলে জলে কী সব বলাবলি চলে, আমি শুধু একটা ইশারা শুনতে পাই। রোজ নয় ভাগ্যিস।... মাঝে মাঝে। ... কখনও কখনও। সব সময় হলে আমি তো আর এখানে থাকতাম না, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে যেতাম, জোয়ারের জলের ঢলে যেতাম ভেসে। ওই ফিসফিস আর ওই কলকলের মজা এইটেই যে, ওরা একেবারে ঘরছাড়া করে না। যেখানেই থাকি সেখানে রাখি। খালি মাঝে মাঝে খোঁপাসুদ্ধ মাথাটা একটু নাড়িয়ে দিয়ে যায়, খালি এলো চুলকে বাতাসে ভাসায়। কিন্তু আমার সমস্তটাকে নয়।

Music

কিন্তু তার কথা এত দিন পরে মনে পড়ল কেন? সে রূপবান বলে? সেই বয়সেই সে ভেবেছিল সে আমার প্রভু আর আমি তার দাসী। ঠিক বলছি কি? এত দিন পরে ভুল হতেও পারে। স্মৃতির এই বড়ো মজার খেলা। অনেক মাঝের পৃষ্ঠা সে চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেলে, কিন্তু আগেকার বেশ কয়েকটা পাতা রেখে দেয়। এ কি দয়া না এ কি মায়া? আসলে স্মৃতি কোনও স্বেচ্ছাচারিণী নারী, তার খেয়াল-খুশি মতো যা ইচ্ছে তাই রক্ষণ বা ভক্ষণ করে।

সে যা চায় না, আমাদের মনে, মনের গহনে তার ছায়ামাত্র থাকে না। থাকে মাত্র তা-ই, আমরা যা পুষি বেড়ালের মতো পুষে রাখতে ভালোবাসি।

(খোঁপা খুলে চুল এলোমেলো করে দিয়ে)

তাহলে আসল ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? স্মৃতি আমাদের কর্ত্রী না দাসী? আমরা তার ইচ্ছে তামিল করি না সে তামিল করে আমাদের ইচ্ছেদের?

(আলতো হেসে)

কোন্ ইচ্ছে? না, যাদের মন-বনবাসে পাঠিয়েছি। তারা জ্যান্ত না মৃত, সাধারণত ভেবেও দেখি না।

রোজ সকালে উঠি, বাথরুমে যাই, প্রাতঃকৃত্য সারি। তারপর চুল আঁচড়ানো, তার পরে বা আগে পোশাক বদলানো। পোশাক? সে তো খোলস, শুধু খোলস। আর? আর যত্ন করে মুখে প্রলেপ, ফাউনডেশন তৈরি হলে তবে টিপ!

আমাদের কালেও এসব ছিল, তবে রকমটা ছিল আলাদা।

(মাথা চুলকে)

কিন্তু স্মৃতির কথা কী বলছিলাম না? আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, স্মৃতি আসলে একটা পুকুর, তার টলটলে জলে অনেক মরা মাছ ভেসে উঠে আসে। আর যার কথা ভাবছি, সেই লোকটি মরা না জ্যান্ত?

জ্যান্ত নিশ্চয়ই। নইলে অনেক দিনের অনেক কথা আমার মনে পড়বে কেন?

মনে পড়ছে তার উপর আমি অত্যাচারও করতাম। সে ভাবত সে আমার প্রভু। তার বাবা যে চৌধুরী জমিদারের নায়েব! হাতটা পাকুক, তিনি ভেবেছিলেন সেরেস্তার কাজ শিখিয়ে কোথাও না কোথাও নিদেন একটা গোমস্তাগিরিতে নিশ্চয় বহাল হবে।

সত্যি কথা বলব? আমার কিন্তু ওই সব গোমস্তা-টোমস্তা ভালো লাগত না। আমি ভাবতাম, ও কেন কলকাতায় পালিয়ে যাচ্ছে না? মনে মনে ছবি দেখতাম, আমার সে কলকাতায় কলেজে লেখাপড়া-টড়া না শিখুক অন্তত জজ আদালতে হেড্ ক্লারক্ হয়েছে। আমি নিশ্চয় জানতাম না, তবে নিশ্চয়ই মানতাম।

তাছাড়া চোখের উপর সর্বদাই দেখতাম কিনা, আদালতের এঁটো যারা চেটেপুটে খায়, লোকে তাদের ঘেন্না করে না। ঘেন্না করা তো দূরে থাক, বরঞ্চ সম্মান করে। নানা উপলক্ষে এবং নানা উৎসবে হাজারো ছুতোয় দেখতাম যে, মাছটা, তরকারিটা, টাকাটা, সিকেটা সব

তাদের দরজায় গিয়ে পৌঁছোচ্ছে। দেবতাদের চেয়ে সেবায়েত আর পুরুতদের খাতির-টাতির আর সম্মান যে বেশি, আমি তখনই টের পাই।

যদি আমার বাবা বেঁচে থাকতেন, তবে গোটা ব্যাপারটাই আপনাদের একেবারে চাক্ষুষ দেখাতাম। ওই দেখুন, তিনি ছোট আমলা থেকে শুরু করে পেয়াদাদের পর্যন্ত সেলাম ঠুকছেন। ওঁরা সম্ভ্রমের ডালি ছুঁচ্ছেন কি ছুঁচ্ছেন না, পায়ে ঠেলছেন কি ঠেলছেন না — সবই ভড়ং। দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটিকে বলে, ওই বয়সেই টের পেয়েছিলাম, তাদের সংখ্যা আরও কোন্ না হাজার দশ কি পনেরো হয়।

Music

সত্যিই তো সিদ্ধিদাতা বলে গণেশ যদি দেবতা হন, তবে এঁরাই বা হবেন না কেন? লোকের মনস্কামনা সিদ্ধ করতে এঁরা কম যান নাকি? দেবতারা তবু বিশ্বাসের বস্তু, দেবতারা তবু কাল্পনিক, এই নাজির আর আমলারা একেবারে রক্তমাংসের মানুষ। আমি ভাবতাম আহা, আমি ভাবতাম, আমার ও যদি কমপক্ষে কোনও কালেকটর সাহেবের নাজিরও হয়! তাহলে সব পাওনা ওরই হত। আর আমার কাছে যা কিছু পাওনা? তা তো ওকে আমি দিতামই।

একটু সবুর করুন। একটানা স্পিচ্ দিয়েছি তো, এবার একটু জল খাই। গলাটা আরও সাফ করে ফেলি। সে, আমার সে কিন্তু পালিয়ে কলকাতায় গেল না। আমি যে-লাইনটা ভেবেছিলাম, সেই লাইনটাই সে ধরল না। এর-ওর মুখে শুনতে পাই, সে তখন মোটা ধুতি, খাটো কুর্তা পরে, সভাসমিতিতে যোগ দেয়, আর কী কী বলে যেন, শোভাযাত্রাতেও সকলের আগে থাকে। দেশের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে তার এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু ভয় নেই। শুনতে পেতাম, উঁচু উঁচু মঞ্চ থেকে সে প্রায়ই এই কথা বলত। কিন্তু আমার প্রাণ? সেকথা সে তখন ভাবত কি? জানি না। এইটুকু জানি, তখন যারা জান কবুল করেছিল, তাদের বেশির ভাগ কবুল করেছিল শুধু কথায়। সত্যি সত্যি প্রাণদানের দৃষ্টান্ত ক'জন আর দেখিয়েছে? সে, আমার সে যে দেখায়নি, তার জন্যে আমার কিছুমাত্র আফশোস নেই। সত্যি সত্যি প্রাণ দেওয়া? সে যে বড্ড দুঃসাধ্য ব্যাপার! ক'জনই বা পারে? আসল কথা ইচ্ছা, আসল কথা নিষ্ঠা, আসল কথা ঘোষণা। সেখানে তার কোনও ফাঁকি ছিল না। শুনতাম চাঁদার খাতা নিয়ে খাওয়া নেই দাওয়া নেই, দুপুর রোদ্দুরে টোটো করে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়ানো, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন বিলি করা — এই সবই সে ব্রত করেছিল। তাছাড়া মাঠে-ময়দানে, সভায়, চৌকির উপর বেনচ সাজানো — এসব কাজ তো ছিলই।

একবার নাকি ওদের নেতাকে নিয়ে কে একটা হালকা মশকরা করে, তাতে সবাই মজা পায়, কিন্তু খেপে যায় সে, আমার সে। একটা ছোটখাটো দাঙ্গাও নাকি হয়। ওর মাথায় বাঁধা কাপড়ের পট্টি আমিই একদিন জানলা থেকে দেখেছিলাম। এটা যদি স্মৃতিচারণ না হত, তবে দেখাতে পারতাম আপনাদেরও।

তারপর? তারপর একদিন শুনি, সে আর নেই। সে কলকাতায়।

এইবার একটু রোমানটিক টিউন বাড়ুক। কেননা সে আর ফিরে এল না। কিন্তু আমার বয়েস বাড়ল, বাড়তেই থাকল। ক্রমে গিয়ে ঠেকল পনেরোয়। তখনকার পক্ষে সেটা বড়ো বিষম বয়েস। বিষম, এই অর্থে যে, কী বাপ কী মা, মেয়ের বয়স পনেরো ভাবলে বিষম খান।

এখন একটু সানাই শুনুন। মানেটা বুঝতে পেরেছেন? সরকারী উকিল রামলোচনবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। গল্পটা এমনিতে তো আপনাদের বোঝাতে পারব না! তাই রামলোচনবাবুর নামটা বারবার মুখে আনলাম। খুব পাপ হল কি? বোধ হয়, হয় না।

পাপ বরং হল তার। যে তখনও কলকাতায়। ওই সানাই, শাঁখ আর উলুর শব্দ সে শুনতে পেল না বলে। তবে আমি তার সব খবরই রাখতাম। ইতিমধ্যে এনট্রানস্ পাশ করেছে সে, ফারসট্ আরটস্ দেবে, দেবে। সাংসারিক অনেক ঝামেলায় সে জড়িয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে একটা তার বাবার মৃত্যু। সেটা শোক। শোকের উপর সমস্যা এই যে, বিধবা মা আর দুটি বোন। শুনেছিলাম, পড়ায় ইস্তফা দিয়ে সে এখন কাজের ধান্ধায় ঘুরছে।

তারপর? আমাকে আর জিজ্ঞেস করবেন না। তারপর সব ফাঁকা। লোকের মুখে যেন শুনেছিলাম, শুধু পড়াশুনো নয়, পতিত ভারতের উদ্ধারের জন্যে চাঁদা আদায়ও বন্ধ করে দিয়েছে সে, দরখাস্তের পর দরখাস্ত লিখে শেষ পর্যন্ত একটা ইশকুলে মাঝারি মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছে। সেটা কোন্ ইশকুল, শহরে না গ্রামে, কলকাতায় না মফস্বলে, কোনও খবরই আমি পাইনি।

তবে উকিলের বউ তো! ইতিমধ্যে জীবনের সঙ্গেও আমার অনেকবার মুখোমুখি মোলাকাত হয়ে গেছে। এইটুকু জেনেছি, মাঝারি মানুষেরা বড়ো জোর ছেলে-পড়ানোর মাঝারি চাকরিই পায়। যে সেনাপতি হবে ভেবেছিল, সে এক-একটা ছাত্রকে দেশের ভাবী সৈন্যাধ্যক্ষ করে তুলবে, গড়ে দেবে ভারত, এই সব ভাবে আর মনে মনে সেই ভাবনার আফিম খায়।

ভাবী ভারতবর্ষের চেয়ে আজকের এগজামিন তাদের কাছে অনেক বড়ো। আদর্শের চেয়ে বড়ো স্বার্থ। গোড়ায় যদি-বা উৎসাহ থাকে, পরে সব থিতিয়ে আসে।

ছাত্রদের অ্যালজেব্রার বদলে অন্য কোনও কথা বললে হেডমাস্টারমশাই রাগ করেন। তাঁর অদৃশ্য বেত মাস্টারমশাইদের পিঠেও পড়ে।

কল্পনা অতএব শুকোয়। শুকোয়, ঝ'রে পড়ে, মিইয়ে যায়। গরুদের দিয়ে চাষ করা হয় আমরা জানি। কিন্তু চাষও করছে গরু, লাঙলও খুব বিনয়ী গোকুলের হাতে, একি বিয়ের পরে নোয়াখালিতে না গেলে আমি জানতে পারতাম?

স্কুলটা যে ছিল আমার বাড়ির পাশে। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি, তাই হাতে সময় ছিল অফুরন্ত। ইশকুলের লাগোয়া একটা চালায় মাস্টারদের আস্তানা, আর আমাদের বাসা ঠিক তার পাশেই।

সেখান থেকে লোকালয় একটু দূরে। বড়ো একটা পুকুরের পাড়ে। চারপাশে মানুষ কম ছিল, কিন্তু সঙ্গী ছিল প্রকৃতি। চারধারে এত সুপুরি, নারকেল আর মাদারের গাছ আমি আগে কখনও দেখিনি। স্কুল-বাড়ির পাশে দুটো নিমগাছ যেন অচ্ছেদ্য প্রেমে বাঁধা পড়ে জড়াজড়ি করে বরাবর দাঁড়িয়ে থাকত। খালি হাওয়া উঠলে তাদের পাতা কাঁপত।

লাগোয়া মাস্টারদের ঘরে যাদের আস্তানা, তাদের কেউ কি আমাকে চিনত? মনে তো হয় না। অন্তত আমি কখনও ঘোমটা খুলিনি। তবে জানেনই তো, শাড়ির একটু খসখস, চুড়ির একটু টুংটাং, পায়ের একটু আওয়াজ — এসব থাকেই। তাতে যদি কারও মনে এসরাজের ছড় ঝড় হয়ে যায়, পায়ের শব্দ হয় বুকের ভূমিকম্প, তার জন্যে আমি দায়ী নই।

(একটু থেমে)

মিথ্যে কথা বলছি। আমার মনও আনচান কখনও করত বই কি! একটা বাচ্চা নেই, যাকে ঘুম পাড়াই, একটা গান জানা নেই, যা গুনগুন করে গাই। তাই পাশের বাড়িতে কে বা কারা, এক ঝলক, একটু দেখে নিতে ইচ্ছে হবে না? সে কি পাপ?

পাপ নয়, পাপ নয়। যদি থাকে, সে আমার মনের একেবারে ঠাণ্ডা কোনও তলায়। পাশের আটচালার লোকগুলো মাস্টার না হলে আমার মনের উসখুস এতটা বাড়ত কিনা জানি না। কিন্তু এটা তো জানি, সে এখন মাস্টার। একজন মাস্টার তবে কি সব মাস্টারের মধ্যে মিলে গিয়েছিল? হবেও বা। তবে এসব তো আজ থেকে প্রায় শ'খানেক বছর আগেকার ব্যাপার। একশো বছর আগেকার আমি আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। শুধু দাঁড়াব বলে।

সেদিন কিন্তু মানবসমাজে নতুন কোনও নীতি প্রচার করতে বসিনি, সমাজ ভাঙতে আসিনি। ছিঁড়তে চাইনি কোনও বন্ধন। আজও যে এত প্রগলভ কথা বলছি, সে শুধু আমার সেদিনের মনকে আয়নার মতো মুখের সামনে ধরে রাখব বলে।

দেখুন, মনে মনে, আপন মনে কত কী যে ভাব উথলে ওঠে! তার সবই কি সুবিবেচনা-সঙ্গত?

যার সঙ্গে আমার ইহকাল, পরকাল সাক্ষী রেখে মন্ত্র পড়া হয়ে গিয়েছে, সে আমার, না যার কথা মাঝে মাঝে বর্ষার আকাশে বিদ্যুতের মতো চমকে ওঠে, তাকেই আমার বলব? এর কোনও মীমাংসা আমি পাইনি। এর মীমাংসার জন্যে কোনও গণ্ডী ডিঙোতেও আমি চাইনি।

অথচ এও ঠিক, এখন আর ঘরের কাজে তেমন মন বসে না। সমস্ত সকাল যদি কাটে, সকল বেলা কাটে না। দুপুরটা ঝাঁ ঝাঁ আর খাঁ খাঁ করে। তখন বাতাস এত মৃদু অথচ তপ্ত কেন? নিমপাতা এত তেতো, কিন্তু তার ফুল এত সুগন্ধি কেন? আমি কিছুই বুঝি না, বুঝতাম না। *(জোরে চিৎকার করে)* চাইতাম না বুঝতে।

তবু দেখুন, সন্ধেবেলায় পুকুরের ধারে সুপুরি-নারকেলের সরসর মড়মড় আওয়াজের কোনও অর্থ হয়? অথচ ওর চেয়ে বেশি অর্থ আর কিছুর আছে কিনা, সে কথা জানে অভিধান আর জানেন ভগবান। আমার মতো মূর্খ মেয়েমানুষ ভাবতো এই যে সমাজ, এই যে সংসার, এটা একটা জটিল ভুলের জাল। ঠিক সময় আমরা ঠিক কাজ করি। কিন্তু বেঠিক সময়েও বেঠিক ভাবনা — আর পদ্যে কী বলে যেন — বাসনা কামনার পিঠে হাত বুলিয়ে মরি। বাসনা আর কামনা — ওরা কি পোষা বেড়াল যে, আমাদের বোলানো হাতের ভুলে গরগর আর মিউমিউ করবে?

সরকারী উকিল স্বামী বুড়ো হতেন। আমিও তখন এমন কিছু তরুণী থামতাম না। বুড়োবুড়ি দু'জনাতে মনের সুখে বেশ থাকতাম। কিন্তু মাঝখানে একটা ছায়া পড়ে কেন? পাড়াগেঁয়ে ইশকুলের এক সেকেনড্ মাস্টারের? আচ্ছা, সে কোথায়? সে কি এখনও বেঁচে আছে? বালাই ষাট, থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই আছে। সে কি বিয়ে করেছে? করেছে নিশ্চয়ই। *(হঠাৎ গলায় জোর দিয়ে)* আমার মন বলছে করেনি, করেনি, করেনি। অথচ তার বিয়ে করায় বা না করায় আমার কী আসে যায়। *(বুড়ো আঙুল দেখিয়ে)* লবডঙ্কা। আমার স্বামী আমাকে ফি-বছর একটা গয়না গড়িয়ে দেয়। যেদিন মামলা জেতে, সেদিন উপরি একটা শাড়ি। সেদিন আর আমাকে

পুকুরের ধারে বসে সন্ধ্যাবেলা কটা তারা উঠল গুনে গুনে হয়রান হতে হয় না।

আমার স্বামী সদরে একটা মামলা নিয়ে বাইরে গিয়েছে। আর তাই তো আমি এত সব এলোমেলো ভাবছি। যার মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, এমন সব ভাবনা। যার শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই — এমন সব বাজে ব্যাপার। মেয়েমানুষের কাণ্ড!

সুরবালা, আমার নাম সুরবালা, আমি আজ একা। অনেক কাল পরে আবার একা। নইলে এই সময়টাতে তো আমার কাপড় কুঁচিয়ে আলনায় রাখার কথা। পাতা কেটে চুল আঁচড়ানোর কথা। কপালে মস্ত বড়ো একটা টিপ পরতাম। দেখতে দিব্যি হত। কিন্তু আজ একে তো আমি একা, তার উপর দুপুর থেকে এত মেঘ ঘনিয়ে এল কেন?

Sound : মেঘ, বাজপড়া ইত্যাদি।

আজ কোটালের বান ডাকবে নাকি? বৃষ্টি তো সেই কখন থেকে পড়ছে। ইচ্ছে হচ্ছে যে ভিজি! তবে ভেতরটা আগে থেকেই অনেকক্ষণ ধরেই ভিজে আছে কিনা! তাই বাইরের জল আর গায়ে-মাথায় মাখতে সাধ যাচ্ছে না।

Sound

শাঁ শাঁ শাঁ হাওয়া। এই হাওয়া কি আমার মনের আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে? কী আর ওড়াবে? উড়তে বাকি কতটুকুই বা আছে? দরজার কবাট ঠকঠক, জানালার কবাট ঢপাস ঢপাস। আমি উঠে সব বন্ধ করে দিই?

তাহলে হয়তো সব শব্দ চাপা পড়ে যাবে। কিন্তু সব তো চাপা পড়ে না, একটা গোঙানি থাকে। কানের কাছে কুকুরের কান্নার মতো আওয়াজ যদি বাজতেই থাকে, তবে সেই গোঙানির ফলে আমি ঘুমোব কী করে?

ঝড়ের বেগ বাড়তে থাকল। বৃষ্টি আরও তুমুল হল। অনেক দূরে নদীর পাড়-ভাঙা শব্দ —যেন কামান।

এ কী? ঝরঝর বৃষ্টি আর শোঁ শোঁ বাতাস—সেই তো বেশ ছিল। অনেকটা গানের মতো। গান হঠাৎ বান হয়ে ছুটে আসছে নাকি? রাগ হচ্ছে একটা রাগী রাগিণী? আমার স্বামী যে বাইরে, সদরে। একাকিনী এই নারী কী করে? আমার ভাবনার যত জাল বুনছিলাম এতক্ষণ ধরে, সব ছিঁড়ে গেল। যায় যদি যাক। আমি যাই কোথায়? আমাকে কোথাও যেতে হবে। এই বাড়িটা নিচু জমিতে। *(একটু ভেবে)* হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, উপায় আছে। পুকুরের একটা দিক পাড় থেকেও দশ-এগারো হাত উঁচুতে।

সেখানে যাই? সেখানে গেলে যদি রক্ষা পাই।

হাওয়ার দমকে দরজা খুলেই গিয়েছিল। তারই ফাঁকে সুরবালা বেরিয়ে গেল। যেখানে গিয়ে দাঁড়াল, সেখান থেকে অনেক নিচে টলটলে নীল জলের একটু আভাস মেলে।

আঃ এই পুকুর, এই পাড়, আর এই গাছটা। সব ভেসে যাচ্ছে আমার, হাওয়ায় সব উড়ে যাচ্ছে। অনেক দূরে মনে হচ্ছে একসার ঘোড়সওয়ার আসছে খটাখট ঘোড়া ছুটিয়ে। ওরা কি বানের অগ্রদূত? ঢলে সব ভাসিয়ে দেবে বলেই আসছে?

কিন্তু ওই যে হাতখানেক দূরে ঠিক এই গাছতলাতেই আজকের এই রাত্রেই আর একটা ছায়া দাঁড়িয়ে, এ-ছায়া কার? বুঝতে পারছি না, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আকাশে তারা নেই, পৃথিবীর সব আলো নিবে গেছে। পায়ের নিচে একটু ঠাঁই আছে। কিন্তু সময় আছে তো? লোকে বলে স্থান আর কাল। কালও যদি না থাকে, তবে আর ভয় কী? একটা জ্যোৎস্না রাত্রি আর অন্ধকার অমাবস্যা, সব সমান। যেন পুরোনো কোনও গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমি, আমরা, এই দুজনে। কিন্তু ও কে? নাম ধরে ডাকব? নামও যে জানি না। ছায়াটা একেবারে তার মতো। সে-ই কি তবে এতদিন এই স্কুলে মাস্টারি করেছে? অথচ পরিচয় দেয়নি, জানতে পারিনি আমিও?

ভাবতে পারছি না, আর ভাবতে পারছি না। বানের জল এই গাছটার কয়েক হাত তলা দিয়ে বয়ে গিয়ে পুকুরটাকে তার সঙ্গে একাকার করে দিল। আমার বাড়িটাও নিল গ্রাস করে।

কী ঠাণ্ডা, কী হিম, কী বরফ! ও যদি সে-ই হয়, তবে হে ঈশ্বর, যদি তুমি থাকো, তোমার এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস! আলোকময়, লোকময় জনপদে যাকে দেখেছি, কত খেলা খেলেছি যার সঙ্গে, আজ এই জনশূন্য, ভয়ঙ্কর প্রলয়ের অন্ধকারে একাকিনী সুরবালাকে তারই পাশে দাঁড় করিয়ে দিলে!

পরিহাস, কী পরিহাস! যেন দুটি গাছে দুটি ফুল ফুটেছিল। হাওয়াও তাদের মেলাতে পারেনি। কেউ তাদের তুলে স্রোতে ভাসিয়ে দিল। জীবনের প্রবাহে যারা এক হয়নি, মৃত্যু-স্রোত সেই দুটি ফুলকে কাছাকাছি এনে মিলিয়ে দিল। এখন খালি একটা ঢেউয়ের অপেক্ষা। তাহলেই পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে যেন এই বৃন্ত থেকে খসে আমরা দুজন এক হয়ে যাই।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ঝড় থেমে গেল। জল গেল নেমে।

আঃ ভোর ভোর, এতক্ষণে ভোর। ওই লোকটা যে নাজির হয়নি, সেরেস্তাদারও নয়, একটা ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার, ও যদি সে হয়, তবে দ্যাখো দ্যাখো, সে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফিরে যাচ্ছে। ছায়াটা ক্রমে কায়া নিচ্ছে। চিনেছি, ওকে আমি চিনেছি। বানের জল নেমে গেছে। কিচ্ছু ভাসায়নি। থেমে গেছে বৃষ্টি। এমন কিছু ভেজেনি। হাওয়ায় হাওয়ায় শুকিয়ে যাবে। আর ঝড়? ঝড় ওড়ায়নি আমার কিচ্ছু। এই তো পিছন দিকে চেয়ে দেখছি বাড়িটা অটুট আছে। আছে তো? মুশকিল, ওইখানেই তো মুশকিল। আমি যে এখনও উঁচু গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি। একটা রাত্রির একটুখানি অংশ, এই তো? অংশ তো আয়ু নয়! আবার অংশকে বাদ দিলেও আয়ু সম্পূর্ণ নয়। আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে রইলাম, ওর যেখানে যাবার কথা ছিল, একটিও কথা না বলে ও চলে গেল সেইখানে, আমার জীবন আর ওর জীবনে বাইরে থেকে এতটুকু দাগ লাগল না, থাকল না।

সব দিন, সব রাত্রি যেমন ছিল তেমনই থাকবে। তবু এই একটি রাত্রি বারবার এসে হানা দেবে। যখন প্রকৃতি প্রচণ্ড রবে কথা বলে উঠেছিল, কিন্তু পায়রার মতো নরম ভীরু দুটি মানুষ ছিল নির্বাক।

আমিও আস্তে আস্তে ঘরে ফিরি, কিংবা ঘর ছেড়ে যত দূরেই যাই, নিশ্চিত জেনেছি আজ থেকে এই একরাত্রি সমস্ত রাত্রি হয়ে যাবে।

'দুজনে দেখা হল' গানটির 'কেন কথা কহিল না' অংশটি যন্ত্রে বাজতে থাকবে।

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ চিত্রনাট্য সংখ্যা

১৪১১

সীমিত সংখ্যায় এখনো পাওয়া যাচ্ছে

দাম : ৬০ টাকা

লিটল ম্যাগাজিন মেলায় আমাদের স্টলে পাওয়া যাবে

১৪১২ বইমেলায় আমাদের টেবিলে পাওয়া যাবে

তিনটি চিত্রনাট্য

দেখা

শুভ মহরৎ

লালসালু

আলাদা করেও পাওয়া যাচ্ছে

দেখা : ৩৫ টাকা

শুভ মহরৎ : ৩৫ টাকা

লালসালু : ৩০ টাকা

উত্তরা : ৩০ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে বিভাবের অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পুরোনো সংখ্যা

চিঠিপত্র

দ্বিতীয়া স্ত্রী এলসাকে লেখা

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের চিঠি

অনুবাদ ও প্রসঙ্গনির্দেশ : রঞ্জিত সেনগুপ্ত

A. Einstein Archive
143-112

8. I 1921

Liebe Else!

Meine hiesigen Vorträge, und der Diskussionsabend sind schon vorbei. Letzterer war sehr amüsant. Auch nicht Kraus. Heut vormittag war Quartett – sehr schön wie ehedem. Der erste Geiger ist ein Jüngling von 80 Jahren! Morgen gehts nach Wien. Der hiesige Aufenthalt war eine grosse Freude für mich. Ich habe stark im Sinn, Wien abzukürzen und mich in der Zwischenzeit hier aufzuhalten. Wer weiss?

Jetzt wächst mir aber die Relativität bald zum Hals heraus! Auch so was verblasst,

দ্বিতীয়া স্ত্রী এলসাকে লেখা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের চিঠি (প্রথম দিক)।

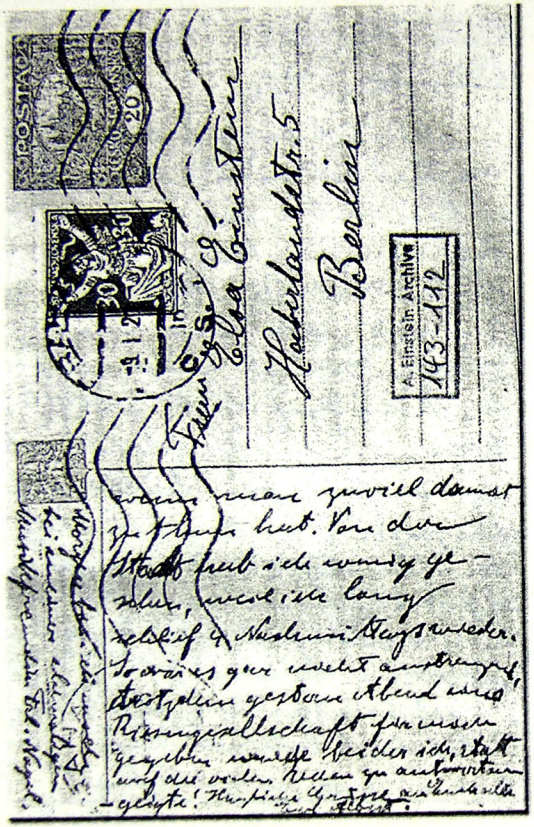

দ্বিতীয়া স্ত্রী এলসাকে লেখা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের চিঠি (দ্বিতীয় দিক)।

সাধারণ মানুষ আইনস্টাইন (অনুবাদ ও প্রসঙ্গকথা)

রঞ্জিত সেনগুপ্ত

আপেক্ষিক তত্ত্বের শতবার্ষিকী স্মরণে বুক হোল্‌স জার্মানি থেকে

'Jetzt waechst mir die Relativitaet zum Hals heraus! Auch so was verblasst, wenn man zuviel damit zu tun hat.' *Albert Einstein*

অনুবাদ

'আমার Relativity যেন আমাকে গিলে খেতে আসছে। এটা নিয়ে আমাকে সব সময়ই ব্যস্ত থাকতে হয়, আমি আর পারছি না।' *অ্যালবার্ট আইনস্টাইন*

উপরের স্বীকারোক্তি Theory of Relativity-র স্রষ্টা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের। আমাদের প্রায় সকলেরই জানা আছে আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে Special Theory of Relativity এবং ১৯১৬ সালে General Theory of Relativity আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কৃত Theory-কে ভিত্তি করেই চলতে থাকে Physics-এর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই আবিষ্কার Physics-এর উপরে এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে উনি এর জন্যে ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

১৪ মার্চ ১৮৭৯ সালে জার্মানির উলম্ (Ulm) শহরে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি জুরিখ (Zurich) ও প্রাগ (Prague) বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৪-৩৩ সাল পর্যন্ত আইনস্টাইন বার্লিন-এর Kaiser-Wilhelm-Institute -এর Director ছিলেন।

আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে তিনি প্রায়ই আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যেতেন। জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতায় আসার পর তিনি আমেরিকাতেই বসবাস শুরু করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি আমেরিকার Princeton University, New Jersey-র অধ্যাপক ছিলেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৫৫ সালে প্রিন্সটন-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্যক্তি আইনস্টাইন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। ১৯০৩ সালে তিনি বাল্যপ্রেমিকা মিলেভা মারিক(Mileva Maric)-কে বিয়ে করেন।

তাঁর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হলে তিনি ১৯১৯ সালে সম্পর্কে Cousin, এলসা লোয়েনথাল (Elsa Loewenthal)-কে বিয়ে করেন।

জন্মসূত্রে তিনি ইহুদি ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের বিপুল ভাণ্ডার জেরুজালেমের ইহুদি বিশ্ববিদ্যালয়ে গচ্ছিত আছে। তার বেশিরভাগই আইনস্টাইনের দ্বিতীয় স্ত্রী এলসা-র কন্যা মার্গট (Margot) ১৯৮৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছিলেন। শর্ত ছিল মার্গট-এর মৃত্যুর ২০ বছর পর তা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। এতদিনে সেই শর্ত পূরণ হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫০০ পাতার কাগজপত্র রয়েছে, যার থেকে অনেক কিছুই জানা যায়। তার মধ্যে আছে বিপুলসংখ্যক চিঠিপত্র।

আইনস্টাইন কখনোই নিজের অনুভূতি, আবেগ, উচ্ছ্বাস বাইরে প্রকাশ করতেন না। তবে আত্মীয়স্বজনদের ভালোবাসা, স্নেহ-প্রীতি ও সহানুভূতি জানিয়ে চিঠি লিখতেন। মিলেভা সম্পর্কে একবার আইনস্টাইন বলেছিলেন যে উনি ১৭ বছর বিবাহিত জীবন কাটিয়েছেন—কিন্তু তা সত্ত্বেও মিলেভাকে ঠিক চিনতে পারেননি।

আরেকবার আইনস্টাইন বলেছিলেন 'বিবাহ হচ্ছে হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনাকে চিরস্থায়ী করার নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র।' আইনস্টাইনের দুটি পুত্র। অ্যালবার্ট (১৯০৪-৭৩) ও এডওয়ার্ড (১৯১০-৬৫)। সৎ-কন্যার নাম মার্গট। প্রথম স্ত্রী মিলেভা এবং দ্বিতীয় স্ত্রী এলসাকে লেখা প্রায় সব চিঠিই সযত্নে রাখা আছে 'Einstein-Archives', জেরুসালেম-এ। চিঠিগুলো পড়লে বোঝা যায় তিনি দৈনন্দিন জীবনের সবকিছুই ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। তবে জার্মান ভাষায় লেখা এইসব চিঠিগুলোতে তাঁর গবেষণামূলক কাজের কোনো উল্লেখ নেই। ১৯২১সালে প্রাগ থেকে দ্বিতীয় স্ত্রী এলসাকে লেখা একটা চিঠিতে আইনস্টাইন Relativity Theory আবিষ্কার সম্বন্ধে উপরের মন্তব্যটি ('Jetzt Waechst... zu tun hat.') করেন।

নোবেল পুরস্কারের অর্থ নিয়ে গুজব রটেছিল যে তিনি নাকি সবটাই সুইজারল্যান্ডের একটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, যদি প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয় তবে সেই টাকা মিলেভা পাবেন। এটা অবশ্য নিছকই গুজব। আইনস্টাইন, পুরস্কারের বেশির ভাগ অর্থই আমেরিকার বিভিন্ন অর্থ-লগ্নি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছিলেন। আমেরিকার তৎকালীন আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটায় অর্থের প্রায় সবটাই তিনি হারিয়েছিলেন।

একবার আইনস্টাইন এক চিঠিতে তাঁর এক বিশেষ পরিচিতা এথেল মিচানোকি (Ethel Michanowki) সম্বন্ধে লিখেছেন: *এটা সত্যি কথা যে এথেল আমার পিছনে পিছনে ছুটছে এবং একেবারে আশাহীন হয়েই ছুটছে। প্রথমত আমি ওকে এখনো পর্যন্ত আটকাতে পারিনি এবং দ্বিতীয়ত ওর সঙ্গে আবার দেখা হলে আমি বলব আমার জীবন থেকে সরে যেতে।... সব পরিচিতাদের মধ্যে আমি একমাত্র Mrs. El.-এর অনুগত। উনি নির্দোষ ও সৎ এবং সেইজন্যে ঈশ্বরসৃষ্ট এই পৃথিবীর কোনো ক্ষতিই তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়।*

আইনস্টাইন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে দ্বিতীয় স্ত্রী এলসাকে লিখেছিলেন: *দিনগুলো ভালোই কেটেছে। আমি এখন ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হচ্ছি Smoking (বিশেষ ধরনের উৎসবের পোশাক) পরতে, যেমন বহু বছর আগে দাঁত মাজার ব্রাশ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম।... তার বদলে আমি কোনোদিনও ওখানে মোজা পরিনি। আমার এই অসভ্যতাটুকু আমি লম্বা বুটজুতো দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম।*

আইনস্টাইন তাঁর সৎ-কন্যা মার্গটকে খুবই স্নেহ করতেন। ১৯২৪ সালে স্ত্রী এলসাকে লিখেছেন: *আমি মার্গটকে এত ভালোবাসি যেন ও আমারই নিজের মেয়ে; সম্ভবত তার চেয়েও বেশি। কে জানে, কী ধরনের বোকা মেয়ে ও হত, যদি আমি ওর নিজের বাবা হতাম!*

অন্য একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : *যদি কেউ দু-ঘণ্টা একটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কাটায়, মনে হয় যেন মাত্র এক মিনিট ওর সঙ্গে ছিল। আবার কেউ যদি একটা গরম ওভেন-এর উপরে এক মিনিট বসে থাকেন, তখন মনে হয় যেন দুই ঘণ্টার উপরে বসে আছেন। এটাই হচ্ছে Relativity.*

আইনস্টাইন সম্বন্ধে লেখা এই তথ্যগুলির সাহিত্যমূল্য প্রায় কিছুই নেই। শুধু ব্যক্তি আইনস্টাইনের সম্বন্ধে কিছু জানা-অজানা তথ্য নিয়ে আলোচনা করা হল। আমার ধারণা, মানুষ অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে চিনতে এর ফলে কিছুটা সুবিধে হতে পারে।

জার্মানিতে 'Welt an Sonntag' সাপ্তাহিক কাগজে ১২.০৭.২০০৩ তারিখে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধ আমাকে অনুপ্রাণিত ও সাহায্য করেছে এই প্রতিবেদনটি লিখতে।

এবারে দ্বিতীয় স্ত্রী এলসাকে লেখা মূল চিঠিটি (জার্মান ভাষায় প্রতিলিপি আগে দ্রষ্টব্য) ও তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল।

Liebe Else,

Meine hiesigen Vortraege, auch der Diskussionsabend sind schon vorbei. Letzterer war sehr amuesant (auch mit Kraus). Heutvormittag war Quartett—sehr schoen wie ehedem. Der erste Geiger ist ein Juengling von 80 Jahren! Morgen gehts nach Wien. Der hiesige Aufenthalt war eine grosse Freude fuer mich. Ich habe stark im Sinn, Wien abzukuerzen und noch in der Zwischenzeit hier aufzuhalten. Wer weiss?

Jetzt waechst mir aber die Relativitaet bald zum Hals heraus!

Auch so was verblasst, wenn man zuviel damit zu tun hat.

Von der Stadt hab ich wenig gesehen, weil ich lang schlief u. Nachmittags wieder. So war es gar nicht anstrengend, trotzdem gestern Abend eine Riesengesellschaft fuer mich gegeben wurde bei der ich, statt auf die vielen Fragen zu antworten geigte.

Herzliche Gruesse an Euch allen.

Euer Albert

Morgen bin ich noch bei anderen ehemaligen musikfreundin Frl. Nagel.

প্রিয়া এলসা,

আমার এখানে বক্তৃতা ও সান্ধ্য আলোচনা শেষ হয়েছে। শেষের কাজটা মজার ছিল (ক্রাউস থাকলেও) খুবই। আজ সকালে ছিল কোয়ার্টেট — ঠিক আগের মতোই ভালো। একজন বেহালাবাদক হচ্ছেন ৮০ বছরের যুবক। কাল যাব ভিয়েনাতে। এখানে দিনগুলো খুবই আনন্দে কেটেছে।

আমার খুবই ইচ্ছে, ভিয়েনাতে থাকবার সময়টা কমিয়ে এখানেই বেশি সময় কাটাবার। কে জানে কী হবে?

আমার Relativity যেন আমাকে গিলে খেতে আসছে। এটা নিয়ে আমাকে সব সময়ই ব্যস্ত থাকতে হয়, আমি আর পারছি না।

শহরটা আমি খুবই কম দেখেছি, কারণ আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি, এমনকী বিকেলবেলাতেও। সেইজন্যেই আমার খুব একটা অসুবিধে হয়নি। যদিও গতকাল সন্ধেয় আমার জন্যে একটা বিরাট সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে আমি অনেক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেহালা বাজিয়েছি।

তোমাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

তোমাদের অ্যালবার্ট।

কাল আমি আমার একজন পুরোনো যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী বান্ধবী Frl. Nagel-এর সঙ্গে সময় কাটাব।

আইনস্টাইনের কিছু স্মরণীয় উক্তি

কিছু মানুষ সারাজীবন ব্যস্ত থাকেন একজন মহিলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে। অন্যরা আবার কম জটিল ব্যাপার নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন, যেমন 'Relativity Theory'।

অঙ্ক করতে তোমার সমস্যা থাকলেও চিন্তা করার কিছু নেই। আমি তোমাকে নিশ্চিন্ত করে বলতে পারি যে আমার সমস্যাটা আরো বেশি।

১৯৪৩ সালে জনৈক ছাত্রীকে করা উক্তি

অতিরিক্ত সফল মানুষ হবার চেষ্টা না করে, প্রকৃত মানুষ হবার চেষ্টা করো।

আইনস্টাইনের ১৯৫৫ সালে করা উক্তি

এই বইটা সম্পর্কে আমার যা বলার আছে তা সবই বইটার মধ্যেই লেখা আছে।

ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কাছে আবেদন : প্রিয় উত্তরপুরুষগণ, তোমরা যদি আমাদের মতো ন্যায়পরায়ণ, শান্তিপূর্ণ, সর্বোপরি বিবেকবান না হও, তবে শয়তান তোমাদের গ্রহণ করবে। সর্বান্তঃকরণে আমি আমার এই মানসিক ইচ্ছা তোমাদের কাছে রেখে গেলাম।

তোমাদের (কোনো এক) অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

গল্প

প্রবন্ধ

বিশেষ রচনা

সব সোনা সোনা নয়

নবেন্দু ঘোষ

এ-বছর বঙ্কিম পুরস্কার পেলেন নবেন্দু ঘোষ আরেক প্রতিষ্ঠিত লেখক কার্তিক লাহিড়ীর সঙ্গে যুগ্মভাবে। 'দীর্ঘায়ু না হলে বাংলাভাষায় সাহিত্যের জন্য পুরস্কার মেলা ভার।' এই নিতান্ত সঠিক উক্তিটি প্রয়াত অন্নদাশঙ্কর রায়-এর। তবু নবেন্দু ঘোষের এই বিলম্বিত স্বীকৃতির জন্য আমরা আনন্দিত।

১৯৪২-১৯৪৩ সময় পরিসরে তাঁর রচিত 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসের জন্য তিনি অভাবনীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই উপন্যাসের পশ্চাৎপট ছিল ১৯৪২ সালের 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলন। পাটনার *প্রভাতী* মাসিকপত্রে ইংরেজের অপশাসন-বিরোধী লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ফলে নবেন্দু ঘোষ চাকরিটি হারান এবং পুলিশের নজর এড়াতে তাঁকে কলকাতা ত্যাগ করে বঙ্গের বাইরে যেতে হয়। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হল *ফিয়ার্স লেন*। এই গ্রন্থ তাঁর লেখকখ্যাতিকে করল আরো প্রসারিত। তাঁর অবিচলিত ধারণা 'ধর্ম নয়, সংস্কার নয়, সাম্যবাদই শ্রেষ্ঠ ধর্ম!'

তারপরে তিনি কিছুদিন বম্বের (অধুনা মুম্বাই) ফিল্ম দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং সুদীর্ঘকাল সেখানেই প্রবাসী হয়ে রইলেন। তাঁর রচিত ও পরিচালিত 'তৃষ্ণাগ্নি' কাহিনীচিত্রটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে ভারত সরকারের 'স্বর্ণকমল' পুরস্কারের শিরোপা পায়। রাজকাপুর থেকে শুরু করে বহু খ্যাত হিন্দি ছবির পরিচালকের জন্য বহু কাহিনী ও চিত্রনাট্য তিনি লিখলেন।

প্রায় পাঁচ দশক পরে বাংলাভাষার এই অবশ্য স্মরণীয় লেখক আবার কলকাতায় ফিরে এসেছে। বাকি জীবন কলকাতাতেই কাটানো তাঁর ইচ্ছে। আমাদের অনুরোধে বিভাব-এর শরৎকালীন সংখ্যার জন্য নব্বই বছরেও এই টাটকা যৌবনপ্রধান দীর্ঘ গল্পটি লিখে দিয়েছেন তিনি।

সম্পাদক

সেদিন আড্ডা বসেছিল অবিনাশ চাটুজ্জের বাড়ি। এলোমেলো গল্প হচ্ছিল।

উকিল দেবকুমার গুহ বলল, 'আমাদের পাড়ার পরেশবাবু আর ধীরেনবাবুর মধ্যে খুব বন্ধুত্ব আছে হে—'

কালান্তর-এর সহ-সম্পাদক অবিনাশ চাটুজ্জে সায় দিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই মনে হয় বটে।'

ভরত গুপ্ত নামধেয় মাস্টার-কাম-দলের কথক ভুরু কুঁচকে বলল, 'কিন্তু যা মনে হয় তাই সব সময় সত্যি নয়। কী বলো হে বিনয় বোস?'

বিনয় বোস মানে রাইটার্স বিল্ডিং-এর একটি ছোট্ট দপ্তরের হেড ক্লার্ক। সে বলল, 'তা ঠিক, অল দ্যাট গ্লিটারস ইজ নট গোল্ড।'

ভরত গুপ্ত মাথা নেড়ে বলল, 'অস্যার্থ, যাহাই চকচক করে তাহাই সোনা হয় না।'

অবিনাশ চাটুজ্জে মুচকি হেসে বলল, 'অস্যার্থ, ভরত গুপ্ত এবার একটি গল্প বলবে।'

ভরত গুপ্ত চোখ পাকিয়ে বলল, 'বলতাম, কিন্তু আর বলব না। আমাকে উপহাস করো তা আমার সইবে কিন্তু আমার গল্প অর্থাৎ আমার রস-বস্তু অর্থাৎ আমার ভগবানকে উপহাস করলে কিন্তু—'

উকিল দেবকুমার গুহ ভরত গুপ্তকে কথা শেষ করতে দিল না। কপট ভঙ্গিতে হাতজোড়

করে বলল, 'হে ভগবদ্ভক্ত রসিকপ্রবর, তুমি শান্ত হও, আমাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝে খুশি হও। আসলে আমরা সবাই তোমার কাছে গল্প শুনতেই চাইছি।'

বিনয় বোস বলল, 'হ্যাঁ ভরত গুপ্ত, রাগারাগিটা কী তোমার শোভা পায়? তুমি মানী গুণী লোক।'

অবিনাশ চাটুজ্জে আমার কথাকেই পুরোপুরি শেষ করার জন্য বলল, 'এবং ক্ষমাই জ্ঞানীগুণীর আসল পরিচয়।'

আমি তখন আমাদের কথার উপসংহাররূপে আবেদন জানালাম, 'অতএব হে ভরত গুপ্ত, তুমি এবার একটি গল্প বলো।'

অবিনাশ চাটুজ্জে থামেই না, সে এবার দাঁত মেলে হেসে বলল, 'আসলে তুমি যাতে জমিয়ে গল্প বলো তার জন্যই আমার ওই চিমটি-কাটা হে ভরত গুপ্ত।'

ভরত গুপ্তের ঠোঁটের কোণে এবার হাসির ঝিলিক মারল, যেন শ্রাবণের আকাশে মেঘপুঞ্জের একটা ফাটল দিয়ে সূর্যের আলো পড়ল ছড়িয়ে। সে বলল, 'বন্ধুগণ, তোমাদের চাটুকারিতায় আমি নিরতিশয় প্রীতিবোধ করছি।'

দেবকুমার গুহ টেবিলে একটা মৃদু চপেটাঘাত করে বলল, 'অতএব এবার গল্প শুরু হোক।'

অবিনাশ চাটুজ্জে সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, শুরু হোক এবং গল্প শেষে নির্ভেজাল সরষের তেলে-ভাজা মুখরোচক ফুলুরি সহযোগে এক মগ করে ভালো চা পরিবেশন করার জন্য আমি আমার মুখরা স্ত্রীকে অনুরোধ করেছি এবং তিনি সানন্দে—'

ভরত গুপ্ত হাত তুলে জিভ বের করে বাধা দিল, 'থামো অবিনাশ চাটুজ্জে — ছি ছি ছি, এমন অপরাধ আর কখনো কোরো না। লক্ষ্মী সর্বদাই লক্ষ্মী, মুখরা কিংবা মূক হলেও গৃহলক্ষ্মীদের মধ্যেই তিনি বিরাজমান এবং তাই কখনো বোলো না যে দেবীরা স্তুতিবচনেই বরপ্রদা হন, নিন্দা বা সমালোচনা দ্বারা প্রভাবিত হন না।'

দেবকুমার গুহ বলল, 'সাধু, সাধু।'

অবিনাশ চাটুজ্জের সহাস্য মন্তব্য, 'আমি "মুখরা" শব্দটি প্রত্যাহার করলাম।'

ভরত গুপ্ত বলল, 'আমরা আশ্বস্ত হলাম।'

দেবকুমার গুহর অনুযোগ, 'গল্পারম্ভে বিলম্ব হচ্ছে—'

ভরত গুপ্তের জবাব, 'এইবারে শুরু হল। শোনো। ১৯৭৮ সন থেকে গল্পের শুরু।'

তখন আমার স্কুল-জীবন শেষ হয়েছে, বয়স ষোলো। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো তখন জীবনের অসীম আকাশের আভাস পেয়ে আমি উত্তেজিত ও উল্লসিত বোধ করছি এবং 'রস'-এর সন্ধানে একদল সমবয়সী মিলে 'দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্যসমিতি' নামে একটি দল তৈরি করে টিপু নামের এক উৎসাহী সভ্য-বন্ধুর বাড়ির পিছন দিককার আমবাগানে স্ত্রী- ভূমিকা বর্জিত নানা নাটকের মহলা দিচ্ছি। ইংলিশবাজার অর্থাৎ মালদা-র বিখ্যাত এক ধনী ব্যক্তি যুগল চৌধুরির নাতির পইতে'র সময় অভিনীত হল 'একলব্য'। বলা বাহুল্য, আমিই একলব্য সেজেছিলাম।

প্রচুর হাততালি, 'চমৎকার', 'একসেলেন্ট', 'বাঃ-বাঃ' ইত্যাদি নানাবিধ প্রশংসা এবং দুটি রৌপ্যপদক অর্জন করে আমি অত্যধিক গর্বে বেলুনাধিক স্ফীত হয়ে আকাশ ছাড়িয়ে মহাকাশে বিচরণ করতে লাগলাম। তারপর সরস্বতী পুজোর সময় মঞ্চস্থ করলাম 'আলেকজান্ডার ও পুরু'। আমার দেহসৌষ্ঠব ও গাত্রবর্ণ দেখে হেসো না বন্ধুগণ, প্রচুর সফেদা মেখে আমিই সেই শ্বেতাঙ্গ মহাবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম। তার কয়েকমাস পরে হোলি-র পরদিন মঞ্চস্থ হল আমাদের 'সিরাজের স্বপ্ন'। হতভাগ্য সেই বাংলার নবাব সেজেছিলাম আমিই। প্রায় আধডজন পদকশোভিত হয়ে উঠলাম ততদিনে। সত্যি বলছি, রাস্তায় বেরোলে এবাড়ি-ওবাড়ির জানলা দিয়ে ছেলেমেয়েরা চোখে প্রশংসা আর ভালোবাসার আলো জ্বালিয়ে ডাক দিত, 'ভরতদা, ও ভরতদা, কোথায় যাচ্ছ?' বয়স্করা সস্নেহে তাকাতেন, এমনকী বাড়ির ঝি চাকরেরাও আমার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসিমুখে ফিসফিস করে আমার গুণগান করত। যশের সেই বিচিত্র ও উত্তেজক রসায়নে আমি মাতাল হয়ে উঠলাম এবং নিজেকে প্রায় শিশির ভাদুড়ি আর অহীন্দ্র চৌধুরি মনে করতে থাকায় মহা প্রতাপে 'দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্যসমিতি'র সভ্যবৃন্দকে অভিনয়কলা সম্পর্কে বিজ্ঞ করে তুলতে লাগলাম এবং এক সময়ে উপলব্ধি করলাম যে বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমাদের এসেছে।

শহরের সব চেয়ে নামী নাটুকে দল ছিল 'মিলন সংঘ'। তার সভ্যেরা অধিকাংশই ছিলেন আমাদের দাদা, কাকা, বাবা ও জ্যাঠারা। তাঁদের মধ্যে সব থেকে নামজাদা অভিনেতা ছিলেন নির্মল গুপ্ত এবং রাখাল পাল। একজন রাম সাজতেন তো অপরজন শম্বুক, একজন সাজাহান, হলে অন্যজন ঔরংজেব। আমার মনে হল যে স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত নাটকের আভিজাত্য বড়ো কম, তাতে আমাদের বয়সের ছাপটা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হতে থাকে। আমার মনে বিদ্রোহের সঞ্চার হল। না না, আমরাও প্রতিভাসম্পন্ন এবং আমরাও স্ত্রী ও পুরুষ দুরকম চরিত্রযুক্ত নাটকই অভিনয় করব। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম যে এমন নাটক ধরব যাতে ইতিমধ্যেই নির্মল গুপ্ত ও রাখাল পাল অভিনয় করে যশ অর্জন করেছেন। সেরকম নাটকে অভিনয় করেই খ্যাতিমান হতে হবে। নানা আলোচনার পর আমরা স্থির করলাম যে আমরা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'সুদামা' নাটক করব। নির্মল গুপ্তের সুদামা এবং রাখাল পালের শ্রীকৃষ্ণের অভিনয়ের রেকর্ড 'ব্রেক' করব। নাটকটিতে নাচ-গানের ব্যাপার আছে, মধুর একটি নাটকীয় গল্পও আছে এবং তা ছাড়াও আছে ভক্তিরসের উপাদান, সুতরাং সবদিক থেকেই জমবে ভালো।

তখন প্রশ্ন উঠল, সংগীত-পরিচালনা কে করবে? অবশ্যই আমাদের ন্যাপলা, মানে নেপাল দত্ত। কিন্তু গোল বাধল দুটো ব্যাপারে। নৃত্য-পরিচালনা করবে কে? এবং ফিমেল পার্টগুলো?

আলোচনা করতে গিয়ে মনে হল যে 'দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্যসমিতি'র সব সভ্যদেরই পৌরুষ প্রবল। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, শাস্ত্রে আছে যে, গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং বাকি সবাই পুরুষ দেহধারী হলেও গোপিনী অর্থাৎ স্ত্রীলোক।

কিন্তু সভ্যবৃন্দ আমার সেই গূঢ় শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাকে 'দূর, ভাগ' বলে নস্যাৎ করে দিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত 'দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্যসমিতি'র মর্যাদার কথা উল্লেখ করায় টিপু (ত্রিপুরারি), বিজু (বিজয়), সন্তু (সন্তোষ) এবং ভোলা (ভোলানাথ) সখীদের ভূমিকায় নৃত্যগীত করতে রাজি

হল আর সুদামার স্ত্রীর ভূমিকা আমার অনুগত বন্ধু ভুলি (প্রণব) প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়েও করে দেবে বলে সম্মত হল।

কিন্তু রুক্মিণী করবে কে? কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণীর দেখতে শুনতে ভালো হওয়া চাই, তার চোখে মুখে ধার থাকা উচিত, নইলে জগৎবল্লভ কৃষ্ণের প্রিয়া তিনি কীভাবে হবেন? দর্শকজনের যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া উচিত রুক্মিণী'র নির্বাচন। তাই বাঁকুকে অর্থাৎ আমাদের বঙ্কিমকে বললাম সেই কথা। বাঁকুর গলাটি বেশ মেয়েলি, যদিও মুখচোখের চেহারাতে পুরো খুশি হওয়া যায় না, কারণ তার নাকটা একটু বোঁচা বোঁচা, চোখ দুটোও টানা টানা নয়, অবশ্য তার গাল আর চিবুকের গড়নটি ভালো।

বাঁকু কিন্তু উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল, 'যাঃ, ইয়ার্কি করিস না।'

আমি বললাম, 'তোর খুব নাম হবে বাঁকু —'

ন্যাপলা বলল, 'বিউটিফুল মানাবে রে তোকে —'

বাঁকু গর্জে উঠল, 'চোপ ন্যাপ্‌লা —'

ভোলা বলল, 'তাহলে আমাদের 'দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্যসমিতি'র জন্য তোর এতটুকুও দরদ নেই!'

টিপু বলল, 'বাঁকু, তুই সেলফিশ—'

সন্তু বলল, 'তুই ক্লাবের ডাইরেকটারকে মানিস না!'

নানাবিধ বাক্যবাণে জর্জর হল বাঁকু, কিন্তু মেয়েলি গলায় সে সমানে তার অস্বীকৃতি জাহির করতে লাগল। মহাভারতের মহামতি ভীষ্মের মতো শরশয্যাশায়ী হয়েও সে ভূমিস্পর্শ করল না, নারী ভূমিকা-বিদ্বেষে অটল হয়েই রইল।

শেষ পর্যন্ত একটি আশার কথা বলল, 'আর গালিগালাজ করিস না তোরা, আমি রুক্মিণীর পার্টের জন্য লোক এনে দেবো।'

তখন আমি বললাম, 'কিন্তু সে অন্য ক্লাবের মেম্বার হলে চলবে না —'

বাঁকু জোরগলায় বলল, 'সে অন্য কোনো ক্লাবেরই মেম্বার নয় —'

টিপু প্রশ্ন করল, 'কার কথা বলছিস তুই?'

বাঁকু মাথা নাড়ল, 'এখন বলব না। আমায় একদিন সময় দে।'

বললাম, 'দিলাম। কিন্তু যদি কাউকে না আনতে পারিস তাহলে কিন্তু তোকে 'দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্যসমিতি' ছাড়তে হবে।'

সমিতির বাকি সদস্যরা উচ্চকণ্ঠে ও একযোগে আমায় সমর্থন জানাল।

তখন বাঁকু বিরসমুখে আমাকে বলল, 'তাহলে... তাহলে তুই যা বলবি তা-ই করব।'

গন্ধর্বদল একযোগে জয়ধ্বনি করল, 'লং লিভ বাঁকু দি গ্রেট —'

উকিল দেবকুমার গুহ হাত তুলল।

ভরত গুপ্ত হাসল। প্রশ্ন করল, 'কী হল?'

দেবকুমার গুহ বলল, 'আমি উকিল, বক্তব্যকে ফেনাই, কিন্তু তুমি এত ফেনাচ্ছ কেন?'

ভরত গুপ্ত হাসল, 'একটু ব্যাখ্যা করো 'ফেনাচ্ছ' শব্দটিকে আমার গল্পে কোথায় পেলে?'

দেবকুমার গুহ বলল, 'তুমি কী গল্প বলতে চাইছ বুঝতে বিলম্ব হচ্ছে।'

ভরত গুপ্ত বলল, 'রহু ধৈর্যং — এক্ষুনি বুঝতে পারবে।'

দেবকুমার গুহ মাথা কাত করল, 'বেশ, ধৈর্য ধারণ করছি, বলতে থাকো —'

ভরত গুপ্ত আবার শুরু করল।

বাঁকু অর্থাৎ বঙ্কিম তার কথা রাখল। পরের দিনই বিকেলে সে একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এল।

সে সঙ্গীর পরিচয় দিয়ে বলল, 'এঁর নাম বংশীবিহারী দাস, মাস পাঁচ ছয় হল আমাদের শহরে এসেছেন, ইনিই রুক্মিণীর পার্ট করবেন ভরত।'

'নমস্কার'—বংশীবিহারী সহাস্যে বলল।

সবাই ভালো করে তাকালাম তার দিকে। মাঝারি গড়নের, শ্যামবর্ণ, নাক চোখ মুখের আদল ভালোই, গলার আওয়াজ, কথা বলা আর হাত নাড়ার ভঙ্গিতে মেয়েলি ভাব আছে, মাথার কোঁকড়ানো ও প্রায়-বাবরি চুল সযত্নে তৈলচর্চিত ও পাট-করা। বয়স কুড়ি-একুশ হবে। আমাদের সবার চেয়ে বড়ো কিন্তু চোখে মুখে তার ছাপ নেই। মনে হল সে রুক্মিণীর পার্ট ভালোই করবে। কারণ আট বছর বয়স থেকে যাত্রার দলে ছিল প্রায় দশ বছর। সখী সাজা থেকে শুরু করে নানা পার্ট করেছে—রাধা, সত্যভামা, সীতা, মীরাবাই ইত্যাদি।

বংশীবিহারী হেসে যোগ করল, 'শ্রীকৃষ্ণ, বসন্ত, লব, এসব পার্টও করেছি—মানে পুরুষদের পার্টও চুটিয়ে করতে পারি। আপনাদের বইয়ের শ্রীকৃষ্ণ আমি করতে পারব।'

আমি কিন্তু তার ওই কৃষ্ণ সাজার ইচ্ছেতে সায় দেবো না। ন্যাপলার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম যে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা হারাবার শঙ্কায় তার মুখ কালো হয়ে উঠেছে। তাই আমি বললাম, 'বংশীবাবু, আমাদের নেপাল দত্ত শ্রীকৃষ্ণ করছে, তাই আপনি রুক্মিণীর পার্ট করলে আমরা খুবই উপকৃত হব।'

বাঁকু বলল, 'উনি তা করবেন। আর একটা কথা ভরত—বংশীবিহারীবাবু আমাদের নৃত্য-পরিচালনা এবং সংগীতের সমস্যা দূর করে দিতে পারবেন—উনি চমৎকার নাচতে গাইতে হারমোনিয়াম বাজাতে পারেন।

টিপু সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ে পাঁচ মিনিটেই তাদের বাড়ি থেকে হারমোনিয়াম আর বাঁয়া তবলা নিয়ে এল।

সন্তু হারমোনিয়াম নিয়ে বসল আর টিপুর তবলায় চাঁটি শুরু হল।

বংশীবিহারী সন্তুকে একটু সুর ভেঁজে শুনিয়ে দিতেই সন্তু তা হারমোনিয়ামে বাজিয়ে দিল আর চাঁটি মেরে বংশীবিহারী টিপুকে বলল, 'কাহারবা তাল বাজাও—ধাগে তেটে নাগে ধিন'।

টিপুর তবলা তাই বাজল।

তখন বংশীবিহারী মেয়েলি হাতের ভঙ্গি করে গাইল, 'মাধব রেখো চরণে, মা-ধ-ব রেখো চ-র-ণে—'

আমরা মুগ্ধ ও উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। বাঁকু সগর্বে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। তার ভাবটা এই—'কেমন? কথা রেখেছি তো?'

বংশীবিহারীর গান শুনতে শুনতে হঠাৎ এবং যুগপৎ আমার মাথায় একটা ছবি ভেসে এল—মাস তিনেক আগে আমি একদিন মকদুমপুরের রাস্তায় তার পানের দোকানে বসে তাকে বিড়ি পাকাতে দেখেছি। কিন্তু তাতে কী আসে যায়, বংশীবিহারীর মিষ্টি গলার গান শুনে আমি তখন মোহিত। এবং বাকি সবাইও।

বংশীবিহারী তখন গাইতে গাইতে নাচতে শুরু করল, 'মাধব রেখো চরণে-এ-এ, মাধব রেখো চ-র-ণে— এক দুই তিন চার, এক দুই তিন চার, ধাগে তেটে নাগে ধিন, ধাগে তেটে—'

আমরা মাত হয়ে গেলাম। এবং এইভাবেই বংশীবিহারীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হল। ক-মাস বাদেই দুর্গাপুজো উপলক্ষে জমিদার যোগেশ বাড়ুজ্জে-র বাড়ির উঠোনে কৃষ্ণভক্ত 'সুদামা' মঞ্চস্থ হল। অভূতপূর্ব সাফল্য। ভক্তিরসের প্রাবল্যে বয়স্কেরা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন, রসিকজনেরা আমার ও বংশীবিহারী'র অভিনয়নৈপুণ্যে অবাক ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আমি সুদামা-র জন্য পেলাম তিনটে রৌপ্যপদক আর রুক্মিণী-র জন্য বংশীবিহারী পেল দুটো এবং কৃষ্ণের জন্য ন্যাপলা পেল একটা। মেডেলে-র ছড়াছড়ি, হরির লুট। নির্মল গুপ্ত এবং রাখাল পাল এসে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি আমাদের ইংলিশবাজারের নতুন গৌরব এবং আমরা দু-জনা আর কখনো 'সুদামা' নাটকে সুদামা ও কৃষ্ণ সাজব না। ওই নতুন ছেলেটি, ওই বংশীবিহারীর রুক্মিণীও খুব চমৎকার হয়েছে।'

ব্যস, রাতারাতি আমরা মিলন সংঘের সমকক্ষ হয়ে গেলাম। ছ-মাসের মধ্যে 'সুদামা', এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় দু-বার অভিনীত হল। অন্য দলের লোকেরা এসে আমাকে ও বংশীবিহারীকে নিজেদের দলে টানার জন্য কয়েকবার প্রলুব্ধ করে ব্যর্থ হল, আমাদের ক্লাবের জয় জয়কার বাড়তে লাগল। 'দেবলাদেবী', 'তরণীসেন', 'কর্ণার্জুন' — আমার ও বংশীবিহারীর বিজয়-বৈজয়ন্তী ইংলিশবাজারের নাট্যামোদীদের হৃদয়ে পতপত করে উড়তে লাগল। বংশীবিহারী, দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্য সমিতিতে মূল্যবান হয়ে উঠল এবং টিপুর বাড়ির পেছনকার আমবাগানের আমাদের আড্ডা একদিন বংশীবিহারীর বাসস্থলে অর্থাৎ পুরাটুলির নিবারণ চক্রবর্তী'র বাড়ির পেছনকার ঘরে গিয়ে গেড়ে বসল। এবং বংশীবিহারী অচিরে আমাদের কাছে শুধুমাত্র 'বংশী' হয়ে গেল।

আমরা ততদিনে বংশীর পরিচয় বিস্তৃতভাবে জানলাম সে এক বিচিত্র কাহিনী। বাল্যকালেই মা-বাবাকে হারিয়ে সে বর্ধমানে তার কাকার ওখানে মানুষ হয়েছে। ভাগ্যিস তার বাবা মরার আগেই তার একমাত্র দিদির বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বংশী কাকার কাছে প্রায়ই বেদম মার খেত। কিন্তু মারের চোটে ভূতও পালায়, তাই মানুষ বংশীও এক রাতে কাকার বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ 'লক্ষ্মী-অপেরা'তে যোগ দিয়ে হারিয়ে গেল। প্রায় সাত আট বছর কাটার পর কলকাতার অনতিদূরস্থ বোড়াল গ্রামে দলের সঙ্গে গিয়ে হঠাৎ তার মনে পড়ল যে সেই গ্রামেই তার দিদির শ্বশুরবাড়ি। একই মাতৃগর্ভের স্মৃতি হঠাৎ তাকে বাধ্য করল দিদিকে

খুঁজে বের করতে। দিদি তাকে বুকে টেনে সানন্দে কাঁদতে লাগল। কিন্তু দিদিকে দেখে তার বুক ভেঙে গেল। ভগ্নিপতি জনার্দন বসু দারিদ্র্যভারে অকালেই ন্যুব্জদেহ হয়ে পড়েছে। মাত্র দশ বিঘে জমি দিয়ে সে তার বউ ও চারটি ছেলেমেয়ের ক্ষুধা ও লজ্জাকে সামাল দিতে পারছে না। প্রায় আটচালার মতো যে বাড়িতে তারা মাথা গুঁজে আছে তা হয়তো কোনো এক কালবৈশাখীর দাপটে উড়ে যাবে। আর দিদি? তার হারিয়ে-পাওয়া দিদি? রুগ্ণ, শীর্ণা, ছিন্ন শাড়ি পরিহিতা, তবু তার দু-চোখে অন্তহীন মমতা টলটল করছে। ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার কী কান্না!

তারপর থেকেই বংশীর দায়িত্ব বাড়ল। সে নিজের স্বল্প উপার্জন থেকেই যতটা পারত দিদিকে পাঠাত, বছরে একবার দু-বার, দু-তিন দিনের জন্য দিদির ওখানে গিয়ে তার অপার্থিব স্নেহসুধায় সিঞ্চিত হয়ে ফিরে আসত।

কিন্তু যুগ বদলাচ্ছিল। ক্রমেই থিয়েটার, বিশেষ করে ভ্রাম্যমাণ যাত্রার দলের বাজার লুপ্ত হয়ে গেল। সিনেমা সর্বগ্রাসী হয়ে শুরু করল রাজত্ব। তাই 'তরুণ অপেরা পার্টি' ইংলিশবাজারে জমাতে পারল না। এদিকে ছ-মাসের মাইনে বাকি ছিল। দু-মাসের মাইনে দিয়ে 'অপেরা পার্টি' লুপ্ত হয়ে গেল। তখন বংশী ইংলিশবাজারেই রয়ে গেল। হাতে মাত্র কয়েকশো টাকা। তাই দিয়েই সে বাজারের মধ্যকার পরেশবাবুর বাড়ির বাইরে এক পানের দোকান দিয়ে বসল। কপাল ভালো তাই দোকানটা মোটামুটি চলতে থাকল। সেই বাড়িওয়ালার বাড়ির পেছনদিকের একটা ছোটো ঘরে থাকার বাসাও পেয়ে গেল সে। কোনোমতে জীবন চলতে লাগল। তার সাত-আট মাস বাদেই 'দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্য সমিতি' তাকে আবিষ্কার করল।...

উকিল দেবকুমার গুহ আবার বাধা দিল, বলল, 'একটা কথা ভরত গুপ্ত —'

ভুরু কুঁচকালো ভরত, 'আবার কী হল?'

দেবকুমার গুহ বলল, 'একটা রেলের ইঞ্জিন যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে চলছে তো চলছেই।'

ভরত গুপ্ত বলল, 'আরো একটা লাইন বললেই বুঝতে পারতে ইঞ্জিন কোন ট্রেনে গিয়ে লাগবে; হাওড়া মেলে, না দার্জিলিং মেলে?'

অবিনাশ চাটুজ্জেকে বলতে শোনা গেল, 'বলো বলো, এবার সেই লাইনটা বলো ভরত গুপ্ত, রেগো না।'

ভরত গুপ্ত আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলে, 'তার সাত-আট মাস বাদেই 'দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্য সমিতি' বংশীবিহারীকে আবিষ্কার করল এবং আমিও এক বন্ধুকে খুঁজে পেলাম তার মধ্যে।'

দেবকুমার গুহ হেসে জানাল, 'বাবাঃ এতক্ষণে বুঝলাম যে তুমি এক বন্ধুর গল্প বলতে যাচ্ছ। কিন্তু মুখবন্ধটা বড়োই দীর্ঘ মনে হচ্ছিল, তাই ...'

ভরত গুপ্ত জানায়, 'বন্ধুগণ, তোমরা জগদ্বিখ্যাত লেখক আনাতোঁল ফ্রাঁস্-এর 'দি প্রকিউরেটর অফ জুডিয়া' নামক গল্পটি পড়লে উপলব্ধি করবে যে অনেক সময় সুদীর্ঘ মুখবন্ধও গল্পের খাতিরেই দীর্ঘায়ত হয়।'

অবিনাশ চাটুজ্জে বলল, 'দোহাই ভরত গুপ্ত, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস আমাদের মাথায় ঢুকবে না। তার চেয়ে তোমার গল্পটিই বলতে থাকো। দেবকুমার গুহ উকিল তো কেবলই ফুট কাটছেই।'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

ভরত গুপ্ত-ও সহাস্যে বলল, 'এবার কিন্তু সবাই স্পিকটি নট। গল্পটা শোনো—'

আবার শুরু করল ভরত গুপ্ত।

তারপর বছরখানেক কেটে গেল। একদিন দেখা হতেই মুখ বেজার করে বংশী বলল, 'ভাই ভরত, পানের দোকানটা পরেশবাবুর মামাতো ভাইকে বেচে দিলাম।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কিরে বংশী! তাহলে তোর চলবে কী করে? তোর এই দুর্বুদ্ধি হল কেন?'

বংশী একটু হেসে বলল, 'আসলে বেশ কিছুদিন ধরে আমার খারাপ লাগছিল। শহরের সবাই এখন আমাকে চেনে, তুই যে আমার প্রাণের বন্ধু তাও জানে সবাই। তাই...'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আমি তোর প্রাণের বন্ধু হওয়ার জন্য তোর দোকানটা বেচে দিলি!'

খানিকটা অপরাধীর ভঙ্গিতে বংশী বলল, 'তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। ওই যে তোরা বলি 'পেস্টিজ'—'

আমি বললাম, 'প্রেস্টিজ'।

সে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, তাই! সারাজীবন কী পানবিড়ির দোকানদারি করব?'

'তাহলে খাবি কী করে?'

'তোরা খাওয়াবি, তুই।' পরম নির্ভরতার হাসি হাসল বংশী।

আমি থতমত খেয়ে বললাম, 'আমি!—আমি!'

আমার কথা শেষ করতে দিল না বংশী, বলল 'কী করে খাওয়াবি জানিস? চাল ডাল টাকাপয়সা দিয়ে নয়, আমায় খানচারেক নাচগানের মাস্টারি জোগাড় করে দিয়ে। হপ্তায় তিনদিন করে শেখাব, মাসে দেড়শো দুশো টাকা করে নেব—ব্যস!'

ওর প্রস্তাবটা আমার ভালো লাগল। মাস দুই লাগল বংশীকে গানের মাস্টার করে দিতে। গন্ধর্বদলের প্রত্যেকেই ক্যানভাসিং করতে লাগল চেনা লোকদের এবং আত্মীয়দের বাড়িতে গিয়ে। ফলে মাস দুই বাদে দেখা গেলে যে বংশীবিহারীর পাঁচটা মাস্টারি জুটে গেছে। অচিরেই সে বংশীমাস্টার নামে ইংলিশবাজারের কয়েকটা পাড়াতে অভিহিত হতে লাগল।

দিন কাটতে লাগল। বংশী ব্যতীত গন্ধর্ব নাট্যসমিতির বাকি সবাই লেখাপড়ায় ফাঁকি দিত না বলেই তাদের বছরে তিন-চার বার থিয়েটার করাতেও কেউ আপত্তি করত না।

মাস্টারি করতে করতে বছরে দু-বার করে বংশী দিদির স্নেহের স্বাদ পাবার জন্য কলকাতার উপকণ্ঠস্থিত সেই বোড়াল গ্রামে বেড়িয়ে আসত।

এক বছর বাদে বাবা মারা গেলেন। অভিভাবক হলেন কাকাবাবু। আর মায়ের চোখের মণি আমি এবার নীলকান্তমণি হয়ে দাঁড়ালাম। তাই আরো মনে দিয়ে লেখাপড়া শুরু করলাম। তখন আমি কলেজে পড়ছি, আই.এসসি.।

তিন বছর কেটে গেল। আমি অনার্সে বি. এসসি. ভালোভাবে পাস করলাম। ইতিমধ্যে আমার পড়াশোনার খরচ নিয়ে কাকাকে একদিন একটু বিরূপ মনে হতেই আমি চাকরির সন্ধানে ঘুরতে লাগলাম আর দরখাস্ত দিতে শুরু করলাম।

ইতিমধ্যে ইংলিশবাজারে শান্তিনিকেতনে শিক্ষিত এক সংগীত-বিশারদ দম্পতি এসে ডেরা বাঁধল এবং তিন-চার মাসের পরেই বংশীবিহারীর সব মাস্টারির অন্ত হয়ে গেল। তার যাত্রার দলের গান, কীর্তন, শ্যামাসংগীত কেউ আর শিখতে রাজি হল না।

মাস দুই বসে রইল বংশীবিহারী, তারপর একদিন আমায় বলল, 'ভরত, আমি ক-দিনের জন্য দিদির ওখানে জিরিয়ে আসিগে।'

বললাম, 'বেশ তো ঘুরে আয়, কিন্তু কী করবি এবার?'

বংশী বলল, 'ভাবছি। তুই-ও ভাব।'

কিছু বললাম না। আমি আর কী করতে পারি? আমার ক্ষমতা যেটুকু ছিল তা করেছি।

বংশী পরদিনই কলকাতা চলে গেল।

কিছুদিন ফাঁকা ফাঁকা লাগল। গন্ধর্বদলের প্রত্যেকেই বংশীর অবস্থান্তর সম্পর্কে দুঃখপ্রকাশ করল। তার দ্রৌপদী, শৈব্যা আর মন্দোদরীর ভূমিকায় স্মরণীয় অভিনয়ের স্মরণে হা-হুতাশ করল, তারপর আমরা সবাই তাকে ভুলতে আরম্ভ করলাম কারণ বংশী ফিরে এল না, তার কোনো চিঠিও পেলাম না। আমরাও আমাদের কর্মজীবন শুরু করার জন্য দরখাস্ত এবং নানা অফিসে ও শহরে ইন্টারভিউ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। 'দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্যসমিতি' শুধু একটা নাম হয়ে আমাদের স্মৃতির কোঠায় ধূলিধূসর হতে থাকল। মাসকয়েক বাদে, আমার এক পদস্থ পিসতুতো দাদার সুপারিশে, মোটামুটি ভদ্র মাইনেতে আমি বর্ধমানের এক নামকরা বেসরকারি ইস্কুলে মাস্টার হয়ে, মায়ের পা ছুঁয়ে, সেখানে চলে গেলাম। বছরখানেক পরেই অত্যন্ত সুযোগ্য ও মূল্যবান শিক্ষক বলে স্কুলের সবাই আমাকে প্রীতির চোখে দেখতে লাগলেন। 'দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্যসমিতি'র বন্ধুরাও ইতিমধ্যে জীবনের তাগিদে ছিটকে ছিটকে ইংলিশবাজার ছেড়ে নানা জায়গায় চলে গেল। টিপু এক ব্যাংকের চাকরি পেয়ে নৈহাটি গেল, ভোলা তার মামাবাড়ি মুর্শিদাবাদে গিয়ে একটা মনিহারি দোকান দিয়ে জাঁকিয়ে বসল, সন্তোষ সাব-ডেপুটি হয়ে জলপাইগুড়ি গেল আর বিজু ডাক্তারি পড়তে গেল কলকাতায়। প্রথমদিকে বছরে দু-তিনটে করে পোস্টকার্ড পেলাম, তারপরে আর যোগাযোগ হয়নি। দু-তিন বছর বাদে হারিয়ে গেল সবাই।

বর্ধমানে ইস্কুলের কাছাকাছি এক বাড়ির দুই কামরাবিশিষ্ট নীচতলার একাংশে থাকি, নিয়মিত পড়াশোনা করি এবং পড়াই। নাটক নভেল পড়ি। মাঝে মাঝে 'দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্যসমিতি'র কথা মনে পড়ে, থিয়েটার করার জন্য মন আনচান হয়, কিন্তু বর্ধমানের সমাজে চরিত্রবান এক শিক্ষক হিসেবে আমার সুনাম হচ্ছে, থিয়েটার দল তৈরি করার কথা মাথায় আসতেই, সযত্নে তাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করলাম।

আরো তিন বছর কেটে গেল।

আমার এক মাসতুতো বোনের বিয়েতে যেতে হল কলকাতা। যাদবপুরে মাসিমার বাড়ি। বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। মাসিমার পীড়াপীড়িতে আরো দু-দিন রয়ে গেলাম। বিয়ের

পরদিন বিকেলে বাজারের পথে যাচ্ছিলাম কিছু কিনতে, হঠাৎ পিছন থেকে একজন কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'ভরত'—

ঘুরে তাকাতেই দেখি বংশী হাসছে। বংশীবিহারী দাস, মানে বংশী, মানে রুক্মিণী, জনা, দ্রৌপদী, মন্দোদরী চরিত্রের অভিনেত্রী আমার বন্ধু বংশী।

বংশী হাসতে হাসতে বলল, 'চিনতে পারছিস তো?'

আমি কপট ভঙ্গিতে বললাম, 'না তো, আপনি কে?'

'কে!' কেমন যেন থতমত খেল বংশী, অবাক হয়ে তাকাল, ম্লান হয়ে গেল তার মুখ।

দু-সেকেন্ড থেমে আমি দু-হাত বাড়িয়ে বংশীকে বুকে টেনে নিয়ে বললাম, 'চিনেছিরে গাধা, দেখামাত্রই চিনেছি, কিন্তু আমিও যে একজন ভালো অভিনেতা তুই ভুলেই গেছিস মনে হচ্ছে।'

আমাকেও পালটা বুকে চেপে ধরে বংশী বলল,'মানছি গুরু, তুই একজন বড়ো অ্যাক্টর।' তারপর সে হাহা করে হেসে উঠে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'বাব্বা, আমার তো আর একটু হলেই ভিরমি লাগত। হে ভগবান।' বলতে বলতে তার দু-চোখে জল এসে গেল, পকেট থেকে রুমাল বের করে দু-চোখ মুছে বলল, 'ইস, আমি। ইয়ে-একটা সেন্টিমেন্ট। হা হা হা —'

বুঝলাম বংশী বলছে যে সে 'সেন্টিমেন্টাল'। হেসে তার হাত ধরে বললাম, 'চল্ বংশী, এখন চা জমবে খুব —'

বংশী হেসে বলল, 'চল্ ভরত।'

কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম আমরা। চা এল। তখন ভালো করে তাকালাম বংশীর দিকে। চকচক করছে চোখমুখ, কাপড় জামা পরিষ্কার, পায়ের চম্পলটা শোভন। বুঝলাম যে মোটামুটি এখন ভালোই আছে আমার বন্ধু।

চায়ে এক চুমুক দিয়ে বংশী বলল, 'প্রায় সাড়ে চার বছর বাদে রে —'

আমি বললাম, 'একটাও চিঠি দিসনি, তোকে না চেনাই তো উচিত।'

মাথা নাড়ল বংশী, 'ঠিক, আমারই ত্রুটি, কিন্তু কী করব ভাই, গিয়ে দেখি কী কষ্ট দিদিদের। জামাইবাবুর ক্যানসার, আজ যায় কি কাল যায়। বড়ো ভাগ্নে সবে কোনো মতে ম্যাট্রিক পাস করেছে কিন্তু তার পরেরটা ক্লাস সেভেনে দু-বছর ফেল করার পর এক বাড়িতে চাকর হয়ে গেল। তার পরেরটা মেয়ে, সে-ও এক বাড়িতে ঝি হয়ে গেল। শেষেরটা দশ বছরের এক ছেলে, মাঝে মাঝে হাটে গিয়ে লাউ আর পেঁপে বিক্রি করত। মাসকয়েক বাদে ভগ্নিপতি মারা গেল। তাদের সাহায্য করার জন্য আমি পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গান গাইতে নাচতাম আর চানাচুর বিক্রি করতাম। সকালে গড়ের মাঠে, বিকেলে যাদবপুরে। রাতের বেলা কাগজের ঠোঙা তৈরি করতাম, দিদি সেগুলো নিয়ে কয়েকটা দোকানে জোগান দিত। চিঠি লেখার কথা মনে এলেই লজ্জা হত। ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো তখন উড়ছি, সেই সব দুরবস্থার কথা তোকে লিখে জানাতে লজ্জা হত, তাই...'

বংশী থামল।

আমি বললাম, 'আর আমি তোর ঠিকানা জানতাম না। শুধু তাও নয়, বাবা মারা যাবার

পর আমার জীবনও পালটাতে লাগল। ওই যে তুই বললি ঝড়ের মুখে শুকনো পাতা, আমিও সেই মতো হলাম। কত চাকরির দরখাস্ত, কত উমেদারি, কত ইন্টারভিউ-এর শেষে বর্ধমানের এক ইস্কুলে এসে ঠেকেছি —'

বংশী প্রশ্ন করল, 'বিয়ে করেছিস?'

মাথা নাড়লাম, 'না, ও নিয়ে মাথা আমি ঘামাচ্ছি না, ঘামাচ্ছেন আমার মা। তিনি আমার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, কিন্তু আমি এখনো মনস্থির করিনি —'

বংশী বলল, 'ভরত, আমার ওখানে চল্, আজই, এক্ষুনি—'

আমি বললাম, 'পাগল, মাসিমাকে না বলে কী করে যাব? বরং তুই আমার মাসির ওখানে চল্, ওখানেই খেয়েদেয়ে একটু জিরিয়ে তারপর তোর ওখানে যাব।'

তাই হল।

প্রায় দু-ঘণ্টা পরে মাসির বাড়ি থেকে বোড়াল গ্রামের দিকে রওনা হলাম আমরা দু-জনে।

গ্রামের একপ্রান্তে একটা ছোট্ট একতলা বাড়ি। এক ইটের দেয়াল মনে হল। বাইরেটা বিবর্ণ। বংশী বাড়িটার সামনে পৌঁছে হেসে বলল, 'এই আমার গরিবখানা।'

প্রশ্ন করলাম, 'তোর নিজের?'

বংশী সবেগে মাথা নাড়ল, 'না না, আমি মাসে তিরিশ টাকা ভাড়ায় থাকি এখানে। পালিত ঠাকুমাদের বাড়ি। দিদিদের এখান থেকে তিন-চার মিনিটের পথ।' তারপরে সে তার বাসার দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা মেরে অনুচ্চকণ্ঠে বলল, 'খোলো।'

ভেতর থেকে একটি স্ত্রীলোকের মিষ্টি গলা ভেসে এল, 'কে?'

বংশী হেসে বলল, 'আমি।'

আমি যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানে, আমার ডানদিকে একটা বুড়ো আতাগাছ। আমি দেখলাম যে দরজাটা কয়েক সেকেন্ড বাদেই দড়াম করে খুলে গেল এবং সেখানে এসে দাঁড়াল একটি স্ত্রীলোক এবং সে যুবতী। সঙ্গে সঙ্গেই সে বংশীবিহারীকে বকতে শুরু করল, 'তোমার কী আক্কেল বলো তো। তুমি বেলা একটার মধ্যে ফিরে এসে খেয়েদেয়ে দোকানের কাজে যাদবপুরে যাবে বলে গেলে, আর আমি না খেয়ে তোমার জন্য বসে আছি—'

আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম যে যুবতী বংশীর বউ। তার বয়স উনিশ কুড়ি হবে।

বংশী অপরাধ-মিশ্রিত হাসি হেসে বলল, 'শোনো বউ শোনো, আজকে হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। যাদবপুরের রাস্তায় দেখা হয়ে গেল আমার সেই প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে। সে কিছুতেই ছাড়ল না। তার মাসিমার বাড়িতে বোনের বিয়েতে এসেছে, সেখানে নিয়ে খাইয়ে দাইয়ে তবে ছাড়ল—'

বংশীর বউকে এতক্ষণ ধরে আমি আতাগাছের আড়াল থেকে দেখছিলাম। আমি দরজা থেকে বাঁদিকে দাঁড়ানো বংশীর আড়ালে। তাই সে আমায় লক্ষ করেনি।

কিন্তু যতক্ষণ সে বংশীকে বকছিল ততক্ষণ আমি তাকে দেখছিলাম। আটপৌরে একটা ডুরে শাড়ি পরনে, কপালে আর সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। দেখামাত্রই মনে পড়ল কালিদাসের একটি নায়িকার বর্ণনা —'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠাঃ' — বাঃ।

বংশীর বউ বলল, 'তোমার প্রাণের বন্ধু, মানে সেই ভরতবাবু?'

বংশী হেসে বলল, 'হ্যাঁ অমলা। আমি তাকে ধরেও নিয়ে এসেছি। ওই যে, ওই দ্যাখো—' বলে বংশী আমার দিকে ঘুরে আঙুল তুলে দেখাল।

'অ্যাঁ!' বলেই ডানদিকে ঘুরে তাকাল বংশীর বউ, আমাকে এতক্ষণে দেখতে পেল।

'ওমা!' বলেই বংশীর বউ তার মাথার ঘোমটাটা একটু সামনের দিকে টানল, তারপর আমাকে সলজ্জ হেসে আহ্বান জানাল, 'আসুন ভরতবাবু, আসুন ঠাকুরপো —'

কী মিষ্টি বংশীর বউ-এর আন্তরিকতা-ভরা ডাক! চোখেমুখে কি সরলতা এবং প্রখর-তবু-স্নিগ্ধ তার শ্যাম এবং গৌরবর্ণের মিশ্রিত রূপ! আমি এক নিমেষেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম, এক মুহূর্তেই আমার মন আমার কানে কানে বলল, 'ভরত, আমি মজেছি।'

'আয় ভরত' — বংশী ডাকল।

যুক্ত করে নমস্কার জানলাম বংশীর বউকে, 'নমস্কার বউদি —'

আমার এই ভদ্রতার প্রকাশে একটু লজ্জা পেয়ে অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে দু-হাত জড়ো করে অমলা বলল, 'আসুন ঠাকুরপো, আসুন।'

বংশীর বাসাতে ঢুকলাম। দারিদ্র্য, তবু পরিচ্ছন্ন সুরুচিপূর্ণ বাইরের কামরাটি। একটা ছোটো তক্তপোশের ওপর সুদৃশ্য একটা মাদুর, হাতলওলা দুটো সাধারণ কাঠের চেয়ার, একটা ছোটো টেবিল। ডানদিকের দেয়ালে রাধাকৃষ্ণের একটা ছবি এবং তার বিপরীতে, বাঁদিকের দেয়ালে বংশীবিহারী এবং তার বউ অমলার ফটো। বংশী একটা হাতলবিহীন চেয়ারে সেজেগুজে উপবিষ্ট আর তার বামদিকে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অমলা। দু-জনেরই হাসিমুখ। মনে হল যেন অনন্তকালের রাধাকৃষ্ণ আর কলিকালের এক রাধাকৃষ্ণ; এক যুগল, আর এক যুগলকে নিরীক্ষণ করছে।

আমি চেয়ারে বসতেই অমলা তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা দু-জনে গল্প করতে থাকো। আমি চা করে নিয়ে এসে তোমাদের গল্প শুনব।' তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'কেমন ঠাকুরপো?'

আমি নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত তুলে বললাম, 'তথাস্তু।'

বংশী এবং অমলা দু-জনেই হেসে উঠল, হাসতে হাসতে অমলা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। আর আমার দৃষ্টি তার গমনভঙ্গিতে নিবদ্ধ হল।

কী ছন্দোময় তার পরিমিত এবং উঁচু শ্রোণীদেশের মৃদু দোলা। আমি মনকে বললাম, ছিঃ, ছি ছি। মন জবাবে বলল, 'আমি অসহায়।'

বংশী সহাস্যে বলল, 'কী ভাবছিস রে ভরত?'

আমি চমকে বংশীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বউদিকে দেখে মনে হচ্ছে খুব ভালো মেয়ে— তোর কপাল ভালো বংশী।'

বংশী শব্দহীন হেসে গলা নামিয়ে বলল, 'সত্যি কপাল ভালো ভরত, সত্যি—'

অন্য চেয়ারটা আমার কাছে টেনে নিয়ে বসল বংশী, তারপর গলা নামিয়ে বলতে শুরু করল।

সে জানাল যে অমলা তার গরিব মাসির বাড়িতে বড়ো হচ্ছিল। মাসতুতো দুই ভাই আর দুই বোন তাকে পরগাছা বলে মনে করত, কারণ সে তাদের প্রত্যেকের ভাতের অংশ কমিয়ে দিচ্ছে। লেখাপড়া? বাপ যখন বেঁচে ছিল তখন স্কুলে তিন বছর পড়েছিল। বাপ একদিন গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেল, দোষ বাবারই ছিল। বাপ মারা যাবার ছ-মাস পরে একদিন সকালে মাকে বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। হার্টফেল। মাসি পরম যত্নে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল অমলাকে। তখন তার বয়স বারো। ক্রমে সে মাসি ছাড়া অন্য সবার কাছে গলগ্রহ হয়ে দাঁড়াল। অমলা তখন মাসির সংসারে প্রায় ঝি-গিরি করতে লাগল। তার বয়স যখন ষোলো তখনই বংশী ইংলিশবাজার থেকে দিদির বাড়ি এল। সে-সময় তাদের ও নিজের জন্য পায়ে ঘুঙুর বেঁধে 'চানাচুর গরম বাবু, বড়ো মজদার'— বলে নেচে নেচে সকালে গড়ের মাঠে, বিকেলে যাদবপুরে চানাচুর বিক্রি করে দিদির হাতে দশ পনেরো টাকা করে দিত, নিজের জন্য রাখত চার পাঁচ টাকা। একদিন রাত ন-টার সময় যখন সে দিদির বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে একটা পুরোনো মজা পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে কারো চাপা কান্নার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল। কে কাঁদে? নারীকণ্ঠ মনে হচ্ছে। অবশেষে পুকুরঘাটের ধাপে অমলাকে দেখতে পেল বংশী। মুখচেনা তো ছিলই, তাই পরোক্ষে দু-চারটে কথা বলার পর অমলা শান্ত হল। সেই থেকে মাঝে মাঝে বাজারে, পথে দেখা হত। চোখে চোখে নীরব কথা হতে হতে একদিন বংশী জানিয়েই দিল যে, সে অমলাকে বিয়ে করতে চায়। অমলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে করুণকণ্ঠে বলেছিল, 'কিন্তু খাবে খাওয়াবে কী, আমাকে নিয়ে থাকবে কোথায়?' জবাব দিতে পারেনি বংশী সেদিন।

ক-দিন পরে একটা ঘটনা ঘটল। আধমাইল দূরবর্তী গাঁয়ের শেষপ্রান্তে মাসির ননদকে একটা জরুরি খবর দিয়ে অমলা ফিরে আসার সময় দেখল যে তাদের গাঁয়ের একজন বিপত্নীক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, প্রায় সত্তর তাঁর বয়স, তিনি চলতে চলতে হঠাৎ এক গাছতলায় বসে পড়ে বুকের বাঁদিকে হাত রেখে গোঙাতে শুরু করলেন। তাকে দেখে অমলা ছুটে তাঁর কাছে গিয়ে 'কি হয়েছে দাদু' বলতেই কুণ্ডুমশাই তাকে বললেন তাঁর অবস্থার কথা, বললেন কাউকে খবর দিতে। অমলা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে দু-জন ছেলেকে ডেকে আনল। তারা রিকশা ডেকে প্রথমে কাছাকাছি নিবারণ ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যেতেই তিনি কুণ্ডুমশাইকে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ দিয়ে সুস্থ করলেন। সেদিনই তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে কুণ্ডুমশাই-এর বড়ো বড়ো তিনটে তিনতলা বাড়ি আছে। একটা বাড়ির একতলাতে থাকে কুণ্ডুমশাই-এর একমাত্র ছেলে সুশান্ত, সে-ই সব বাড়ির ভাড়া আদায় করে ব্যবসার নামে টাকা ওড়ায়। অবিবাহিত, বি.এ. পাস, চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স। তার বাবাকে কলকাতার সব-চেয়ে বড়ো ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করালে জানা গেল তার হার্টের বিপদ কেটে গেছে। প্রশান্ত কুণ্ডু বাড়ি ফিরেই অমলার বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে তাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, 'নাতনি তোমার কষ্টের কথা আমি জানতে পেরেছি ভাই, বলো, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?' তখন অমলা মাটির দিকে মুখ নিচু করে জানাল যে, সে একজনকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু তার একটা কাজ দরকার, যাতে সে তাকে নিয়ে আলাদা সংসার করতে পারে। প্রশান্ত কুণ্ডু বললেন, 'তুমি কিচ্ছু ভেবো না ভাই, বংশীকে আমি ডেকে

পাঠাচ্ছি, তোমার দায় এখন থেকে আমার।' তারপরে এক আশ্চর্য গল্পের মতো সব ঘটে গেল। কুণ্ডুমশাই বংশীকে ডেকে পাঠালেন। কথাবার্তা বলে তাকে তাঁর ভালোই লাগল এবং তিনি তাকে তার মুদি দোকানের দ্বিতীয় কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করলেন। কয়েকমাস বাদেই বংশীর চরিত্রগুণে এবং কর্মকুশলতায় আশ্বস্ত এবং প্রীত হয়ে তিনি তাকে তাদের বড়ো মনিহারি দোকানের ম্যানেজার করে দিলেন, মাইনে আটশো টাকা। শুধু তাই নয়, তিনিই পালিত-বুড়িকে বলে তার এই বাসা ঠিক করে দিলেন এবং একমাস বাদেই অমলার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওই বাড়িতে সংসার পাতিয়ে দিয়ে অমলাকে বললেন, 'যতদিন আমি বেঁচে আছি তোমার কোনো চিন্তা নেই নাতনি।' তারপর দেড় বছর কেটে গেছে। দোকানের জন্যই কিছু অর্ডার দেবার জন্য কলকাতা হয়ে যাদবপুরে থামাতেই তার প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে নাটকীয় পুনর্মিলন।

সব কথা শেষ করে হা হা করে হেসে বংশী বলল, 'জীবন মাঝে মাঝে যেন একটা রূপকথা হয়ে ওঠে রে ভরত।'

ঠিক তখুনি অমলা বাইরের কামরায় ফিরে এল, হাতে একটা বড়ো থালার ওপর দুটো প্লেটে গরম গরম ফুলকো লুচি আর শুকনো তরকারি, সঙ্গে দুই গ্লাস জল। আমাদের সামনের টেবিলে তা নামিয়ে হেসে বলল, 'আপনাদের গল্পের সঙ্গে এই লুচি তরকারি জমবে ভালো। খেতে খেতে গল্প করুন ঠাকুরপো, আমি চায়ের জল চাপিয়েছি —' বলেই ত্বরিতপদে আবার রান্নাঘরে চলে গেল অমলা।

লুচি তরকারি খেতে খেতে মনে হল যে জীবনে লুচি তরকারির এমন স্বাদ ইতিপূর্বে কখনো পাইনি। তারপরে চা এল।

অমলা একটা টুলের ওপর বসল। ভারি সুন্দর তার বসার ভঙ্গিটি। কথা বলতে বলতে ও শুনতে শুনতে তার সমুন্নত বক্ষযুগলের ওঠানামা লক্ষ করতে করতে আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল এবং ঘণ্টা দু-এক বাদে হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়তেই যেন ঘোর কাটল এবং তক্ষুনি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বংশী এবং অমলার ওখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

পেছন থেকে অমলার গলা ভেসে এল, 'আবার আসবেন ঠাকুরপো —'

বংশীও যোগ দিল, 'হ্যাঁ ভরত, আবার এই শনিবারে চলে আসিস।'

জবাবে বললাম, 'বলতে পারছি না, চেষ্টা করব।'

মাসির ওখানে সেই রাত কাটিয়ে পরদিন দুপুরেই খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেল হতে না হতেই বর্ধমান ফিরে এলাম। কিন্তু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। মন ফিরে ফিরে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতে চাইল — বন্ধুর জন্য নয়, বন্ধুপত্নীর জন্য, যার নাম অমলা।

সোমবার থেকে শনিবারের দুপুর পর্যন্ত যন্ত্রের মতো স্কুলে পড়ালাম, নিত্যকর্ম করলাম, তারপর শনিবারের বিকেল হতেই বাস বদল করে বংশীর গ্রামে পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে গেল।

দরজা খুলেই আমাকে দেখে অমলা একগাল হেসে বলল, 'এসেছেন ঠাকুরপো। আসুন আসুন, কী ভাগ্যি —'

আমি তার দিকে তাকিয়ে গাঢ়কণ্ঠে বললাম, 'সৌভাগ্য আমারও বউদি।'

অমলা আমার কথার গূঢ় অর্থ অবশ্যই বুঝতে পারল না।

বাইরের ঘরে বসার পর আমি প্রশ্ন করলাম, 'বংশী?'

অমলা বলল, 'সে তো দোকান বন্ধ করে রাত দশটায় বাড়ি ফিরবে। ওদের ছুটি শুধু বিষ্যুদবারে, দুপুরের পর।'

অমলা আমায় চা ও জলখাবার দিয়ে গল্প করতে লাগল। তারপরে রান্না করতে গেল। তখন আমি একটা মাসিক পত্রিকা সঙ্গে নিয়েছিলাম, তাই পড়তে লাগলাম। খানিক বাদে আর এক দফা চা করে দিল অমলা। চা খেতে খেতে কয়েক মিনিট অমলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কামরার বাতাসে আমি তার দেহের সুবাস পেতে লাগলাম। তারপর সে রান্না শেষ করতে গেল।

রাত দশটায় বংশী ফিরে এল। আমাকে দেখেই ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এসেছিস! বাঃ বাঃ—অমলা—'

ডাক শুনে অমলা এসে হাসিমুখে দাঁড়াল, 'এসেছ!' লক্ষ করলাম বংশীকে দেখেই যেন তার দু-চোখে দুটো বাতি জ্বলে উঠল। বাঃ। কিন্তু তবু কেমন যেন একটা ইয়ে, একটা কীট আমাকে দংশন করতে লাগল।

তারপরে অনেক রাত পর্যন্ত নানা রকমের গল্প, 'দি গ্রেট গন্ধর্ব নাট্যসমিতির কথা; টিপু, বাঁকু, ন্যাপলা আর সন্তুদের কথা।

হঠাৎ বংশী প্রশ্ন করল, 'তুই বিয়ে কবে করবি?' আমি সংক্ষেপে বললাম, 'ও নিয়ে এখনো ভাবিনি।' বংশী হেসে বলল, 'এখন ভাব।'

আমিও হেসে বললাম, 'ভাবব।'

অমলা খিলখিল করে হেসে উঠলে যেন একটা পাহাড়ি ঝরনার শব্দ শুনলাম।

পরদিন রবিবার। রবিবারেও মনিহারি দোকানটা খোলা থাকে কারণ সেদিন ছুটি বলে কেনাবেচা বেশি হয়, তাই সকাল আটটার পরে বংশী তার চাকরিতে চলে যায়। তখন আমি আর অমলা। দু-জনে গল্প করি। সেদিন রান্নাঘরেও টুল নিয়ে বসলাম। অমলা রান্না করে, আমি গল্প করি। সরল অথচ বুদ্ধিমতী অমলা, নানা দুঃখের ভেতর দিয়ে বড়ো হয়েছে কিন্তু তবু হাসিখুশি, দেখে অবাক লাগে।

সেদিন কথায় কথায় অমলা বলল, 'আপনার বন্ধু আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার অনেক আগে থেকেই আপনার কথা বলত। আপনি তার প্রাণের বন্ধু—'

আমি বললাম, 'ঠিকই, বংশী আমার প্রাণের বন্ধু।'

দুপুর একটার পর বংশী বাড়ি ফিরল, আমরা দু-জনে একসঙ্গে বসে খেলাম। অমলা নানা রকম রেঁধেছে আর তার হাতের গুণ আছে।

তিনটে পর্যন্ত বকবক করে বংশী দোকানে ফিরে গেল। আরো এক ঘণ্টা বাদে চা-টা খেয়ে আমি বিদায় নিলাম নিতান্তই কর্তব্যের দায়ে।

অমলা মিষ্টি হেসে বলল, 'আবার আসবেন ঠাকুরপো, নিশ্চয়ই আসবেন কিন্তু—'

হেসে মুখে বললাম, 'চেষ্টা করব।' কিন্তু মনে মনে বললাম, 'আসব, অবশ্যই আসব।'

এবং তারপর থেকে প্রতি শনিবারের বিকেল হলে আমার পায়ের জুতো যেন সেই রোমান দেবতা মার্কারির পায়ের পাখনাওলা জুতো হয়ে দাঁড়াত। সেই জুতোর চাপে বর্ধমান থেকে হাওড়া, হাওড়া থেকে বোড়াল গ্রামে বংশীর বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলাম, তারপর অধিকাংশত অমলার সান্নিধ্যে কাটত, ফিরতাম রবিবারের রাতে। যখনই যেতাম, ফল মিষ্টি নিয়ে যেতাম। বংশীর বাড়িতে থাকতাম, মাঝে মাঝে তার দোকানে গিয়ে সকালে আধঘণ্টা বসতাম কিন্তু মন পড়ে থাকত অমলার কাছে। আমার মন প্রজাপতি হয়ে তার চারদিকে উড়ে বেড়াত তখন।

আট-নয় মাস কেটে গেল। পুজো এসে গেল। মা ঘন ঘন চিঠি লিখছিলেন তাই ইংলিশবাজারে যেতেই হল। যাওয়ার আগে অমলার জন্য একটি দামি তাঁতের শাড়ি আর বংশীর জন্য ধুতি কিনে তাদের দিলাম। শাড়ি দেখে অমলার মুখে কী আনন্দের হাসি, বংশী অভিভূত। তখন আমার মনে একটু বেদনাবোধ হল, ওই সুন্দর তাঁতের শাড়িটা পরেও কিন্তু অমলার রূপ পূর্ণতা পাবে না কারণ সে প্রায় নিরাভরণা। আহা, কিন্তু আমি গয়না গড়িয়ে দিলে যে ভালো দেখাবে না।

প্রায় বারো আনা মন অমলার জন্য রেখে ইংলিশবাজারে গেলাম।

মা অনেক রোগা হয়ে গেছেন। আমায় দেখে মা-র চোখেমুখে কী আনন্দ। আমাকে একসময়ে বললেন, 'বাবা রে তুই বর্ধমানে বাসাটা বদল কর্, এমন একটা বাসা ঠিক কর্ যেখানে বউমাকে নিয়ে আমি থাকতে পারি—এখানে আমার একা একা আর ভালো লাগছে না।'

আমি লঘুকণ্ঠে বললাম, 'তোমার বউমাটি কোথায়?'

মা হেসে বললেন, 'যে আমার ছেলের বৌ হবে তাকে এবার খুঁজে বের করব।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'মা, এখনো সময় হয়নি — তোমাকে পরে বলব।'

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, পরে বললেন, দেরী করা আর চলবে না। আর, আমাকে নিয়ে যা এখান থেকে। ঠাকুরপো, তোর কাকিমা, তাদের ছেলেমেয়েরা, সবাই আমাকে ভালোবাসে — তবু...।'

বললাম, 'বুঝেছি। যত তাড়াতাড়ি হয় চেষ্টা করব —'

লক্ষ্মীপুজো শেষ হতেই মাকে বললাম, 'মা আমার তিনটি ছাত্রকে পড়াতে হয় তাই বর্ধমানে ফিরে যেতেই হবে।'

'তোদের ইস্কুল তো —'

মাথা নাড়লাম, 'না মা, ছুটি কাটানো মুশকিল, কর্তব্য আর দায়িত্বের ব্যাপার,—তোমার ছেলের মাস্টারিতে সুনাম হয়েছে।'

মা আমার মাথায় হাত রাখলেন, বললেন, 'তোর আরো সুনাম হবে বাবা।'

মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ট্রেনে চাপলাম। সারা পথ মাকে মিথ্যে কথা বলার জন্য অপরাধবোধ হতে লাগল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে আনন্দ হতে লাগল। তাকে আবার দেখব, অমলাকে আবার দেখব। আমার সেই আনন্দ কেমন? যেমন কোনো মাতাল মদের দোকানের দিকে আরো মদ কিনতে যাবার সময় অনুভব করে। বর্ধমান পৌঁছেই একদিন বিশ্রাম করে পরেরদিন দুপুরবেলা বংশীর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

বংশী তখন দোকান থেকে খেতে এসেছে, সে আমাকে দেখেই লাফিয়ে কাছে এসে হাত ধরে চেঁচাল, 'অমলা, ভরত এসেছে—'

'তাই নাকি?' বলতে বলতে অমলা পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এল।

অবাক হয়ে তাকালা। এ কোন অমলা? তার পরনে একটা ভালো ছাপা শাড়ি, আর ঝকঝকে আভরণে ভূষিতা অর্থাৎ গয়না। সোনার গয়না। আজ তার গলায় সরু হলেও সোনার হার, দুই হাতে কয়েকগাছা করে সরু চুড়ি, কানে ছোটো ছোটো দুল। ঝলমল করছে গয়না, অমলার রূপের মাত্রা চারগুণ বেড়ে গেছে।

আমি মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে রইলাম।

অমলা হেসে প্রশ্ন করল, 'এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন, ছুটি কী শেষ হয়ে গেছে?'

'না।' মায়ের কাছে যে মিথ্যে কথা বলেছিলাম তারই পুনরুক্তি করলাম, 'না, তিনজন ছাত্রকে প্রাইভেটে পড়াই তো — তাই' — বলতে বলতে তার রূপসুধা পান করতে লাগলাম।

অমলা বলল, 'বসুন বসুন, চা করি—'

সে রান্নাঘরের দিকে মুখ ফেরাতেই বংশী বলে, 'না না, এখন চা কেন? খাবার সময় হয়েছে, এখন দুই বন্ধু একসঙ্গে খাব।'

আমি বললাম, 'আমি অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়ে এসে খাবারে ভাগ বসালে বউদি হয়তো আধপেটা থাকবেন —'

অমলা মাথা নেড়ে সহাস্যে বলল, 'মোটেই না, আমি সবসময়েই একটু বেশি করে রাঁধি — একটু পেটুক তো—'

আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম।

পরে অমলা বলল, 'আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন ঠাকুরপো, আমি ভাত বাড়ছি।'

দুই বন্ধু একসঙ্গে খেলাম।

খাওয়ার পর মশলা চিবোতে চিবোতে বংশী ইংলিশবাজারের বন্ধুদের খবর জানতে চাইল।

মাথা নাড়লাম, 'কারো সঙ্গে দেখা হয়নি, কেউ নেই আমাদের সেই ছোটো শহরে, সবাই বাইরে বাইরে। তাদের কোনো খবরই জানা নেই। শুধু তোর খবরটাই এখন জানি।'

দু-জনে খুব হাসলাম।

বংশী বলল, 'চলি রে দোকানে, তুই এবার একটু গড়িয়ে নে, আবার রাতে আড্ডা হবে। ওগো শুনছ — আমি এলাম।'

অমলা এসে দাঁড়াল দরজার পাশে।

'চলি।' বংশী বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলে।

'এসো।' বলল অমলা।

দু-জনে দু-জনের দিকে তাকাল, চোখে চোখে যেন কথা হল, তারপর বংশী চলে গেল।

'জিরোন ঠাকুরপো—আমি সব গোছাই।'

চলে গেল অমলা।

আমি তাকালাম দেয়ালে টাঙানো বংশী আর অমলার ফটোর দিকে। সেই ফটোর মুখোমুখি বিপরীত দিকের সেই রাধাকৃষ্ণের ছবির দিকে। রাধাকৃষ্ণ যেন বংশী আর অমলার দিকে তাকিয়ে আছে।

কেমন যেন একটা জ্বালা হতে লাগল। ঈর্ষা, ঈর্ষায় ছটফট করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

বিকেল হল, উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গেই ধূমায়িত চা নিয়ে অমলা এসে বসল, সঙ্গে একপ্লেট ছোটো ছোটো নিমকির মতো একটা কিছু। চা, চায়ের সঙ্গে অমলার সান্নিধ্য যেন নেশার মতো আমেজ সৃষ্টি করল দেহে মনে, আমি তাকালাম অমলার দিকে। কী অপূর্ব তার...।

অমলাও তাকাল আমার দিকে, মুহূর্তকাল, তারপরেই সে উঠে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'আমাকে পাড়ার এক দিদির বাড়ি যেতে হবে। তার এক মেয়েকে দেখতে আসছে একদল। আমায় সেখানে দু-তিন ঘণ্টা থাকতে হবে। আপনার একা একা কষ্ট হবে, তবু আমায় যেতেই হবে। আপনার জন্য মুড়ি আর হালুয়া রেখে যাচ্ছি, খেয়ে নেবেন কেমন?'

আমি বললাম, 'থ্যাংক ইউ বউদি, আমি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ একখণ্ড সঙ্গে এনেছি। দু'ঘণ্টা কেটে যাবে।'

'বেশ, তাহলে নিশ্চিন্ত হলাম।' বলে অমলা বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, আমি রবীন্দ্রনাথের শরণ নিলাম।

আড়াই ঘণ্টা বাদে অমলা ফিরে এল। এসেই বলল, 'আহা, একা একা বসেছিলেন—দাঁড়ান, এক্ষুনি চা করে দিচ্ছি।'

আমি সহাস্যে-সানন্দে সম্মতি দিলাম।

খিলখিল করে হেসে উঠে অমলা রান্নাঘরে গেল।

চা-পর্ব শেষ হলে অমলা রান্না করতে গেল। কিন্তু আমি অনেকক্ষণ তাকে দেখিনি এবং তার দেহসৌরভ পাইনি বলে রান্নাঘরে ঢুকে বললাম, 'একা একা বসে থাকতে ভালো লাগছে না বউদি, তুমি রান্না করো আর আমি এখানেই বসে বসে বই পড়ি।'

আমি নিজের কথায় চকিত হলাম, আমি 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে গেছি!

অমলা সহাস্যে বলল, 'বেশ বই পড়ুন কিন্তু কথা বলবেন না বেশি, তাহলে আপনাদের পরে রান্না হয়তো পছন্দ হবে না।'

বলেই সে হেসে উঠল।

আমিও সহাস্যে বললাম, 'বেশ, আমি 'স্পিকটি নট' হয়ে থাকব।'

তাই রইলাম কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখাতে আর চোখ বসল না, দু-চোখ মেলে আমি অমলার রূপসুধা পান করতে লাগলাম। শুধু পান নয়, যেন লেহন করতে লাগলাম।

দু-বার এদিক ওদিকে মশলার কৌটো খুঁজতে ও রাখতে যাবার জন্য হঠাৎ ঘুরতেই অমলা আমার সেই মুগ্ধ দৃষ্টি দেখল, কিন্তু নির্বিকারভাবে রান্না চালিয়ে গেল।

দৃষ্টিকটু লাগতে পারে বলে আমি খানিক বাদে বাইরের ঘরে ফিরে গেলাম।

একটু পরে বংশী ফিরে এল। আজ খানিকটা আগেই। তারপর আড্ডা, খাওয়াদাওয়া এবং রাত সাড়ে এগারোটায় স্বামী-স্ত্রী 'শুভরাত্রি' বলে নিজেদের শোবার ঘরে চলে গেল।

ঘুমিয়ে পড়লাম।

একটা দুঃস্বপ্ন হানা দিল একসময়ে। ঘুমের গাঢ়তা কমে গেল আর হঠাৎ পাশের ঘর থেকে খুব চাপা হাসির শব্দ ভেসে এল। বুঝলাম তা অমলার। সজাগ হলাম, উৎকর্ণ হলাম। খানিক পরে আবার একবার। তারপর সব চুপচাপ। অনেকক্ষণ আমার ঘুম এল না। উত্তপ্ত দেহমন নিয়ে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে পাশ ফিরে ফিরে অমলাকে প্রার্থনা করতে লাগলাম। আবার সেই সঙ্গে মনের ছোট্ট এককোণে যেন ধিক্কারও ধ্বনিত হল।

গলা শুকিয়ে গেছে। টর্চ জ্বালিয়ে জলের গেলাস খুঁজতে গিয়ে দেয়ালে বংশী আর অমলার ফটোর ওপর আলো পড়ল। তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে দু-জনে উলটোদিকের রাধাকৃষ্ণকে দেখে। সেদিকে টর্চ ঘোরালাম। যুগল রাধাকৃষ্ণ।

মনের ভেতরকার শয়তান মনটা বলল, 'দূর দূর, বংশীর নাম বংশীবিহারী হলেই সে কৃষ্ণ হবে, এমন কথা শাস্ত্রে বলেনি। শাস্ত্রে বলে যে রাধা পরস্ত্রী সুতরাং বংশী তার স্বামী হলেও কৃষ্ণ নয়। আয়ানপত্নী রাধার মনোহরণ করে আমিই তার কৃষ্ণ হব। প্রেমে দুর্নীতি বলে কোনো শব্দ নেই। প্রেমের রীতি সমাজের ছক-বাঁধা বুলির ধার ধারে না। ঘুম ভাঙল বংশীর ডাকে, 'ওঠ্, বেলা হয়েছে, চা খা।'

ঘড়ি দেখলাম, পৌনে আটটা।

চা খেলাম, এলোমেলো কথা বললাম দুই বন্ধু। হাত মুখ ধুয়ে আর এক দফা চা। তারপরে বংশী একাই জলখাবার খেয়ে দোকানে চলে গেল। খানিক পরে আমার জলখাবারপর্ব শেষ হল।

আধঘণ্টা বাদে আমার জন্য আবার চা নিয়ে এসে বসল অমলা।

বাইরে তখন মেঘ ও রৌদ্রের কিছুক্ষণ ধরে খেলা চলছে। তার ফলে রোদের প্রাখর্য কিছুটা কমে তা সোনালি হয়ে উঠেছে। পুবদিকের জানালা দিয়ে সেই রোদ এসে অমলার গায়ের সোনার গয়নাগুলোকে আরো সোনালি করে তুলেছে। অমলাও যেন সোনা-মাখা হয়ে আরো মোহময়ী হয়ে উঠেছে।

বলেই ফেললাম, 'গয়নাগুলোতে তোমাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে বউদি—'

'অ্যাঁ', যেন চমকে উঠল অমলা, তারপর হেসে বলল, 'আপনার বন্ধুর দান—সে এক পাগল—'

বললাম, 'তোমার জন্য বউদি। তুমিই তাকে পাগল করেছ।'

সলজ্জ হেসে মুখ ফেরাল অন্যদিকে। তারপরেই মুখ ঘুরিয়ে আবার তাকাল আমার দিকে, বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

আমি হাসলাম, 'বেশ, আমি অনুমতি দিলাম। জিজ্ঞেস করো।'

অমলা প্রশ্ন করল, 'আপনি বিয়ের কথা ভাবেন না?'

সহাস্যে বললাম, 'ভাবলে তো বিয়ে করেই ফেলতাম।'

'তাহলে এবার ভাবুন দয়া করে।' বলল অমলা।

'সময় হলে ভাবব বউদি।'

অমলা মাথা নাড়ল, 'না না, এবার বিয়েটা সেরেই ফেলুন।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'আমার মনের মতো পাত্রী পেলেই বিয়ে করব।'

অমলা তরল কণ্ঠে প্রশ্ন করল 'বেশ, এবার আপনার মনের মতো পাত্রী কেমনটি হলে বিয়ে করবেন তা বলুন।'

আমি অমলার দু-চোখের সঙ্গে আমার দু-চোখ মিলিত করে বললাম, 'বলব?'

মাথা দুলিয়ে অমলা হেসে উঠল, 'হ্যাঁ বলুন, বলুন।'

তার হাসির মধ্যে গতরাতের সেই বাসনা-তরল চাপা হাসিই যেন শুনতে পেলাম আর দুম করে আমি বলে ফেললাম, 'ঠিক তোমার মতো। অবিকল তোমার মতো।'

ধীরে ধীরে অমলার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু এ-জগতে অবিকল আমার মতো শুধু একজনই—সে আমি।'

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছ, ঠিকই বুঝেছ—আমি তোমাকেই, শুধু তোমাকেই—' কথাটা সম্পূর্ণ করলাম না আমি। তা না করলেও আমার কথা আমি শেষ করেছি। অমলা স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমিও একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম, আমার নিশ্বাস প্রায় স্তব্ধ হতে চলল —আমার উক্তির ফলাফলের জন্য।

অমলার গলা শুনতে পেলাম, সে বলতে লাগল, 'ঠাকুরপো, আমি বড়ো দুঃখকষ্টের মধ্যে বড়ো হয়েছি—মা-বাপ মরা কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে উঠেছি এবং নানা পুরুষের নানা রূপ দেখেছি, তাদের এড়িয়েছি, তাড়িয়েছি, কপালগুণে আত্মরক্ষা করেছি; তাই তাদের কথাবার্তা, চোখের চাউনি এবং আচরণ থেকে তাদের মনের ভাব বোঝার ক্ষমতা আমার জন্মেছে—'

আমি অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলাম, 'এক কথায় বলো, কী বলতে চাইছ তুমি?'

অমলা বলল, 'বলছি। অনেকদিন ধরেই আপনার মনের পাঁকের খবর আমি পাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনি আমার স্বামীর প্রাণের বন্ধু বলে ভাবছিলাম হয়তো আপনার মোহ একদিন কেটে যাবে—'

আমি তার কথা শেষ হতে না দিয়ে, বললাম, 'অমলা, এ আমার মোহ নয়, প্রেম।'

অমলা এবার উঠে দাঁড়াল, তার দু-চোখে কাঠিন্য দেখা দিল। সে বলল 'তাহলে আর এ-বাড়ির চৌকাঠে আপনি পা রাখবেন না ঠাকুরপো। জেনে রাখুন, আপনার প্রাণের বন্ধু আমার স্বামী এবং আমার প্রাণের প্রাণ।'

বলেই সে দ্রুতপদে রান্নাঘরে চলে গেল এবং পরক্ষণেই দরজা বন্ধ হবার শব্দ ভেসে এল।

যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল।

আমি ঘুরে টেবিল ও বিছানার ওপর থেকে আমার দুটো বই এবং জামাকাপড় আমার কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগে ভরে রান্নাঘরের দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে বললাম, 'আমি গেলাম অমলা। আমার একটা মিটিং আছে।'

কোনো সাড়া পেলাম না।

বংশীর বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে স্টেশনের রাস্তার দিকে হনহন করে চলতে চলতে আবার থমকে দাঁড়ালাম, কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম, তারপর ঘুরে বংশীর দোকানের দিকে ছুটলাম।

বংশী আমাকে দেখেই হাসল, 'আয় আয়'—কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রশ্ন করল, 'কাঁধে ব্যাগে কেন রে?'

আমি বললাম, 'আমায় বর্ধমানে ফিরে যেতে হবে রে —'

বংশী অবাক হল, 'কেন কী হল?'

বললাম, 'আড্ডা দেবার লোভে ভুলেই গিয়েছিলাম যে আজ বিকেল তিনটেয় হেডমাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে একটা জরুরি মিটিং আছে, না থাকলে আমার ক্ষতি হবে। তাই যাচ্ছি রে, পরে দেখা হবে।'

বংশী বলল, 'ইস, না খেয়ে দেয়ে—'

দ্রুতকণ্ঠে বললাম, 'খাওয়াদাওয়া তো কতই করেছি, পরে আবার হবে— চলিরে, নইলে—' বলেই বংশীর দোকান থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলাম।

বাস বদলে বদলে হাওড়া স্টেশন। তারপরে এক সময়ে বর্ধমান স্টেশন। তারপর একটা হোটেলে ভাত খেয়ে বাসায়। একটু জিরিয়ে উঠেই বংশীর নামে একটা পোস্ট কার্ডে লিখলাম, 'ভাই বংশী, তোদের ওখান থেকে ফিরে এসে মিটিং শেষ করে বাসায় ফিরেই জরুরি এক টেলিগ্রাম, লখনউতে পিসেমশাই মরো মরো, তাকে দেখার কেউ নেই, তাই ছুটি নিয়ে যাচ্ছি। ফিরে চিঠি দেবো। ভালোবাসা। ইতি ভরত।'

সেইদিনই চিঠিটা পোস্টও করে দিলাম। ব্যস সব শেষ!

ভরত গুপ্ত থামল। দেখল তার তিন শ্রোতার মুখ বড়ো গম্ভীর।

হেডক্লার্ক বিনয় বোস প্রশ্ন করল, 'গল্প শেষ?'

ভরত গুপ্ত বলল, 'না না, এখনো তো গল্পের ক্লাইম্যাক্স অর্থাৎ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছোইনি।'

উকিল দেবকুমার গুহ বলল, 'তোমার এটা তো গল্প নয়, উপন্যাস।'

ভরত গুপ্ত বলল, 'উপন্যাসও একধরনের বড়ো গল্প।'

কালান্তর-এর সহ-সম্পাদক অবিনাশ চাটুজ্জে বলল গম্ভীর গলায়, 'বেশ, তোমার ওই একধরনের বড়ো গল্পটি এবার শেষ করো।'

ভরত গুপ্ত হেসে বলল, 'বেশ, তাহলে শোনো বন্ধুগণ, শোনো'—

ভরত গুপ্ত আবার শুরু করল— শোনো, আমি যে বললাম, 'ব্যস, সব শেষ'— ওই ক-টি শব্দের প্রয়োগে তোমরা ধরে নিয়েছিলে যে কাহিনীটি শেষ হয়েছে। কিন্তু তা নয়, ওই কথাগুলোতে বংশীদের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করার সংকল্পের ঘোষণা করলাম।

তারপরে আর বংশীর বাড়ি যাইনি। দিন কাটতে লাগল, স্কুলের ছাত্রদের আরো বেশি যত্ন করে পড়াতে আরম্ভ করলাম, অবসর সময়ে লাইব্রেরি থেকে আনা সাহিত্যের ভাণ্ডার নিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম বটে, কিন্তু এক অশিক্ষিতা বন্ধুপত্নী, সেই আশ্চর্য রমণী-রত্নটিকে ভুলতে পারলাম না। পরাজয়ের গ্লানি, ব্যর্থতা আর অপমানের জ্বালায় চেতনে অবচেতনে জ্বলতে লাগলাম।

দেড়মাস কেটে গেল।

সেদিন শনিবার। বিকেল থেকেই বাসায় বসে বসে বই পড়ছি। আজকাল রান্না ও বাড়ির সব কাজ করার জন্য হারান নামে একজন ত্রিশ বছরের লোককে রেখেছি। সে আমাকে চা-বিস্কুট দিয়ে বাজার করতে বেরিয়ে গেল, আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম।

বই পড়ছি আর চা খাচ্ছি, হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় কেউ করাঘাত করল।

বই থেকে মুখ তুলে বললাম, 'কে?'

জবাব এল, 'ভরত, আমি বংশী।'

বুকটা ধ্বক করে উঠল। দরজা খুললাম, বংশী ভেতরে এল।

বললাম, 'বোস বংশী।'

বংশী বসল। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তা ছাড়া তার বেশভূষা মলিন, মনে হল দু-দিন সে দাড়ি কামায়নি, মাথার চুল উসকোখুসকো।

সে প্রশ্ন করল, 'ভেবেছিলাম হয়তো দেখা পাব না। কবে ফিরলি?

গোল করে জবাব দিলাম, 'এই'—

বংশী আবার প্রশ্ন করল, 'পিসেমশাই এখন কেমন?'

মুখটা করুণ করে জবাব দিলাম, 'তিনি তিন সপ্তাহ হল মারা গেছেন, নানা অসুখে ভুগছিলেন। ক্রিয়াকর্ম শেষ করে তবে এলাম।'

অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছি। আসলে আমার পিসেমশাই থাকতেন বহরমপুরে, পাঁচ বছর আগেই তিনি মারা গেছেন।

বললাম, 'বোস্ বংশী। আমার বাসায় এই প্রথম এলি, একটু মিষ্টি খা—তারপর চাকরটি বাজার থেকে ফিরলেই দু-জনে একসঙ্গে চা খাবো।'

বংশী মাথা নাড়ল, 'না, আমি কিছুই খাবো না রে, আমার সময় নেই—'

বললাম, 'তার মানে?'

বংশী বলল, 'ভরত—আমি খুব বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি।'

'বিপদ!' আমি ভুরু কুঁচকে তাকালাম, 'কেন? অমলা — অমলা বউদি ভালো আছে তো?'

বংশী ম্লান হেসে বলল, 'আমি ভালো না থাকলে সে কী করে ভালো থাকবে?'

'তাহলে খুলে বল্ কী বিপদ তোর? সব কথা বল্।'

বংশী তাকাল আমার দিকে, তাতে কেমন যেন এক উদ্‌ভ্রান্তির ছায়া, বলল, 'সব কথা বলতেই হবে! তুই আমার বন্ধু, বিপদ বলেই তোর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।'

আমি হাসলাম, 'বন্ধু বলেই তো আমাকে সব কথা খুলে বলবি তুই।'

মাথা নিচু করে বংশী বলল, 'বলতে পারছি না ভরত—সে আমার এক দুর্বলতার কাহিনী—'

চুপ করে তাকিয়ে রইলাম। অমলার কথা মনে পড়ল। 'এ-বাড়ির চৌকাঠে আর পা রাখবেন না' বলেছে সেই রমণী! বললাম, 'বল্ কী সাহায্য চাস? পারলে সাহায্য করব।'

বংশীর চোখে যেন একটা বাল্‌ব জ্বলে উঠল, সে বলল, 'ভরত, আমার পাঁচ হাজার টাকা চাই রে—'

আমি উচ্চারণ করলাম, 'পাঁ—চ—হা—জা—র!'

বংশী বলল, 'আমি প্রতিমাসে কিছু কিছু করে তোর টাকা শোধ করে দেবো—'

আমি মাথা নাড়লাম, 'বংশী, অত টাকা আমার কাছে কোত্থেকে আসবে?'

আমি আবার মাথা নাড়লাম। টাকা আমার ব্যাংকে থাকলেও না না না, বংশী আমার বন্ধু হলেও সে অমলার স্বামী, তার 'প্রাণের প্রাণ'—না না—আমি মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, 'না বংশী, পাঁচ হাজার টাকা আমার সাধ্যের বাইরে। তা ছাড়া কারো কাছে ধার চাইলেও পাবো না। আমি তোকে পাঁচশো টাকা দিতে পারি, তাও কাল ব্যাংক থেকে তুলতে হবে—'

বংশী বিড়বিড় করল, 'ওর বেশি তোর কাছে নেই?'

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলাম, 'না রে, নেই।'

আবার মিথ্যে কথা বললাম। আমার ব্যাংকে এখন প্রায় দশ হাজার টাকা আছে, কিন্তু আমি অমলার স্বামীকে বিপন্মুক্ত করব না। আমার অমলাকে চাই।

বংশী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বলল, 'চললাম তাহলে।' বলেই সে দ্রুতপদে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

আমার মনে যুগপৎ বংশীর জন্য দুঃখ এবং তার চেয়েও বেশি একটা তৃপ্তি অনুভব করতে লাগলাম এই ভেবে, যেন সেই রমণীকে আমি প্রত্যাঘাত করতে পেরেছি, যে আমায় বলেছিল, 'এ বাড়ির চৌকাঠে আর পা রাখবেন না।'

তবু একবার ভাববার চেষ্টা করলাম— কী করে থাকতে পারে বংশী? কী তার 'দুর্বলতা'? সে কি কারো কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল? হ্যাণ্ডনোট? না কি চুরি?

শেষে ভাবলাম, বংশী তার সেই কৃতকর্মের ফল ভোগ করুকগে, আমার কিছু করার নেই। কারণ সে অমলার স্বামী।

আমি তখন কালিদাসের 'শৃঙ্গারতিলকম্' কবিতাগুলো খুলে পড়তে বসলাম আর মানসনেত্রে অমলার বস্ত্রহরণ করতে লাগলাম। কিন্তু তবু মনের এক কোণে ছোট্ট অনুশোচনা হতে লাগল। বিবেক আমায় ধিক্কার দিতে লাগল। তখন আমি সেই বিবেক-পীড়নের কণ্ঠরোধ করলাম নাট্যকার ডি.এল.রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের একটি দৃশ্যের কথা ভেবে— মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত দুঃসময়ে একটি ছোটো রাজ্যের নৃপতি চন্দ্রকেতুর আশ্রয় এবং বন্ধুবৎ সাহায্য পেয়েছিল কিন্তু পাটলিপুত্র অধিকার করার পর চন্দ্রগুপ্ত তাকে পরিত্যাগ করেছিল এই কথা বলে— 'বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে।' এই কথা আমিও আমার সেই খর্বকায় বিবেককে বলার পর সে নিঃশব্দ হল। ডি. এল. রায় জিন্দাবাদ।

সেই দিন কেটে গেল।

পরদিন বেলা এগারোটা হবে এমন সময়ে বাইরে থেকে কেউ দরজায় মৃদু করাঘাত করল।

হারান গিয়ে দরজা খুলল।

স্ত্রীকণ্ঠ ধ্বনিত হল, 'ভরতবাবু আছেন?'

চমকে তাকালাম দরজার দিকে—অমলা দাঁড়িয়ে আছে।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম, আহ্বান করলাম, 'এসো এসো।'

অমলা ভেতরে এল। সঙ্গে সঙ্গে দেহসৌরভে সেই ঘরটা ভরে উঠল, কিন্তু আমি বিচলিত হলাম না।

আমি গম্ভীরমুখে বললাম, 'বোসো।'

অমলা বসল না, বলল, 'আমার একটা দরকারি কথা বলেই চলে যাব।'

আমি বললাম, 'তা যেয়ো, কিন্তু আমার এখানে এই প্রথম পা রাখলে, একটু চা-টা খাও, তারপরে কথা শুনব।'

আর শুনবই বা কী? আমি তো জানি কী কথা বলতে এসেছে অমলা। তার বাড়ির চৌকাঠে আমি আর পা রাখিনি কিন্তু সে আমার বাড়ির চৌকাঠ পার হয়ে এসেছে। তার নিয়তি তাকে আসতে বাধ্য করেছে।

অমলা দাঁড়িয়ে থেকেই মাথা নাড়ল, 'আমি ভদ্রতার জন্য আসিনি, আমার বড়ো তাড়া, তাই দরকারি কথাটা বলেই চলে যাব।'

বললাম, 'বুঝলাম, একটু দাঁড়াও — তারপর ডাকলাম, 'হারান—'

'আজ্ঞে—' হারান রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আমি টেবিল থেকে কাগজ নিয়ে তার দিকে তুলে ধরে বললাম, 'এই যে মাসকাবারির ফর্দ, এক্ষুনি মুদি-দোকানে গিয়ে সব ওজন করে বুঝে নাও।'

হারান ফর্দ আর টাকা নিয়ে কামরার দরজা টেনে বেরিয়ে গেল। দেখলাম, তখনো অমলা বসেনি।

বললাম, 'এবার বলো অমলা।'

অমলা মৃদু হেসে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি কী জন্যে এসেছি। আমি জানি আপনার বন্ধু সব কথা লজ্জায় খুলে বলতে পারেনি। সে-কথা আমি বললে আপনি বুঝতে পারবেন আমাদের কী ভয়ানক বিপদ।'

বললাম, 'বেশ, এবার বলো সেই বিপদের কথা।'

অমলা বলল, 'আমার দিকে ভালো করে তাকান একবার।'

আমি স্থির দৃষ্টি মেলে বললাম, 'তোমার দিকেই তো তাকিয়ে আছি।'

আমার সেই উক্তিতে যেন একটু দুলে উঠল অমলা তারপরে বলল, 'আপনি হয়তো লক্ষ করেননি যে আমার গায়ে আজ একটাও গয়না নেই।'

হঠাৎ সচেতন হলাম, সত্যিই তো, আজ তো সে প্রায় নিরাভরণা! সেই সব সোনা আর তার গায়ে নেই।

বললাম, 'তাই বটে।'

সে বলল, 'খুলেই বলছি। আপনার বন্ধু তার বউকে ভালোবাসে, পাগলের মতো ভালোবাসে, আর পাগল মাত্রেরই স্বাভাবিক বুদ্ধি মাঝে মাঝে লোপ পায়। তাই সে একদিন দোকানের টাকা থেকে সাত হাজার নিয়ে আমার জন্য গয়না শাড়ি ইত্যাদি কেনে। কুণ্ডুমশাই আমাদের স্নেহ এবং বিশ্বাস করতেন বলে আপনার বন্ধু ভেবেছিল যে মাসে মাসে দু-তিনশো করে টাকা ভরে হিসেবটা মিলিয়ে দেবে। কিন্তু বিধি বাম এবং আপনার বন্ধুকে তার পাপের শাস্তি পেতে হবে বলেই কুণ্ডুমশাই একদিন ঘুমের ঘোরেই স্বর্গে চলে গেলেন। খবর পেয়েই কলকাতা থেকে তাঁর ছেলে সুশান্তবাবু এলেন। এর আগে তিনি গাড়ি হাঁকিয়ে মাঝে মাঝে এসে একদিন দু-দিন থেকেই চলে যেতেন এবং তিনি আপনার বন্ধুকে খুব সুনজরে দেখতেন না। তা ছাড়া আপনার বন্ধুর ঠিকনীচের কর্মচারীটি ভারি হিংসুক, সে নিজের স্বার্থের খাতিরে সুশান্তবাবুর কাছে নানা মিথ্যে কথা বলে তাকে গরম করে দেয়। সুতরাং সুশান্তবাবু দোকানের

খাতাপত্তর নিয়ে বসতেই গরমিলটা ধরে ফেললেন। তিনি আড়ালে ডেকে আপনার বন্ধুকে বলেছেন যে দু-দিনের মধ্যে সাত হাজার টাকা ফেরত না দিলে তিনি আপনার বন্ধুকে বরখাস্ত করবেন এবং পুলিশে খবর দেবেন। আমার সেই গয়নাগুলোকে জলের দরে বিক্রি করে, হাজার তিনেক হয়তো পাওয়া যাবে তাই—'

অমলা দম নেবার জন্য একটু থামল, পরে মাথা নিচু করে বলল, 'তাই আপনি দয়া করে সাহায্য করুন ঠাকুরপো—'

দয়া! মনে মনে হাসলাম। এই রমণী একদিন আমায় অপমান করেছিল। এবার সে আমার হাতের মুঠোয়।

অমলা আবার বলল, 'নইলে আপনার বন্ধু জেল খাটবে। তখন আমার কী গতি হবে?'

আমি অমলার দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। আমি আছি।'

অমলার মুখের কালো ছায়া কমতে শুরু করল, সাহায্যের প্রত্যাশায়।

আমি বললাম, 'যাক বংশী জেলে, তুমি আমার হও। তোমাকে আমি মাথায় করে রাখব—'

যেন চাপা আর্তনাদ বেরোল অমলার গলা দিয়ে, 'ঠাকুরপো!'

মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ অমলা, আমি সমাজ সংসারকে গ্রাহ্য করব না, তোমায় সযত্নে মাথায় করে রাখব—'

বলতে বলতে আমি অমলার একটা হাত ধরলাম।

অমলার দু-চোখ ত্রাসে ও ঘৃণায় বড়ো হয়ে উঠল। সে এক ঝটকায় তার হাতকে মুক্ত করে, দুই পা পেছিয়ে গিয়ে বলল, 'ছিঃ, আপনি না আমার স্বামীর বন্ধু — ছিঃ ঠাকুরপো—'

আমি যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম তখন। তার দিকে এগিয়ে তার হাত আবার ধরলাম, বললাম, 'আমি কারো বন্ধু নই অমলা, আমি তোমার ঠাকুরপোও নই—আমি তোমার ভরত—'

হঠাৎ যেন চণ্ডী হয়ে গেল অমলা, চিৎকার করে বলল, 'হাত ছাড়ুন বলছি' — বলে প্রচণ্ড শক্তিতে নিজের হাত টেনে সে ভেজানো দরজার দিকে ছুটল।

আমিও ছুটলাম। ডাকলাম, 'অমলা—অমলা—' কিন্তু দরজা পর্যন্ত আমি পৌঁছানোর আগেই অমলা ঘর থেকে দৌড়ে টান মেরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বাইরেই সদর রাস্তা। থামলাম। হঠাৎ যেন রক্তের চাপ কমতে লাগল আর ভাবলাম যে ভালোই হল। যাক না অমলা, যাক। বন্ধুর বউ! বন্ধু! কে বন্ধু? না না,—'বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে।'

ভরত গুপ্তকে থামতে দেখে উকিল দেবকুমার গম্ভীর মুখে বলল, 'থামলে কেন?'

অবিনাশ চাটুজ্জেও ভুরু কুঁচকে বলল, 'হ্যাঁ, হঠাৎ থামলে কেন?'

বিনয় বোসও তাদেরই মতো ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ, শেষপর্যন্ত কী হল?'

ভরত গুপ্ত হেসে বলল, 'তার মানে গল্পটা জমেছে—এবার শেষটুকু বলছি — শোনো—'

সে আবার বলতে শুরু করল।

হেডমাস্টারের কাছে ক-দিনের জন্য ছুটির দরখাস্ত দিয়ে সেদিনই ইংলিশবাজার চলে গেলাম।

পরদিনই একান্তে মা আমাকে দুটি মেয়ের ফটো দেখালেন, বললেন, 'এই দুটির মধ্যে যে কোনো একটিকে পছন্দ করলে আমি খুশি হব বাবা। আমি আর বেশিদিন বাঁচব না, আমাকে তোর সংসারে গিয়ে থাকতে দে। একমাস বাদেই বিয়ের দু-তিনটে লগ্ন আছে।'

মা মেয়েদুটির ফটো টেবিলের ওপর রেখে গেলেন। দুটি মেয়েই গ্র্যাজুয়েট এবং সুন্দরী। দু-জনের মধ্যে একজনকে আমার বেশ পছন্দ হল। তার নাম লতিকা। দু-মাস বাদেই বিয়ে করে ফেললাম। শ্বশুরমশাই দিল্লিতে ভালো চাকরি করেন, বিয়ের তিন মাস বাদেই তাঁর চেষ্টায় একটা ভালো সরকারি চাকরি পেয়ে গেলাম। তারপর থেকে লতিকাকে নিয়ে সুখে সংসার করছি। লতিকা আমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে, লতিকা আমারও প্রাণাধিকা। ব্যাস, এবার আমার গল্পটি শেষ হল, নটে গাছটি মুড়োলো বন্ধুগণ।

ভরত গুপ্ত থামল।

তার শ্রোতাদের মুখ কিন্তু অন্ধকার, থমথমে।

ভরত গুপ্ত তাকাল সবার মুখের দিকে, প্রশ্ন করল, 'কী হল? প্রশংসা করার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছ না বন্ধুগণ?'

বিনয় বোস এবার বলল, 'গল্প কী সত্যিই শেষ হয়েছে?'

অবিনাশ চাটুজ্জে বলল, 'ঠিক, শেষ হয়নি।'

দেবকুমার গুহ বলল, 'যথার্থ। শেষপর্যন্ত তোমার সেই বন্ধু বংশীবিহারী এবং তার বউ অমলার কী হল তা তো বললে না।'

ভরত গুপ্ত গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি জানি না তাদের কী হল। আমি খোঁজ নিইনি তাদের। তারাও আর আমার কাছে আসেনি। হতে পারে বংশী জেলে গেছে, হতে পারে অমলা এবং বংশী দু-জনেই আত্মহত্যা করেছে। আবার তা নাও হতে পারে। আসলে যতটুকু না বললে আমার গল্পের উদ্দেশ্য সাধিত হত না ততটুকুই আমি বলেছি।'

দেবকুমার দু-চোখ ছোটো করে বলল, 'তার মানে? এই গল্পের অর্থ কী?'

ভরত গুপ্ত বলল, 'অর্থ বিনয় বোসের যথার্থ উক্তি—'সব বন্ধুত্বই বন্ধুত্ব নয়—অল দ্যাট গ্লিটারস ইজ নট গোল্ড'— অস্যার্থ, সব সোনাই সোনা নয়। বন্ধুগণ, তথাকথিত বন্ধুরা বেশিরভাগই এমনি। তারা বন্ধুত্বের মুখোশ পরে থাকে শুধু স্বার্থের খাতিরে। যারা পাপিষ্ঠ তারা প্রয়োজন হলেই যে-কোনো আদর্শ থেকে নীচে নামতে পারে।'

দেবকুমার গুহ বলল, 'ছি ছি ভরত গুপ্ত, তুমি—তুমি—'

অবিনাশ চাটুজ্জে হিসহিসিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার চরিত্র এমন!'

বিনয় গুপ্ত সতেজে বলল, 'তুমি একটি বিশ্বাসঘাতক—'

এবার ভরত গুপ্ত হো হো করে হেসে উঠল।

দেবকুমার গুহ চোখ বড়ো করে তেতো গলায় বলল, 'আবার হাসছ তুমি! তুমি এতদূর নীচে নামতে পারলে! ছি ছি ছি—'

ভরত গুপ্ত হাসি থামিয়ে এক হাত তুলে বলল, 'বন্ধুগণ, আমি তৃপ্ত। কারণ গল্পটিকে তোমরা বিশ্বাস করেছ! বন্ধুগণ, ওইটি গল্প বলার একটি চাল—তোমরা মাত হয়েছ!'

অবিনাশ চাটুজ্জে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'কী ভোগলা দিচ্ছ— চাল মানে?'

ভরত গুপ্ত বলল, 'মানে এই গল্পের 'আমি' আসলে আমি নই। 'আমি' শব্দটিকে ব্যবহার করে আমি চরিত্রটিকে এবং গল্পটিকে বাস্তবায়িত করে তুলেছিলাম। এইবার স্মরণ করো—আমি তো গত তেরো বছর ধরে কলকাতাতেই ইসকুল মাস্টারি করছি, দিল্লিতে সরকারি চাকরি নয়। তা-ছাড়া তোমরা এ-কথাও অবগত আছ যে আমার স্ত্রীর নাম লতিকা নয়, তিনি সুমতি। বন্ধুগণ, আবার বলছি, এই গল্পের 'আমি' আমি নই, বংশী বা অমলা বা অন্যান্য চরিত্রেরাও বাস্তব নয়। তবু জোর গলায় বলছি, গল্পটি সত্যি, জীবনে এমনটি ঘটে এবং ঘটতে থাকবে।'

ভরত গুপ্ত থামল।

কয়েক সেকেন্ডেই দেবকুমার গুহ, বিনয় বোস এবং অবিনাশ চাটুজ্জের চোখমুখ হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তারা একযোগে হাততালি দিয়ে বলল, 'সাবাস ভরত গুপ্ত ব্রাভো-ব্রাভো—'

প্রসাদ

বাণী বসু

হে ঈশ্বর, লিখতে পারি না আর!

হাহা দৃষ্টি ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে যায় আদুড় বারান্দায়। ওদিকে সবুজ পারাপার। উদ্ধত গাছেরা নম্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। জল ঝরছে টুপটাপ। শান্তির জল? একটা ভিজে কাক, না-ডাকতে না-ডাকতে উড়ে গেল। সমস্ত দিনরাত যেন একটা অসহায় ভিজে বেড়াল। যে-কোনো মুহূর্তে বিধাতার বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব আনবে।

সামান্য বিরতি। তারপরই আবার হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল আকাশ। বিদ্যুৎ চমকে গেল, খরশান আওয়াজে বাজ ডেকে গেল পুব থেকে পশ্চিমে।

হে ঈশ্বর, লিখতে পারি না আর!

অথচ এ-ও তো এক আয়োজন! মেঘমেদুর বরষায়! বীরভূমের বৃষ্টি, গাছে গাছে তুমুল ঝোড়ো হাওয়া, বাদল কোকিলের বিপন্ন ডাক। মোরাম জল শুষে নিলে রাস্তা ভিজে কম্বলের মতো প্রণিপাতে আছে। খচমচ খচমচ শব্দে সাইকেল চলে যায় জলদ চালে, মাথায় টোকা। দুটি সাঁওতালনি হাতে ঝোড়া মতো কী একটা নিয়ে উদয় হল। টিপি-ঢাপা কপাল। খানাখন্দ মুখে নির্বোধ গাম্ভীর্য। সাঁওতালনি মানেই তো মুঠো কোমর, শীতলপাটি পেছন, দোলনচাঁপা বুক। ঝুঁটি উদ্যত রডোডেনড্রনগুচ্ছ নয়! দু-হাতে কি তিনি ভেঙে দিতে চান সেইসব সাঁওতাল-বিলাস? ডেকে এনে বলবেন নাকি — দ্যাখো তো চেয়ে ইহারে তুমি চিনিতে পারো কি না?

— রামেশ্ব-র — তিনি বড়ো করে ডাকেন। আসবাবহীন প্রশস্ত নতুন ঘর। আওয়াজে মাইক্রোফোনের ধাতব গরিমা আসে। রামেশ্ব-র! রামেশ্বরকে অন্য কেউ হয়তো রামু বলেই ডাকবে। সংক্ষিপ্তকরণে বেশ উপভোগ্য মাতব্বরি আছে। তিনি ডাকেন না। রামেশ্ব-র — এই ডাকের মধ্যে স্বরের যে ওঠা-পড়া ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আছে তা ঢুকে যায় তাঁর গহনের ভাঁজে ভাঁজে, এই জনহীন বৃক্ষময় প্রকৃতিসান্নিধ্যে চতুর্মাত্রিক বনবাংলায়। ভরে উঠছে চারিদিক কানায় কানায় এই বিস্তীর্ণ ডাকে তিনি টের পান। ভেতরে কী যেন নড়েচড়ে ওঠে।

রামেশ্বর জানে। চা দিয়ে যায়। ফ্লাসকে চা রাখতেন আগে। নিজে পছন্দসই তৈরি করে থার্মোফ্লাসকে রেখে দিতেন টেবিলে। পাশে একটি মৃন্ময় কাপ। ডোজ মিলিয়ে দেখলে দু-আউন্স মতো। কেননা তার বেশি সময় চায়ে দেওয়া যেত না। মাথার মধ্যে শব্দের, ভাবনার পাখসাট, বিন্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। ঘণ্টায় সত্তর আশি মাইল বেগে গাড়ি ছুটছে, তাকে ধরে রাখা এক সমস্যা, নয় কি? ছিটকে যায়, ফসকে যায়, পলাতক প্লট দুয়ো দিয়ে যায়। তাদের সেই তাড়াহুড়ো, হুটোপাটি, ছুটে চলা হারিয়ে গেছে।

হে ঈশ্বর...!

এই চা, এই ডাক, এই বৃষ্টিপাতের শব্দ এবং বাষ্পাবৃত সবুজ—এ সমস্তই তো বিশ্বস্ত ক্যানভাস! অথচ প্যাডের কাগজে খালি নকশাই কেটে যান তিনি। এলোমেলো। ফুটকি দেন পাতা জুড়ে, তারপর এক ফুটকি থেকে আর-এক ফুটকিতে যাওয়া-আসার খেলা খেলেন

আনমনে। 'তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনবো না...' ফুটে ওঠে কাগজ জুড়ে লক্ষ্যহীন নির্মম পলায়ন।

হা ঈশ্বর, লিখতে পারি না আর।

এই হাহাকারে কেন তিনি নিত্য বর্তমান দিলেন সেটা ভাববার বিষয়। লিখতে পারছি না — লেখা দাও, শব্দ দাও অর্থ দাও, ধ্বনি দাও — রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি-র মতো করে বললে প্রার্থনার অভ্যস্ত ভঙ্গি চেনা যেত। অথচ তিনি অমোঘ এক 'আর' শব্দ যোগ করছেন তাঁর চিৎকারে। 'আর' যেন একটা দাঁড়ি। এর পেছনে একটা ইচ্ছার ক্ষান্তিও যেন সূচিত হয়। 'আর' পারি না — কখন বলি আমরা? যখন কাজ, দায়, বেদনা সবই বেশি বেশি ও ধারাবাহিক হয়ে যায়। তবে কি না-পারার পেছনে সেই না-ইচ্ছের লাগাম আছে?

ওপর মন দিয়ে তিনি আস্তে ধীরে পাতা ওলটান। এতদিন লেখক আছেন, এতদিন কবিতা-গল্প-উপন্যাসে, যে কবে ছিলেন না মনে পড়ে না আর। তবু চেষ্টা করেন, যখন লেখক ছিলাম না।

হিং-এর কচুরি আর খোসা-আলুর তরকারির রোববার। চ্যাঙারিভরতি দ্বারিক থেকে আনছে ছেলে—চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। এই ছেলেটা তোকেও তো নিয়ে যেতে পারত! বোকা ছেলে, আহাম্মক একটা! তেতলার চিলেকোঠার জানলা দিয়ে অতঃপর সেই চিলেরই লীলা দেখা। এবারে উড়ান, একে অপরের থেকে ওরা কেন যে এত দূরত্ব চায়! পাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ চোখে যেন কাজলটান, ফুলে ফুলে উঠছে পালের মতো। ব্রাউন চিল কালো ফুটকি হতে হতে উধাও। হঠাৎ বাতাস ভারী করে নেমে আসে হিংস্র শরের গতিতে, নখে বিঁধিয়ে নেয় দলছুট পায়রা, ঝুপ করে নামে কোনও উঁচু বাড়ির আলসেয়, শুরু হয় তার ছিন্নভিন্ন মার্তণ্ড ভোজন।

যখন লেখক ছিলেন না! প্রোগ্রেস রিপোর্টে লাল দাগ। লুকিয়ে বাড়ি এনে ছাতের ঘরে শবদাহ করলেন। পাঁচ-সাতটা ঝড়তিপড়তি উঠতি বালক-বালিকার দলে আত্মগোপন করে থেকে যাওয়া চোরা গুপ্তির মতো। মিথ্যের গলিঘুঁজি চেনা হয়ে যাচ্ছে। মিথ্যের পাহাড়! উঠতে মিথ্যে বসতে মিথ্যে। শেষ পর্যন্ত পণ্ড সব। জ্যাঠামশায়ের ভয়াল চাবুক ডাকছে, কেননা তোমার স্কুলছুট দিনকাল গোচরে এসে গেছে। তুমি জানো না ভয়ানক এক অশ্লীল গলির মোড়ে তুমি ধরা পড়েছ। পালাও আহাম্মক পালাও। পালাও যতক্ষণ পকেটে জমানো পয়সা আছে দূরপাল্লার বাসে। ডায়মণ্ডহারবার। পাতি ধাবায় তুমি ক্ষিতীশ এখন। অনাথ বালক—সৎমার যন্ত্রণায় সংসার বিষ — এবম্বিধ কার্যকারণ অকাতরে বুনে যাচ্ছ। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটো অতএব। মালিকের এক নম্বর শাগরেদ দামোদরের সঙ্গে একপাতে শোওয়া। হাড়ভাঙা খাটুনির পর অর্ধেক রাত চরণসেবা, গঞ্জিকা সেবা। তারপর একদিন দামোদর প্রকাণ্ড দৈত্য হয়, আক্রান্ত ছেলেটি আতঙ্কে বামন অবতার। দানবের দু-চোখে অলৌকিক আঙুল ঢুকে যায়। পালাও আহাম্মক পালাও, ঝাপসা পথঘাট, ভোরের বাস, পালাও।

শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট অবশেষে খোঁজ-পুলিশের সঙ্গে ঘরে ফেরে। ধুম কান্না, ধুম আদর। ঘর পালানো ছেলেকে কেউ ঘাঁটায় না। ভয়ে ভয়ে মিষ্টি কথা বলে। না-ই গেল স্কুল। ভয়ে বামন বাইরে বেরোয় না। চারদিকে খালি দামোদর দেখে। একলার দিনরাত, আলমারির

তাকগুলির সঙ্গে অগত্যা ভাবসাব। ধূলিধুসর সচিত্র ভারত, খুদেস্য খুদে অক্ষরে বসুমতী, বিবর্ণ হলুদ পাতার দেশ-অমৃত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যো, মুখো...। যোগাযোগ, গোরা...টলোমলো পায়ে এলোমেলো পাথর টপকে ছোটো ছোটো স্রোতস্বতী পেরিয়ে যাও। শেষে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকো। তিস্তা-রঙ্গিতের সঙ্গমে। বাতাসে জলের শীৎকার, মহাশোল শিকারের বন্দোবস্ত চূড়ান্ত। ফুন্টশোলিং, হয়ে উড়ে যাও চাম্বার অনপত্য উপত্যকায়, ফিরে এসো বরফ-শীতল ছাঙ্গু লেক।

'নাথু-সংকটে হাঁকে তিব্বতী হাওয়া।
প্রাকৃত তিমিরে মগ্ন চুমলহরি।
ছঙ্গু-সায়রে কার বহ্নিত্র বাওয়া
অপর্ণ বন দিয়েছে রহসঙ্গ ভরি।'

হায়, লিখতে পারি না আর... অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে আসে গলা থেকে।

'আপাতত তাকে নাচাতে পারে না আর
অপ্সরীদের নির্মম জলকেলি...'

মাথার তুষার মুকুটে হাত রাখেন তিনি। ভেতরে নাচ স্তব্ধ হয়ে আসছে। ওড়িশির ত্রিভঙ্গবিলাস, জগঝম্প কথাকলি, মোহিনীঅট্টমের মুদ্রাচয়! কত দীপ্তশিখা থেকে আগুন জ্বালিয়ে নিয়েছেন। লকলক করে জ্বলেছেন কখনো মেধাবিনী কখনো সুতন্বী আগুনে, পুড়ে সুগন্ধ ভস্ম হয়ে উড়ে গেছেন, সেইসব জ্বলা-পোড়া পায়ের চিহ্ন রেখে গেছে নিষ্কলঙ্ক কাগজে। আজ বীণা, রম্যবীণা বাজে না, বাজে না।

হে ঈশ্বর, পারি না আর... হায়!

মেঘের আড়ালে বিমর্ষ বিকেল গত হয়। ফ্যাকাশে গোধূলি মিলিয়ে যায়। জনচলাচল কমে আসে। অন্ধকারের মিছিলে সামিল কদম, বকুল, শিরীষ, সপ্তপর্ণীতে ফিসফাস, আমের বনের পত্রবিলাস অন্ধকারে সামান্য ঢেউ খেলিয়ে রাখে। অকালঘুমে ঢলে যান তিনি।

কোথাও ঢং ঢং করে ঘড়ি বেজে চলেছে। অনেক রাত কী?

রামেশ্বর খাবার পাশে রেখে চলে গেছে। রামেশ্বর জানে এই বাবুকে বিরক্ত করতে নেই। ইনি অন্য বাবু। রাতের বয়স অনেক। খিদের বয়স বাড়ছে।

আচমন সেরে গরম-বাক্সর ঢাকা খুলতেই বাসন্তী রং খিচুড়ি স্নেহল চোখে চায়, ঘি-এর প্রচার ছড়িয়ে যায় শূন্যঘরে। খিচুড়িতে অফুরন্ত সবজির টুপটাপ, প্রতি গ্রাসে কিসমিস! চামচ করে খুব শোভন ভঙ্গিতে খেতে থাকেন তিনি। কোনো পুজো বাড়ি? কী পুজো? দুর্গা? সরস্বতী? অরন্ধন? নাকি কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোই!

হঠাৎ হাওয়ায় চমকে ওঠেন। বারান্দায় এসে দাঁড়ান। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ মেঘহীন নক্ষত্রময়। দিগন্তে চাঁদের চতুর্দশী। একটি কালো রাতপাখি সেদিকে পতঙ্গের মতো ছুটে যায়। দেবীর ভূলুণ্ঠিত শাড়িতে জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে। একটি সুদূর নক্ষত্র ছুঁয়ে বর্ণহীন আলো-পথ বাঁক নেয়। তিনি দেখেন নক্ষত্রচূর্ণ মাড়িয়ে, বাদুড়ের পাখায় ভর, তিমিরের জলস্রোত দু-হাতে সরিয়ে সরিয়ে ওই আসছে তাঁর শেষ লেখারা।

সে এবং জীবনানন্দ দাশ

সমরেশ মজুমদার

এখানে হাওয়ারা হাওয়াদের মতো বয়ে যায়। ভোর হব হব রাতে তার শরীরে জড়িয়ে থাকে শিশিরের ঘ্রাণ, খানিক রোদ্দুর জমলে তাতে মেশে ঘাসের গন্ধ যার আস্বাদ বুক ভরে নেয় এক বিরহী ডাহুক। বিরহী, কারণ ওকে কখনও দোকা দ্যাখেনি এই প্রান্তর। বিরহী, কিন্তু আদৌ দুঃখিত দেখায় না ওকে যতক্ষণ না বিকেলের শেষ আলো নিভে আসা মোমের আলোর মতো দপদপ করে।

কাগজে জ্ঞাপিত হয়েছিল একটি মানুষ দরকার। শর্ত ছিল, সহজ লোকের মতো বলতে হবে, তাদের ভাষায় কইতে হবে। জলের, মাটির গন্ধ পেলে যার প্রাণ আহ্লাদে ভরে যাবে। পরে জেনেছিল দ্বিতীয় আবেদন না পৌঁছানোয় তাকেই ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন নির্বাচকরা। অবশ্য এক কঠিন মুখের বিচারকের সামনে তাকে বসতে হয়েছিল, যিনি একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিলেন, 'বলুন তো ভাই, কেউ যদি বলেন, অনেক তো হল, এবার মরণের পাশে শুতে চাই, তাহলে কি দাঁড়াবে?'

হেসে গড়িয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিয়েছিল সে। তারপর সরল গলায় জবাব দিয়েছিল, 'বীজ বুনলে ফসল হয়, মরণও গর্ভবতী হবে।'

'অ্যা?' চমকে উঠেছিল শিক্ষিত মুখ, 'ব্রেশ! তা যে শিশু জন্মাবে সে কে, ভগবান না শয়তান?'

শরীরের স্বাদ যে বোঝেনি তখনো সে উত্তর দিয়েছিল, 'না! জীবন।'

নিমেষে এক বিশাল অচেনা পৃথিবীর দেখাশোনার দায়িত্ব পেয়ে গেল সে। তারপর ট্রেন, বাস, ভ্যানরিকশা আর নৌকোয় দুলতে দুলতে চলে এসেছিল এখানে, চাকরির দায়িত্ব নিয়ে।

থাকার জায়গা বলতে একটা টঙের ওপর ঘর। পাশেই নদী তাই জলের প্রাচুর্য সবসময়। প্রতি পক্ষে নৌকো এসে তার প্রয়োজনীয় বস্তু পৌঁছে দিয়ে যাবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে টঙের ওপর উঠে সে যখন প্রথম তার কর্মক্ষেত্র দেখল তখন চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল অস্বস্তিতে। এত সবুজ সে এর আগে কখনো দ্যাখেনি। সবুজ আর ন্যাড়া মাঠ। কার্তিকের ধান কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিছু আগে। অপরাহ্নের রোদ সদ্য প্রসূতির মতো এলোমেলো। একদিকে সীমাহীন জল আর একদিকে ফসল আর গাছগাছালির ভূমি আর টঙের ওপরে তৈরি শক্তপোক্ত ঘরে সে, এর বাইরে আকাশ আর মাটি ছাড়া অন্য কোনো মানুষ নেই। সে দু-হাত মুখের পাশে এনে চেঁচিয়েছিল, 'আ' শব্দটা যেন তার শরীর থেকে বেরিয়ে আবার শরীরেই ঢুকে গেল।

রাত আসছে গুঁড়ি মেরে। দ্রুত খাওয়া শেষ করে নিল সে। কাল থেকে নিজের জন্য রাঁধতে হবে, আজ পথ থেকে আনা খাবারে রাত কাটানো। তারপর নদীর জলে মুখ ধুতে গিয়ে অবাক হল। ওটা কি! স্বচ্ছন্দ সাঁতরে চলে গেল খানিক গভীরে, তারপর এগিয়ে এল খানিকটা। লম্বা শরীর, চকচকে তেলানো গা, এমনভাবে মুখ তুলল যে মনে হল বলল, কে তুমি ভাই?

'আমি কে তাই জানতেই তো আসা।' সে বিড়বিড় করল। সঙ্গে সঙ্গে মাছটা, যদি ও মাছ হয়, মিলিয়ে গেল নদীর গভীরে।

টঙের ঘরে উঠে বসল সে। নিরাপদে থাকার জন্যেই বোধহয় এই উঁচুতে ঘর। তার মানে এখানেও আপদ আছে। কোথায় নেই। বয়স পঁচিশ অথচ রোজগার নেই যার, তার তো চারপাশে আপদের ভিড়। এতদিন যত আবেদনপত্র পাঠিয়েছে তা জুড়লে নিজের জন্য মায়া হত। সেই আপদের কাছে এই আপদ নিতান্তই তরল। হঠাৎ সুইচ টিপে আলো নেভাবার মতো কেউ সূর্যটাকে নিভিয়ে দিল।

জীবনের এই প্রথম রাত, যে রাতটাকে তার মনে হল অসংখ্য নক্ষত্রের রাত। আর এমন গভীর হাওয়ার রাত যে পৃথিবীতে নামে তাও তার জানা ছিল না। ঘুম ছিল না যতক্ষণ না স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে কোনো শাদা রাতপাখি উড়ে গিয়েছিল আর এক আশ্চর্য পৃথিবীতে। কিন্তু এই উঁচুতে, মাটি থেকে অনেক ওপরে সে যখন সন্ধে পেরিয়ে গেলে বিছানায় শরীর এলিয়েছিল তখন মনে হয়েছিল মশারি নিয়ে আসার কথা ওরা তাকে কেন বলেনি। মশারা এত ওপরে স্বচ্ছন্দে উড়ে আসে পেট ভরাতে? কিন্তু তারপর সারা আকাশ থেকে নেমে এল যখন হাওয়ারা, বিছানা থেকে তাকে ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল নক্ষত্রের দিকে তখন ওই অন্ধকারের প্রাণীরা মুখ লুকিয়েছে মাটিতে অথবা আছড়ে পড়েছে চৌদিকে। নিজেকে সামলে নিতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল সে। তারপর সেইসব হাওয়ারা ভিন-সাগরের বুকে মিশে গেলে ঝাউ-এর সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে চাঁদ দেখা দিল। তাই দেখে মেঠো প্যাঁচা খুঁজে মরে সঙ্গীকে নাকি সঙ্গিনীকে তা সে জানে না। শুধু জানে কাল রাতে ঘুমে চোখ চায়নি জড়াতে। কিন্তু চাঁদ ডুবে যেতে যেতে কিছু মরা জ্যোৎস্না নেতিয়ে পড়ল তার চোখের পাতায়, চোখের পাতাদুটো নেমে এল দুই চোখে, ঠিক কখন তার জানা নেই।

মাছির গানের মতো অলস শব্দে তার ঘুম ভাঙল। উঠে বসল সে। মাঠে মাঠে ঝরে পড়ছে কাঁচা রোদ, রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল। মুহূর্তে শরীরের ভেতর অথবা ভেতর-শরীরের যাবতীয় অন্ধকার ফুৎকারে উড়ে গেল যেখানে যাওয়ার। আহ্লাদে ভরে ওঠে শরীর। এতদিনের জ্বালাযন্ত্রণা, প্রতিটি দিনের বেঁচে থাকতে চাওয়ার বেদনা ভুলে গিয়ে সে জানল মনের সব ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, চোখ মেলে থাকলে।

শুরু হল কাজ। অন্তত দশ একর জমির ওপরে গাছগাছালি আর চাষের মাঠ। একপাশে বিশাল নদী। নদী জমি থেকে অনেক নীচে। নীচ থেকে সেটা উঠে গেছে উতরাই ভেঙে। তার কাজ সারাদিন ঘুরে গাছগুলো দ্যাখা। ফল পাকলে তাদের তুলে সঞ্চয় করা। প্রতি পক্ষে নৌকো যখন আসবে তখন সেই সঞ্চিত ফলগুলো নিয়ে যাবে মালিকের জন্যে। ওপাশে, টিলা ছাড়িয়ে জঙ্গলের গভীরে আছে কয়েকটা গ্রাম। কাজ দেওয়ার সময় তাকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছিল সেই সব পাড়াগাঁর মানুষদের সম্পর্কে। বলা হয়েছিল যেন ভুলেও ওদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি না করে।

ফসল তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাঠ থেকে, সেখানে এখন ইঁদুরের উৎসব। কিন্তু গাছে ফলের বুকে রস ঘন হচ্ছে। কী নেই এখানে। আতা, পেয়ারা থেকে বেতের ফলও চোখে পড়ল। সেই ফল খাদ্য কি না তা তার জানা নেই।

দুপুর নামার আগে ফিরে এল সে। থাকার ব্যবস্থা আকাশে কিন্তু টঙের নীচের কুঁড়েঘরে রান্নার সরঞ্জাম। সেখানে ঢুকে দেখল যাবতীয় জিনিস ঠিকঠাক রয়েছে তার অপেক্ষায়। স্টোভ জ্বেলে চাল ডাল সবজি একসঙ্গে ফুটিয়ে নিলেই পেটের প্রয়োজন মিটে যাবে। সেগুলো সাজিয়ে নিয়ে জল আনতে নদীর দিকে পা বাড়াতেই ছিপখানা দেখতে পেল। সুতো বঁড়শি ফাতনা মজবুত রয়েছে তার। বেরিয়ে এসে গোটা পাঁচেক ফড়িং ধরে ছিপ আর বালতি নিয়ে চলে এল নদীর কাছে। এই নদীর অন্য পাড় ঝাপসা। ঢেউ প্রবল। তবু একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়া জল বেশ শান্ত। বড়শিতে ফড়িং ঢুকিয়ে জলে ফেলল সে। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ। ফাতনাটা সোজা হয়ে আকাশ দেখছে। হঠাৎ প্রবল আলোড়ন শুরু হল জলে। অবাক হয়ে দেখল, অদ্ভুত জলজ প্রাণীরা জল ছেড়ে ওপরে উঠছে, আবার নেমে যাচ্ছে জলে। ঠাওর করল সে, ওরা শুশুক। দু-তিনটে নয়, ঠিক কত তা বুঝতে পারল না সে। শিস-এর শব্দ বাজছে জলে। ওটা কি শুশুকদের চিৎকার? ফাতনা বঁড়শি তুলে নিল সে। সঙ্গে সঙ্গে শুশুকগুলো এক ছুটে চলে এল কিনারে, তারপর ডিগবাজি দিয়ে চলে গেল নদীর গভীরে।

শুশুকেরা এরকম আচরণ করল কেন? ওদের বড়ো শরীর নিশ্চয়ই এই বঁড়শির টোপের জন্য লালায়িত হবে না। ধরা পড়বার কোনো সম্ভাবনা ওদের নেই। তাহলে? ওরা কী ছোটো মাছদের হয়ে প্রতিবাদ জানাল! বিষণ্ণ অথচ কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হয়ে সে যখন ফেরার জন্য পা বাড়িয়েছে ঠিক তখন একটি শুশুক দ্রুত চলে এল পাড়ের কাছে। শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল শুশুকের মুখে একটি পুরুষ্টু মাছ যা প্রাণীটি ছুঁড়ে দিল মাটির ওপরে। দিয়ে ফিরে গেল জলে। মাছটা লাফাবার চেষ্টা করল বারকয়েক কিন্তু ততক্ষণে মধ্যাহ্নের রোদ তার শরীরে রুপো ঝরাতে শুরু করায় অবসাদ এসে গেল তার।

মাছটাকে তুলল সে। শ-পাঁচেক গ্রাম বয়স্ক মাছ। মাছ ধরতে না দিয়ে নিজেরাই তাকে দিয়ে গেল শুশুকরা? অদ্ভুত ব্যাপার তো। তার ভেতরে কম্পন শুরু হল। এরকম অভিজ্ঞতা পৃথিবীর কারো কী হয়েছে?

শরীর খাবার চায়, পেয়ে গেলে কিছুটা সময় সে নির্লিপ্ত। মনের হাঁ-মুখ যে বন্ধ হয় না কখনো। রাবণের চিতা অবিরাম জ্বলে যায় সেখানে। টঙের ওপর তৃপ্ত শরীর নিয়ে উঠে এসে রোদে-জ্বলা সাম্রাজ্য দেখতে দেখতে কত না নবীন কৌতূহল তিরতির করে তার মনে। অথচ এখানে চকিত হতে হবে না, ত্রস্ত হয়ে থাকার সময় এখন নয়। এখন এখানে কাজ এসে হাত জুড়ে নেই। সমস্ত পড়ন্ত রোদ চারদিকে ছুটি পেয়ে ভিড় জমিয়েছে গাছে গাছে, ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া প্রান্তরে। তাই চেয়ে চেয়ে দ্যাখা। দেখে দেখে দেখার আয়ু শেষ হয়। বাতাসের শীতলতা চুপিচুপি বলে তাকে, 'আয় ঘুম যায় ঘুম দত্তপাড়া দিয়ে।'

ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন; খেতে মাঠে পড়ে আছে খড়। উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যাওয়ার আগে কিছু লোক ছুটে এল পাতা, কুটো, ভাঙা ডিম মাড়িয়ে। টঙের নীচে দাঁড়িয়ে তারা বিলাপ ছুঁড়ে দিচ্ছিল ওপরে। কাঁচা ঘুম চটকাতে চটকাতে সে নেমে এল নীচে। ওরা এসেছে ওপাশে জঙ্গুলে গাঁ থেকে। ওরা জানে এই জমি, ফসলের বাগান, এই টঙ শহরের মানুষের সীমানা। এও জানে, যা তারা জানে না, তা শহরের মানুষের জানা। গ্রামবৃদ্ধ কাতর হন, তাঁর একমাত্র মেয়ের শরীরের তাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ওঝার শেকড়ের সাধ্য হচ্ছে না তার তাপ কমানোর। নিদান হেঁকে গিয়েছে সে। তাপ আরো বেড়ে গেলে শরীরের সব জল বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেলে কন্যাহারা হবে গ্রামবৃদ্ধ। শহুরে মানুষের কাছে কি জিয়নকাঠি আছে?

এখানে আসার সময় কিছু প্রাথমিক ওষুধ এনেছিল সে। হঠাৎ শরীর বিকল হলে যদি কাজে লাগে। অনুমানে বুঝে নিল কন্যা জ্বরে আক্রান্ত। কিন্তু সেটা কী ধরনের জ্বর তা আবিষ্কারের ক্ষমতা তার নেই। প্রাথমিক ওষুধ যা আছে তাই সম্বল করে পা মেলালো সে। বিকেলের কমলা আলোয়, সাপের খোলস আর নিড়ানো খেত মাড়িয়ে, বুনো গাছেদের গন্ধ পেরিয়ে ওরা পৌঁছে গেল জঙ্গুলে গাঁয়ে। উদ্বিগ্ন সারি সারি মুখ, যাদের শাশ্বত মানবজাতির প্রতিনিধি ভাবা যায়, তাদের মুখ, কী উদাসীন!

গ্রামবৃদ্ধ তাকে নিয়ে এল যে নারীর পাশে তাকে দেখে তার মনে হল এই পৃথিবী বুঝি একবারই দেখা পায় তার। শরীর এলিয়ে আছে, হাঁ-মুখে মরুর বাতাস। প্রাণ আছে যায়নি বলেই। কপালে আঙুল ছোঁয়াতেই রক্তে ছ্যাঁকা লাগল তার। জ্বরের শহুরে নামগুলো মনে এল একের পর এক যার ওষুধ তার সঙ্গে থাকার কোনো কারণ নেই। প্রাথমিক ট্যাবলেট গুঁড়িয়ে মুখে ঢেলে একটু একটু করে জল ছড়িয়ে দিল সে ওখানে। কয়েক সেকেণ্ড বাদে জিভ নড়ল, হয়তো অস্বস্তিতে। আবার ঈষৎ জল ঢালতেই ঢোঁক গিলল নারী। ওষুধ চলে গেল কণ্ঠনালীতে।

তারপর হলুদ পাতার ভিড়ে মুখ লুকোল রোদ্দুর। ইঁদুর পেঁচারা চাঁদহীন জ্যোৎস্নায় খেতে খেতে খুঁজে এলো গেল। চোখ বুঁজে কতবার ডান আর বাঁদিকে ঘুমিয়ে পড়ল কত-কেউ। সে জেগে রইল একা। দিঘির অতলে চাঁদ ডুবে আছে স্থির, কোনো ডুবুরির সাধ্য নেই তাকে টেনে তোলার, এই নারীর মুখ ফেলে সেই দৃশ্যও নীরক্ত মনে হয়। মাঝরাতে, যখন কুয়াশা ভাসছে চতুর্দিকে তখন আর একবার ওষুধ ঢেলেছিল সে, ওই মুখে। এবার জিভের সপ্রতিভতা বেড়ে গেল। এক ঢোঁক জল পান করে নারীর ঠোঁট জুড়ে গেল। তারপর অনেক লবণজল ঘেঁটে মাটির ঘ্রাণ পাওয়া সারেঙের মতো ভোরের স্পর্শ পাওয়ার মুখে সে, হাত রাখল নারীর কপালে। আঃ। স্বস্তির আস্বাদ পেয়ে উঠে দাঁড়াতেই গ্রামবৃদ্ধ জড়িয়ে ধরল দু-হাত। কৃতজ্ঞতা সরিয়ে রেখে ধীরে ধীরে মাঠ খেত বনানী আর নিটোল রোদ্দুর শরীরে জড়িয়ে সে ফিরে গেল টঙে। প্রসবযন্ত্রণার শেষে পৃথিবীর সব গর্ভধারিণীর যে সুখ, এখন তাদের থেকে সে কম খুশি নয়।

দিন যায়। তবু রেখে যায় দিনগতসুখ। ভোর এলে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হৃদয়ের পদ্মপাতার জল। যেন অনেক জন্ম ধরে ছিল যে ব্যথা রাতের শিশির, এতদিনে তাই হয়ে গেছে পদ্মপাতায়

জল। এই পদ্মপাতায় সেই জল আটকে রাখতে চায় সে। আকাশ নীল, পৃথিবী কী মিঠে! রোদ ভেসেছে, বুকের ভেতর ঢেঁকিতে পাড় পড়ছে। পদ্মপাতায় জল শুধু যে নড়ে। এ জল আটকে রাখা দায়।

তারপর একদিন, দুপুরের জনবিরল বাতাস দূর শূন্যে চিলের পাটকিলে ডানার ভেতর অস্পষ্ট হয়ে গেলে, চুপিসারে বিকেল চলে এলে, সে এল। আতার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তি হয়ে বিকেলটাকে করে তুলল অসম্ভব বিষণ্ণ।

মনে হল জীবনের সব দেনা শোধ হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। সে নেমে এল টঙের ওপর থেকে। গাঢ় গলায় শুধিয়েছিল, 'ভালো আছ তো এখন?'

মাথা নেড়েছিল নারী, না, ভালো নেই।

'সেকী? কেন? কী করতে পারি তোমার ভালোর জন্যে?' সে ব্যস্ত হল।

নারী তাকাল, 'আপনি আমাকে জীবন দিয়েছেন, আপনার কাছে প্রার্থনা, এবার আমাকে প্রাণ দিন।'

যেন ঘুলঘুলাইয়ায় পাক খেল সে, 'কীভাবে?'

'যাকে ছাড়া আমি নিষ্প্রাণ তাকে গ্রহণ করছেন না পিতা। শুধু একমাত্র আপনার কথাই তিনি মানতে পারেন।'

এই কথা বলে নারী ফিরে গেল।

এখন তার চারপাশে চন্দনকাঠের চিতার গন্ধ, আগুনে-ঘিয়ের ঘ্রাণ।

সোনার বল

সুনীল দাশ

'জাহিদকাকু, জাহিদকাকু' বলে একটি দশ বারো বছরের ছেলে বিমানদের ঘরের পেছন দিককার জানলাটার কাছে চেঁচিয়ে ডাকছিল। শুনে বিমান জানলার কাছে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'এই খোকা, এখানে কাকে ডাকছ?'

ছোটো ছেলেটির পরনে দামি জামাপ্যান্ট। 'খোকা' ডাকটা তার পছন্দ হয়নি বোঝা গেল তার মুখের রেখায়। তাহলে কী, এই যে মাস্টার বললে জুতসই হত ভাবছে যখন বিমান, তখন ছোটো ছেলেটি মুখ তুলে বলল, 'জাহিদকাকু — আমাদের বাড়ির গাড়ি চালায় — এই গলিতেই তো থাকে।'

বিমান বলল, 'হ্যাঁ, জাহিদ এই গলিতেই থাকে, তবে এই সামনের বাড়িটাতে নয়। এরপরে একটা বাড়ি, তারপরে যে টিনের চালওয়ালা বাড়িটা দেখবে, তার সামনে গিয়ে ডাকো।' বলে অল্প একটু হাসিমুখে বিমান যোগ করল, 'আজ ওকে তুমি জিদানকাকু বলেও ডাকতে পারো।'

'তাই? জাহিদকাকু ফুটবল খেলে? পাড়ায় এখন কাকুকে "জিদান" বলে ডাকছে?' — এতক্ষণে ছেলেটির গলায় খুশি খেলে গেল।

বিমান গমনোদ্যত ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি এই পাশের রাস্তাটায় থাকো? নতুন এসেছ এ-পাড়ায়?'

'নতুন, না তো। আমরা এখানে এসেছি দু-বছর হয়ে গেছে। আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়তুম।' বলে ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে আরো জোরে বার দু-এক জাহিদকাকু বলে ডাকতেই জাহিদের সাড়া পাওয়া গেল।

ভোরের মেঘলা আকাশ সরিয়ে এখন বেশ ঝকঝকে রোদ বেরিয়েছে। পেছনের পেয়ারা গাছটার সবুজ পাতায় রুপোলি আলো পিছলে পিছলে যাচ্ছে। বিমানদের ঘরের পেছনের গলির জমে থাকা জল নেমে গেছে আগেই।

পায়ে চটি গলিয়ে বিমান বাজারের থলি নিয়ে তাদের ব্যারাকবাড়িটার সদর দিয়ে সামনের রাস্তায় বেরিয়ে এল। বেরোনোর মুখে পেছনের রান্নার বারান্দা থেকে সবিতা বলল, 'কাঁচালঙ্কা এনো কিন্তু, মনে করে।'

বিমান শুনল। কোনো উত্তর করল না। সামনের সরু পিচের রাস্তায় একটা অটো স্টার্ট নিতে গজরাচ্ছে। বাচ্চুর অটোটা নিশ্চয়। রোজ এই রকম সময় রুটে বেরোবার মুখে উৎকট আওয়াজ তোলে কিছু সময়। সদরের সরু গলিটা পেরোতে পেরোতে বিমানের মাথায় তখন কাঁচালঙ্কাই লাট খাচ্ছিল।

গতকালই অফিসে বলছিল চক্রবর্তী, কীভাবে কাঁচালঙ্কার বোঁটা ছাড়িয়ে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিলে একটাও লঙ্কা নষ্ট হয় না। অনেকদিন চলে। চক্রবর্তীর এক দিদি থাকেন লন্ডনে। লন্ডনে কাঁচালঙ্কা রীতিমতো দামি আনাজ তাই ওভাবে রাখে চক্রবর্তীর দিদিরা। এখন কলকাতায় কাঁচালঙ্কার আদর একইরকম না হলেও দরে দামে তো কম নয়!

ব্যারাকবাড়ির দরজার,তাদের সদরটার বাইরে আসতেই জাহিদের সঙ্গে দেখা। বড়ো রাস্তা থেকে ঢুকছে গলির পিচের রাস্তায়। তার মানে এতটা সময় জাহিদ ঘরে ছিল না। অন্য কেউ, জাহিদের ভাই-টাই কেউ সাড়া দিয়েছে বাচ্চা ছেলেটাকে। বিমানকে দেখেই দূর থেকে জাহিদ হাসল। বিমান গলা তুলে বলল, 'তোকে একটা বাচ্চা ছেলে খুঁজতে এসেছে জাহিদ। পরিচয় দিল তোর মালিকবাড়ির বলে। তোদের ঘরটা ঠিকমতো চেনে না। আমাদের ঘরের পেছনদিকের জানলার কাছে এসে জাহিদকাকু জাহিদকাকু বলে ডাকছিল। যা।' বলে, কাছে এসে যাওয়া জাহিদকে এবার একটু নামানো গলায় বলল, 'ছেলেটাকে আমি বললাম, জিদানকাকু বলে ডাকলেও সাড়া পাবে।'

জাহিদ হাসল না। রোগা, ফরসা, লম্বাটে মুখের জাহিদের কপাল, নাক, চিবুক কিছুটা জিদানের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করা গেলেও চোখদুটো বেশ ভাসা ভাসা। পাশের গলি দিয়ে পেছনের আরো সরু গলিটাতে ঢোকার আগে বিষাদের গলায় জাহিদ বলল, 'দত্তদের এই কাজটা ছেড়েই দেবো বিমানদা। সেদিন আপনাকে বললাম না, মানাতে পারছি না। মন থেকে কিছুতেই সায় দিতে পারছি না।'

'আর ক-দিন দ্যাখ্। যদি আর একটু ভালো কোনো অফার পাওয়া যায়। এক হাজার টাকার ফারাক অনেকটা। দিনকেদিন বাজারের অবস্থা যা হচ্ছে। পঞ্চাশ গ্রাম কাঁচালঙ্কা কিনতে গিয়েও পাঁচবার ভাবতে হয়।' বলে বিমান এগিয়ে গেল জাহিদের উলটোদিকে।

জাহিদ ছেলেটা বরাবর ব্রাজিলের সমর্থক। আগের বিশ্বকাপ থেকেই ও কলকাতার ব্রাজিল-পাগলদের দলের একজন হয়ে গেছে। এবারেও শুরু থেকে ব্রাজিল নিয়ে মেতে ছিল। তবে বিমান এবারেই শুধু নয়, আগেরবারের ওয়ার্ল্ড কাপের খেলার সময় দেখেছে, জাহিদ, জিদানের খেলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্বাস্থ্যের সাবলীলতায় জাহিদ ধারেকাছে আসে না ফ্রান্সের জিনেদিন জিদানের। তবু ছুটি থাকলে এখনো পাড়ার রাস্তার ফুটবলে যে-টিনএজারদের সঙ্গে জাহিদকে সপ্তাহে এক-আধবার বলে পা দিতে দেখা যায়, তারাই জাহিদের মাথাভরতি চুলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'পুরোটা সাফ করে দিলেই গায়ে শাদা টিশার্ট চাপিয়ে জিদানের ডামি হয়ে যাবে জাহিদদা।' বস্তিতে জল জমলে, নোংরা জমলে, এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই জাহিদ সমাজসেবায় নামে।

তবে বিশ্বকাপ ফাইনালের মধ্যরাতের পর, এই দু-হাজার ছয়ের বার্লিনের মাঠে ইতালি আর ফ্রান্সের শেষ ফয়সালার পর, ইতালির রক্ষাদুর্গের মাতারাৎজির বুকে জিদানের গুঁতোনো আর লালকার্ড খেয়ে মাথা নিচু করে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসার পর, কেউ আর জাহিদকে ওই প্রসঙ্গে কোনো কথা বলেনি। জাহিদও ও-ব্যাপারে চুপচাপ। জিদানের সোনার বল পাওয়া এবং তারপর ফিফার প্রেসিডেন্ট সেপ ব্লাটার যখন মন্তব্য করেন যে ফিফার তদন্তে জিদান দোষী প্রমাণিত হলে ওই সোনার বল কেড়ে নেওয়া হবে, তখনো পাড়ার ছেলেরা নিজেদের মধ্যে নানা কথা বললেও জাহিদ একটিবারের জন্যেও মুখ খোলেনি।

গড়িয়াহাট মোড় আর বালিগঞ্জ রেল স্টেশনের মাঝখানে বিমানদের এই পাড়াটায় চারপাশে বড়ো বড়ো বাড়ির মাঝখানে এক টুকরো একটা বস্তি এলাকা। ইটের দেওয়ালের ওপর টিনের

চালের ঘেঁষাঘেঁষি বিশ পঁচিশটা ঠিকা টেনেন্সির বাড়ি। তার মধ্যে বিমানদের বাড়িটাই বেশি জায়গা নিয়ে। পাশাপাশি হিন্দু মুসলমান পরিবারই শুধু নয়, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের গরিব মানুষের ডেরা এই ছোট্ট এলাকাটা। তিন পুরুষ ধরে জাহিদরা আছে এখানে। কাঠের কাজ, রাজমিস্ত্রি, প্লাম্বার, মোজাইক মিস্ত্রি থেকে শুরু করে অটো চালানো, প্রাইভেট কারের ড্রাইভার, জেরক্স, এস.টি.ডি.-পি.সি.ও. দোকানের কর্মীই বেশি, বিমানের মতো অফিস কর্মচারী এখানে নেই দু-চারজনের বেশি। সারা বস্তিতে স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে-পড়া মানুষ আঙুলে গোনা যায়।

জাহিদ পড়েছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। সিক্সে পড়ত যখন তখন থেকেই জাহিদ এক-আধদিন বিমানের কাছে আসত অঙ্ক আটকে গেলে কিংবা ইংরেজির মানে জানতে। ছেলেবেলা থেকেই আর পাঁচটা সমবয়সী ছেলেদের থেকে জাহিদ আলাদা। বিমান বা সবিতা বললে, ছেলেটা সুবিধেমতো কাজ করে দেয় ছেলেবেলায় পড়া দেখে নিতে আসার কৃতজ্ঞতায়। এক সময় মাধ্যমিক পাশ করার স্বপ্ন দেখত। সেটা পারেনি। তাড়াতাড়ি রোজগারে ঢুকে না পড়লে খুব অসুবিধে ছিল জাহিদদের বড়ো সংসারে। জাহিদের এক ফুফা থাকে মুম্বাই। মোটা টাকার কাজে লাগানোর জন্যে ফুফা জাহিদকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল মুম্বাইয়ে। জাহিদ যায়নি।

দত্তদের মারুতি ওমনি চালিয়ে মাসে ও তিন হাজার টাকা পায়। তার সঙ্গে উপরিও আছে। বিশ পঞ্চাশ তো হামেশাই, কখনো কখনো একশো টাকার নোটেরও বকশিস মিলেছে কোনো কোনো মেয়ের কাছে থেকে। ওটা নিতে বড়ো বেশি রকমের বিবেকদংশন হয় জাহিদের। নইলে কাজের তুলনায় তার তিন হাজার টাকার মাস মাইনে তো ভালোই। এর ওপর আবার প্রায় রাতে হোটেল থেকে ভালো খাবারও পাওয়া যায়।

বুলবুল দত্তরা এ-পাড়ার গায়ে নতুন ফ্ল্যাটে আসার আগের থেকেই, প্রায় আড়াই বছর ধরে ওদের গাড়িটা চালাচ্ছিল জাহিদ। দত্তরা তখন থাকত বেহালার শীলপাড়ায়। পাড়ার পাশে হাইরাইজের তিনতলার ফ্ল্যাটের খবরটা জাহিদই দিয়েছিল তার ম্যাডাম বুলবুল দত্তর স্বামী বিকাশ দত্তকে। সাহারা ফিনান্সের চাকরিটা ছেড়ে বিকাশ দত্ত ততদিনে ঘরণী বুলবুল দত্তের বিজনেসেই পুরোপুরি লেগে গেছে। ম্যান্‌দামারা বিকাশ দত্তর বাকি জীবনটা দাপুটে বউয়ের আঁচল ধরে চলা ছাড়া গতি নেই, সেটা তো লোকটাকে প্রথমদিন দেখেই বুঝেছিল জাহিদ।

'পরের দালালি থেকে ঘরের দালালি'—ব্যাপারটা শুধু এইটুকু হলে কিছু বলার ছিল না জাহিদের। বিমানকে নিজের বিবেকদংশনের কথা বলতে গিয়ে বলেছিল জাহিদ। বিবেক-দংশনের ব্যাপারটা যে এখনো এদেশের মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে জাহিদদের প্রজন্মের মধ্যে — যাদের বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়েস — আদৌ রয়েছে, এটা শুনেই রীতিমতো অবাক লেগেছিল বিমানের। তা ছাড়া অপরাধটা তো জাহিদ করছে না; যেসব মেয়েরা দেহ বেচে টাকা কামাচ্ছে, জাহিদ তাদের যাতায়াতের সুবিধে করে দিচ্ছে, মাসে তিন হাজার টাকা বেতনের বিনিময়ে।

এর মধ্যে মুম্বাইয়ে এক সন্ধেতেই — ছ-টা চব্বিশ থেকে ছ-টা পঁয়ত্রিশ—মাত্র এগারো মিনিটে সাত জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ হয়ে গেল লোকাল ট্রেনে, মুম্বাইয়ের লাইফ লাইনে।

সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা এখন দুশো ছাড়িয়ে গেল। আহতের সংখ্যা কত? টিভিতে বান্দ্রা আর বোরিভেলির নাম শোনার পর থেকে জাহিদ ছুটে গিয়ে এস.টি.ডি. বুথে ক্রমাগত ফোন করার চেষ্টা করে গেছে। ল্যান্ডফোন, মোবাইল, সমস্ত লাইন জ্যাম। পরদিন সকালে ফুফাকে পাওয়া গেল মোবাইলে। সবাই ঠিক আছে। ফুফা যে লোকাল ট্রেনে ফিরেছে বান্দ্রায়, বিস্ফোরণ হয়েছে ঠিক তার পরের ট্রেনে। বিমান অফিস যাওয়ার মুখে জাহিদের কাছে থেকে খবরটা শুনে গেল। জাহিদও বেরোচ্ছিল ওই সময়।

অফিসে বিমানের তুমুল তর্ক জঘন্য জঙ্গি আক্রমণ নিয়ে। গুহ বলল, 'ও আপনি যতই বলুন দাসবাবু, ও ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই। ইন্ডিয়ার খাবে, ইন্ডিয়ার পরবে আর ইন্ডিয়ার সর্বনাশ করার জন্যে মুখিয়ে থাকবে। ও শালা সব সমান। রাখুন তো আপনার প্রগ্রেসিভ মুসলিম। গণ্ডায় গণ্ডায় পয়দা হবে। মাদ্রাসায় পড়তে পড়তেই কাফের মেরে বেহেস্তে যাওয়ার ইজারা নিয়ে বসবে। ওদের রক্তে আপনি ডেমোক্রেসি ঢোকাবেন? মশাই মারের বদলা মার। সন্ত্রাসের বদলা সন্ত্রাস ছাড়া আর রাস্তা নেই।'

'কী পাগলের মতো বলছেন গুহদা! ইন্ডিয়ায় কত কোটি মুসলমান বাস করে জানেন? বলতে চান যোলো কোটির মতো মানুষ এই জঙ্গি নাশকতার কাজে মদত দিচ্ছে? আপনাদের এই মানসিকতাই তো সন্ত্রাসবাদীদের মদত জোগায়। ওরা জঙ্গি আক্রমণ করেই তো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জিইয়ে রাখতে। সামরিক শাসকরা চান না গণতন্ত্র আবার মাথা তুলে দাঁড়াক পাকিস্তানে।'

এসব তর্ক-বিতর্কের কোনো শেষ নেই। একবার শুরু হল তো চলতেই থাকবে। গুহদা থাকেন দমদম পার্কে। ওর এক পড়শি একই দিনে মারা গেছে শ্রীনগরে। কাশ্মীরের শ্রীনগরে চার ঘণ্টার মধ্যে পাঁচটা বিস্ফোরণ। মুম্বাইয়ে সাত, শ্রীনগরে পাঁচ। একই দিনে সাত পাঁচে বারো। এক ডজন হানা। দুপুরের ডাল গেট, রিগালচক, লালচক, আবিগুজার আর টুরিস্ট সেন্টার শ্রীনগরের সঙ্গে মুম্বাইয়ের ভায়ান্দর, বোরিভেলি, যোগেশ্বরী, সান্তাক্রুজ, খার, মাহিম আর মাটুঙ্গার সন্ধের তফাত কতটুকু! আবিগুজার এলাকায় মারা গেছেন ইলিয়াস আহমেদ নামের একজন মানুষ।

অফিসে কথা কাটাকাটির আগেও যেমন, পরেও তেমন, বিমানের মাথায় ঘুরছে, এখন য়ুরোপে 'উগ্রপন্থী' শব্দটা 'বেশ্যা'র চেয়ে কম মারাত্মক গালাগালি নয়। মাতারাৎজি ইতালিয় ভাষায় নাকি জিদানের মাকে 'উগ্রপন্থী বেশ্যা' বলে জিদানের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। জিদান বলেছে যে, মাতারাৎজি জিদানের মা ও বোন সম্পর্কে খারাপ কথা বলায়, সে তার কামানো মাথা দিয়ে খ্যাপা মোষের মতো মাতারাৎজির বুকে আঘাত হানতে শুরু করে। মাতারাৎজি জানিয়েছে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে সে মাকে হারিয়েছে। 'মা' ব্যাপারটাই তার কাছে খুব পবিত্র। কার যে কোথায় কীভাবে কিছু মারাত্মক দুর্বলতা থেকে যায় — বলা খুব মুশকিল। বিমানের মনে পড়ে গেল অনেক বছর আগেকার কথা। জাহিদ খুবই ছোটো তখন। জাহিদের মা সুফিয়া বেগমের মোটেই সুনাম ছিল না। সেই সময় জাহিদের এক আবু বাড়ি বয়ে এসে মারাত্মক ঝগড়া করেছিল সুফিয়া বেগমের সঙ্গে। চিৎকার করে কসবি, বেশ্যা,

রাত্তি, কিছু বলতে আর বাকি রাখেনি। শিশু জাহিদ ওইসব কথার মানে বুঝেছিল কি না কে জানে, কিন্তু খুব কেঁদেছিল, মনে আছে।

ভাবতে ভাবতে বিমানের মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিল। আচ্ছা, কোনো যুবকের মা যদি আজীবন অত্যন্ত নৈতিক শুদ্ধাচারের মধ্যে থাকেন, তারপর কেউ যদি যুবকটির মাকে বেশ্যা বা দুশ্চরিত্রা বলে গালিগালাজ করে, তাতে যুবকটি যত খেপবে, তার তুলনায় ওই যুবকের মা-র যদি কমবয়সে চরিত্রে নৈতিক শিথিলতা থাকে, সেই কথাটা তুলে যদি তার মাকে স্বৈরিণী বলা হয় তখন যুবকটি যতটা খেপবে, এ-দুটোর মধ্যে কোন ক্ষেত্রে ক্রোধের প্রতিক্রিয়া হবে বেশি। মিথ্যে বললে বেশি ক্রোধ হয়? নাকি কলঙ্কিত সত্যকে খুঁচিয়ে দিলে মানুষ খেপে যায় আরো বেশি? আচ্ছা, জিদান মাতারাৎজি বিতর্কে কি জাহিদের নিজের ছেলেবেলার কথা মনে এসেছে? জাহিদের বয়স, পরিবার, পরিবেশ বিচার করলে ওর এই নৈতিকতার প্রতি টান কি ওর ব্যক্তিজীবনের প্রতিক্রিয়া?

বিমানকে বলছিল জাহিদ, 'পশ এরিয়া থেকে যেসব মেয়েদের আমি গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আসি, আবার দিয়ে আসি, তাদের খুঁটিয়ে দেখলেও আপনার মনে হবে না এরা দেহ বেচে পয়সা কামাতে বাজারে নেমেছে। পয়সাওয়ালা বাড়ির মেয়েরাও যে এ-কাজে নামে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। ওরা তো পয়সার জন্যে হোটেলের বিছানায় যায় না। তা হলে? মজা? আরো টাকা? আরো অনেক, অনেক, অনেক টাকা?'

বুলবুল দত্তের কথামতো অনিন্দিতা সেনগুপ্ত নামের একটি মেয়েকে সল্টলেক থেকে আগের শনিবার নিয়ে আসা এবং দিয়ে আসার নিয়মমাফিক দায়িত্ব ছিল জাহিদের। মেয়েটাকে দেখেই জাহিদের মনে হয়েছিল, এ-মেয়ে তো একটু চেষ্টা করলেই ফিল্মে টিভিতে পসার করতে পারে! কে জানে, বুলবুল দত্তের এই কনট্রাক্টটা সেই চেষ্টাই কি না। জাহিদ লক্ষ করেছে, এই ক্লাসের মেয়েরা সবসময় একাই আসে। এদের সঙ্গে কেউ থাকে না।

মাঝখানে বৃষ্টি হল ক-দিন খুব জোরদার। প্রতি বছরের মতো এবারও পাড়ার কদম, শিরীষ আর পেয়ারা গাছগুলো খুব সবুজ সতেজ হয়ে উঠেছে। গাছের পাতা থেকে ধুলো ধুয়ে গিয়ে সবুজ রঙটা কেমন ভরাট হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

কয়েকদিন যাবৎ জাহিদের ভেতরকার অস্বস্তি, নিজের কাজটাকে ভেতর থেকে মানিয়ে নিতে না পারার কষ্টটা যে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এটা বিমান টের পাচ্ছিল। ফুটবলের ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা শুরু হওয়ায় বিমানের মনে হয়েছিল ক-টা দিন বিশ্ব ফুটবল নিয়ে মেতে থাকবে ছেলেটা। মনটা জাহিদের অন্যদিকে ঝুঁকে থাকবে। ফাইনালের রাত থেকেই সব কিছু কেমন যেন হিসেবের বাইরে চলে গেল।

বিমান জাহিদকে যেমন দেখে দু-বেলা, তেমন জাহিদের মালিক আর মালকিন মহিলাকেও তো দেখে। পরিচয় নেই বিকাশ দত্ত বা বুলবুল দত্তর সঙ্গে, কোনোদিন কথা বলেনি, বলার কোনোরকম আগ্রহই থাকার কথা নয়। শুধু অবাক হয়ে বিমান ভাবে, জাহিদের মতো সামান্য লেখাপড়া জানা ছেলের, অভাবের সংসারে ওই পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠা ছেলের যে বিবেকদংশন রয়েছে, সেটা বিকাশ দত্ত বা বুলবুল দত্তর ছিটেফোঁটাও নেই কেন? তাহলে গোদা বাংলায়

শিক্ষাটিক্ষা মানুষকে কী দেয় বলা যাবে? বেশি অসৎ, বেশি নীতিহীন হওয়ার ক্ষমতা? দত্ত দম্পতি যখন দ্যাখে, তাদের ফ্ল্যাটে কোনো মা কিংবা বাবা মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে—তখনো তো কোনো দংশন থাকে না ওদের মধ্যে! তার মানে আদর্শ, নৈতিকতা এখন শুধু জাহিদদের মতো অপেক্ষাকৃত কম চতুর মানুষদের কাছে 'সোনার বল' হয়ে থাকবে?

আজ অফিস বেরোনোর মুখে, ভাত খেয়ে বারান্দায় গিয়ে কুলকুচি করছে যখন বিমান, তারে টাঙানো গামছাটা টেনে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে সবিতা বলল কিছুটা ক্ষোভের গলায়, 'আজ কিন্তু অফিস-ফেরতা গ্রুপে যেয়ো না।' বারান্দাঘেঁষা নর্দমায় মুখ থেকে কুলকুচির জল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিমান বলল, 'সে কী! আজ যে নতুন একটা নাটকের স্ক্রিপ্ট পড়া হবে।'

'কাল মেয়েটার অঙ্কের ক্লাস টেস্ট। আগেরটা খারাপ করেছে।' সবিতার গলার স্বরে কঠোরতার ঝাঁঝ। গরম টিফিনবাক্সটা সে একফালি পুরোনো খবরের কাগজে মুড়ে বিমানের রেক্সিনের ব্যাগে ঢুকিয়ে চেন টেনে দিল।

শুকনো গামছায় মুখ মুছে নিয়ে বিমান আবার সেটাকে তারে মেলে দিল। দু-এক মুহূর্ত বিমানের উত্তরের অপেক্ষা করে, বিমান কোনো কথা না বলায় সবিতা আপনমনেই গজগজ করতে থাকে, 'কী দেয় থিয়েটার? বড়ো বড়ো লম্বা লম্বা ফাঁপা কথার ঝুড়ি শুধু!'

কথাগুলো নতুন নয়। গ্রুপ থিয়েটার যারা করে তাদের অনেকেরই বাড়িতে এসব কথা শোনার অভ্যাস অনেকদিনের। বিশেষ করে বিমানের মতো যারা নাটকের নেশায় চাকরির কেরিয়ার সময়মতো সাজিয়ে তোলেনি। অন্য 'সোনার বল' টেনেছে তাদের।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সরু গলিটা পেরিয়ে এসে বড়ো রাস্তায় পা ফেলেই বিমান দেখতে পেল পাশের রাস্তা দিয়ে জাহিদ, দত্তদের সোনালি রঙের মারুতি ওমনিটা চালিয়ে আসছে। এক মুহূর্ত দাঁড়াল বিমান। এই ছেলেটা বিমানের গ্রুপ থিয়েটার করাটাকে খুব পছন্দ করে। এ-পাড়ায় একমাত্র জাহিদই আগ্রহ নিয়ে বিমানদের নাটক দেখতে গেছে। মাঝে মধ্যে এই রকম অফিস বেরোনোর মুখে দেখা হয় জাহিদের সঙ্গে। তাকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় হাসে এক ঝলক, হাত নাড়ে।

আজ দৃশ্যটা অন্যরকম হল। বিমান দেখল সোনালি রঙের ওমনি ভ্যানটার মধ্যে একটি যুবতীর পাশে সতেরো আঠেরো বছর বয়সের একটি ছেলে বসে আছে। একনজর দেখেই বিমানের মনে হল ভাই-বোন।

আশ্চর্য! আজ জাহিদ ঘাড় ফিরিয়ে আর তাকাল না বিমানের দিকে। হাসল না। স্টিয়ারিং থেকে একটা হাত তুলে অন্যদিন যেভাবে খুশি হয়ে নাড়তে নাড়তে চলে যায় সেভাবে না গিয়ে কঠোর মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে পেরিয়ে গেল মুহূর্তেক দাঁড়িয়ে পড়া বিমানকে। পাশ থেকে দেখেই বুঝল বিমান মুখের রেখা জুড়ে অশান্তি ছেলেটার। অসহায় আর কেমন যেন বিব্রত মনে হল সবসময় মুখে হাসি লেগে থাকা জাহিদকে। এই কাজটা, বুলবুল দত্ত বিকাশ দত্তর গাড়ি চালানোর কাজটা ছেলেটাকে ভেতরে ভেতরে যে সাংঘাতিক জ্বালাচ্ছে; হালে দেখা হলেই, এমনকী বিশ্বকাপ ফুটবল চলার সময়ও অনেকবার জাহিদ বলেছে বিমানকে। বিমানের থিয়েটার গ্রুপের এক দাদার আত্মীয় এক রিটায়ার্ড প্রফেসরের গাড়ি চালানোর জন্যে একজন

পার্ট টাইম ড্রাইভারের কথা জাহিদকে বলেছে বিমান। তাতে হাজার টাকা কম হচ্ছে। তিনের বদলে দুই হলে জাহিদের সংসারের অভাব সামাল দেওয়া মুশকিল। বিবেকদংশন কয়েকমাস বেশি হজম করা যাবে কিন্তু খাওয়া-পরার জ্বালা তো দু-দিনের বেশি তিনদিন সামাল দেওয়া যাবে না। তাই বিমান পরামর্শ দিয়েছে, তিন হাজারের বেশি না হোক, কমপক্ষে হাজার তিনেকের অন্য কোনো অফার না পাওয়া পর্যন্ত জাহিদ যেন দত্তদের কাজটা না ছাড়ে। অবশ্য কথা বলে রাখতে চাইলে জাহিদ যাতে সরাসরি জানতে পারে সেজন্যে থিয়েটার গ্রুপের অনুনয়দার ঠিকানা ফোন নম্বর সব দিয়ে দিয়েছে বিমান।

এর মধ্যে রবিবারের বিকেলটায়, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির মধ্যে পাড়ার রাস্তায় ঘণ্টাখানেক ফুটবল খেলা হল যখন, এলাকার জিদানকে তার মধ্যে একবারও দেখা যায়নি। এর মধ্যেই নামটা ফিকে হতে শুরু করেছে। তবে খবরের কাগজে জিদানের 'সোনার বল'কে লোহার বল বলে ব্যঙ্গ করায় ছেলেদের মধ্যে খানিকটা কথা কাটাকাটি শুনল বিমান। তার পরেও জাহিদকে দেখতে পায়নি আশেপাশে।

আজ বেরোনোর মুখে সবিতার কথার কোনো জবাব না দিলেও অফিসের পর রিহার্সাল রুমে না গিয়ে সোজা ঘরে ফিরেছে বিমান। মেয়েকে অঙ্ক শেখাতে বসেছে। কিছুক্ষণ পর উঠোন থেকে জাহিদ হাঁকল, 'দাদা কী ঘরে আছেন?' চৌকি থেকে নেমে বিমান মুখ বাড়াতেই জাহিদ বলল, 'আজ দাদা আপনি গ্রুপে গেলেন না?' 'তুই কী করে জানলি?' বিমান অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। 'আমি গিয়েছিলুম।... ঠিক আছে, এখন আপনি পড়িয়ে নিন। আমি পরে আসব।' বলে আর একটাও কথা না বাড়িয়ে জাহিদ ফিরে গেল। সকালে যেমন দেখেছিল, এখন দেখল, জাহিদের মুখটা সেইরকম থমথমে ভার হয়ে নেই। গলার স্বরেও ভার বা বিষাদ বোঝা গেল না।

মেয়েকে অঙ্ক দেখানো হয়ে গেলে বিমান নিজেই ডেকে নিল জাহিদকে। সামনে এসে জাহিদ প্রথমেই হাসিমুখে বলল, 'আজ দত্তদের কাজে ইস্তফা দিয়ে এসেছি। আর পারা যাচ্ছিল না।' 'অনুনয়দার দাদার গাড়ির দু-হাজারের পার্ট টাইম ড্রাইভিং ছাড়া আরো কোনো অফার এসেছে তা হলে?' বিমান কৌতূহলী হয়ে বলে। 'না। এখন শুধু ওইটাই। হোক এক হাজার টাকা কম। তবু লাখো টাকার মনের শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সহ্যের একেবারে চরম হয়ে গেছে।'

'কী হল আবার আজ? নতুন করে আর হওয়ার তো কিছু নেই। আচ্ছা আজ সকালে তোর গাড়িতে মেয়েটার সঙ্গে কে যাচ্ছিল? ওর ভাই?'

'ওই ব্যাপারটাই তো সহ্য করতে পারলাম না। দিদি টাকা নিয়ে বেরিয়ে আসলে তবে ভাইটা তার কোচিং ক্লাসের টাকা দিতে পারবে। সকাল থেকে খাবার জোটেনি দু-জনের কারো। দুপুরবেলা হোটেল থেকে বেরিয়েই মেয়েটা ভাইটাকে নিয়ে ছুটে গেল রাস্তার ওপরের স্ন্যাক্স বারটায়। ভাইটাকে দুটো এগরোল কিনে দিয়ে আবার যখন আমার গাড়িতে যখন উঠল, মনে হচ্ছিল টেরিফিক একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে সব খতম করে দিয়ে নিজেও খতম হয়ে যাই।'

বিমান হেসে বলল, 'নাটকে এমন দৃশ্য রাখলে বেশিরভাগ লোক বলবে বড্ড মেলোড্রামা। আজকের থিয়েটারে ওসব ক্লিশে সিকোয়েন্স চলে না।'

'থিয়েটারে কী চলে সে আপনারা ভালো বুঝবেন। কিন্তু চোখের সামনে এরকম চলতে দেখা...আমাদেরও তো দিদি ছিল, অভাব আমাদের সংসারে কী কম দেখেছেন? বলুন? আচ্ছা, ওদের ওই বাচ্চা ছেলেটা — অরু — অরিত্র — ক্লাস সিক্স এখন — ওই ছেলে কি মা-বাবার কাজ কারবারটা ধরতে পারবে না? নিজের চোখের ওপর ওদের কি...'

বিমান জাহিদকে থামিয়ে বলে, 'তুই নিজের চোখ দিয়ে ওদের পৃথিবীটা দেখতে চাইছিস বলে এত কিছু ভাবছিস। তুই না ভেবেও পারবি না ভাই। অরিত্ররা অন্য পৃথিবীতে ঢুকে যাচ্ছে জাহিদ। তুই আমি সে পৃথিবীর ইতিহাস জানি না, ভূগোল জানি না।'

'অতশত বুঝি না। স্রেফ এইটুকু বুঝি, নিজের মন যে-কাজে সায় দিচ্ছে না, সে-কাজ আমি করব না। হ্যাঁ, আজকের বাজারে হাজার টাকার ঘাটতি সামলাতে আমার জান কয়লা হয়ে যাবে, কিন্তু মনের ভেতরকার জ্বালা কি পেটের জ্বালার চেয়ে কম বলুন? বেশি পড়াশোনা করতে পারিনি ঠিকই, তা বলে নোংরা কাজে হাত মেলাব কেন? নিজের কাছে তো সাফ থাকব। কী বলুন?'

ঠিক এই কথার জবাবে বিমান কিছু বলতে পারল না সেই মুহূর্তে, তবু কোনো প্রসঙ্গ না থাকলেও বিমান কেন যেন সোনার বল-এর কথাটা টেনে এনে বলল, 'মাতারাৎজিও তো বলেছে— সোনার বল পাওয়ার যোগ্যতা একমাত্র জিদানের — কাগজে পড়েছিস তো?' জাহিদ নিরাসক্ত গলায় বলল, 'পড়েছি। পড়েছি জিদানের তিন দিনের সমাজসেবার কাজ, ছোটোদের সঙ্গে।'

উত্তরমেঘের ছায়া

দীপঙ্কর দাস

একটানা তিনদিন বৃষ্টির পর আজ সকাল থেকে আকাশ খানিকটা ধরে এলেও মুখ গোমড়া ভাবটা কাটেনি এখনও। সিসার বাষ্পের মতো ফ্যাকাশে মেঘের স্তূপ বাতাসের ঝাপটায় উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে। এই মেঘকে বিশ্বাস নেই। যে কোনো সময় আবার থম মেরে দাঁড়িয়ে জল ঢালতে শুরু করতে পারে। তবে পরের কথা পরে। একটানা তিন দিন তিন রাত যে জলের ধারা নেমেছে আকাশপথ বেয়ে, সেই ধারা আপাতত থেমে যাওয়ায় স্বস্তিতে শ্বাস ফেলল নুনতলার মানুষজন, গাইবাছুর, মায় কুকুর বেড়াল পর্যন্ত। এই তিন দিন তিন রাতের টানা ধারাপাতে নুনতলা, খেজুড়ি, সাতমাটি, চকবেরিয়া—দু-দশটা গাঁ-গঞ্জের ওপর আতঙ্কের কালো ছায়া চেপে বসেছিল। আবার বোধহয় ঠাকুরান ফুলে ফেঁপে ভেঙে ফেলল বাঁধের মাটির প্রতিরোধ দু-চার গাঁ-গঞ্জের ঘর-গেরস্থালি ধুয়ে গেল। ফসলখেতে ঢুকে পড়ল ঠাকুরানির নোনা জল। দুশ্চিন্তায় যখন সকলের নিদ্রাহীন চোখের নীচে কালো বাজপাখি ডানা ঝাপটাতে শুরু করেছিল, তখনই মেঘ ধারাপাত বন্ধ করে লাটের আকাশের দখল ছেড়ে উড়ে গেল উত্তরের দেশে।

মাথার পাশে জানলা। অবশ্য বলা ভালো জানলা ছিল হয়তো কোনোদিন। এখন ফাঁক বড়ো হতে হতে এবং দীর্ঘদিন সংস্কারের কাজে হাত না পড়ায় ছিটে বেড়ার দেয়ালে চৌকোনা জানলা এতদিনে বিচিত্র এক জ্যামিতিক আকার নিয়েছে — যার নীচের অংশ এসে ছুঁয়ে ফেলছে মেঝে, আর ওপরের সীমানা ছাদ ছোঁয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। ওই ফাঁক দিয়ে কেবল বাতাস আর বৃষ্টিই নয়, ঘরের ভেতর কুকুর বেড়াল ঢুকে পড়ে অনায়াসে। নন্দ বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেই জানলা দিয়ে আকাশটা দেখার জন্য তার কোটরে সেঁধিয়ে যাওয়া চোখদুটোকে যথাসম্ভব সতেজ এবং ছুঁচোলো করার চেষ্টা করল। দৃষ্টি তেমন পরিষ্কার হল না। ঝাপসা চোখে যেটুকু আকাশ দেখল, তার চেয়েও বেশি দেখল গরান শিরীষ হরিতকি বয়ড়ার ঘনসবুজ শাখা-প্রশাখায় আচ্ছাদিত দিকচক্র। তবু এর মধ্যেই নন্দ আবিষ্কার করল যে, আজকের সকালটা গত তিন দিনের মতো নয়। বেশ কিছুটা আলো ফুটেছে আকাশে। সেই সঙ্গে বিচিত্র এক আলো ছড়িয়েছে নুনতলার পথেঘাটে। সামান্য এটুকু উপলব্ধিই নন্দর মনে এক বিস্ময়কর তৃপ্তির জন্ম দিল। নন্দর এখন যে জীবন, মানে গত পাঁচ বছরের যে জীবন, সেই জীবনে তৃপ্তি, অতৃপ্তি, দুঃখ কিংবা আনন্দের মাঝখানের ভেদরেখাটা যে কোথায়, নন্দ আর জানে না। তবু দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় শরীর নিয়ে যে তেলচিটে তোশকের ওপর সে শুয়ে আছে, আর যে তোশকের নানা জায়গা ছিঁড়ে গিয়ে তুলো খসে খসে এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে যে, নন্দর ক্ষতসৃষ্টি হওয়া পিঠ বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি এক বিচিত্র তক্তপোশের কর্কশ শরীর ছুঁয়ে ফেলেছে, সেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রায় নিবে আসা দৃষ্টি মেলে নন্দ দিনক্ষণের হিসেব রাখে ঠিক। সেই হিসেবের সূত্র ধরে এক আকুল প্রত্যাশা নিয়ে সকালে প্রথম চোখ খুলে নন্দ যখন আবিষ্কার করল বৃষ্টির ধারা থেমে গিয়ে পরিষ্কার আলোয় ঝলমলিয়ে উঠছে নুনতলা,

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নুনতলার খেজুরিঘাটের আখড়া থেকে মাইকের শব্দবাহিত হয়ে ভেসে এল উচ্চগ্রামের সঙ্গীত — মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান... তখন নন্দর হাড় জিরজিরে শরীরে এখনো যে ক-ফোঁটা রক্ত অবশিষ্ট আছে, সেই রক্ত লাফাতে লাফাতে শরীরের ভেতর দারুণ বিশৃঙ্খলা ডেকে আনল।

চিরকাল ঠাকুরানির উজানি গাঙের এই দেশ নুনতলার বাসিন্দা ছিল না নন্দকুমার। গরানখালির মোল্লাচকে ছিল নন্দর বাপ-ঠাকুরদার বাস। নন্দর বাপ অনাদিচরণের ছিল বিঘা তিনেক জমি। তবে সেই জমি চষেও ফল হয়নি কিছু। নোনা মাটিতে হাল বলদ নামিয়ে কালঘাম ছুটিয়েও ফসল ফলেনি। নুরপুরের এগ্রিকালচার বাবু এসে মাটি পরীক্ষা করে বলে গেছিল — এই মাটিতে ধান ফলবে না। কাজুবাদামের চাষ করো। ভালো দাম পাবে। সেই বাবুকে দেখে অনাদিচরণের বিস্ময় আর কাটে না। এ আবার কেমন ধরনের গুনিনরে বাবা! প্যান্ট শার্ট পরা। সরকারি পরীক্ষায় পাশ দিয়ে কৃষি বিশেষজ্ঞের চাকরি পেয়েছে। অথচ না ধরেছে লাঙল, না গুনেছে বসুমতীর বুকের কান্না! অনাদিচরণ বলেছিল — মা বসুমতী কাঁইদ্‌তেছে যে বাবু! বাঁজা মেয়ের গভ্যে কুন্‌দিন আবার ছাবাল এলো বলো তো? এই মাটি যেমন আছে তেইমনি থাইকবে। আমি আর বসুমতীর বুকে লাঙল নামাতি পাইরব না।

সেই যে মাটির দিক থেকে অনাদিচরণ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল, আর মুখ ফিরিয়ে তাকায়নি। কারণ ততদিনে অনাদিচরণের কানে পৌঁছিয়ে গেছিল, বনবিবির মধুর বাঁশির সুর। এই সুরের এমন সম্মোহন যে গরানখালির মোল্লাচক, সরবেরিয়া, মাদারিপুর, জালালখালি — দশ পাঁচটা গাঁয়ের জোয়ান পুরুষদের সম্মোহিত করে রেখেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। অনাদিচরণ যোগ দিল সনাতন মৌলের দলে। — চাচা, আমি বাউলে যাবু।

হ্যাঁ হ্যাঁ করে দাঁত ছরকুটে হেসেছিল সনাতন। — এতদিনে নেশা ধরিছে মনে! কিন্তু বাবা, তোমার ঘরে কাঁচা বয়েসের এস্‌ত্রী আছে। তুমি সবে বাপ হইছ। এটা কী বাউলি যাবার সময় হল!

— হল। ইটাই সময়। খিদায় মা-বেটার পেট জ্বলে। ছাবাল চিলে চিৎকার করে। ওই কান্না নোনামাটি দিয়া তো মিটবে না চাচা। গরানখালির মোল্লাচকের মানুষ আমি। আমার জন্মের পর থিকে বনবিবির হেঁশেলের হাঁড়িতে চাল মাপা আছে। আমারে নিয়া চলো চাচা।

বছরে ছ-মাস হালদারদের জমিতে জনমজুর, গুলিন খাটা। আষাঢ় থেকে অঘ্রান। তারপর যেই না লাটের আকাশে সকাল সন্ধ্যায় কুয়াশা জমা শুরু হল, বেলা বাড়লে ঠাকুরানি, মাতলা, মুড়িগঙ্গা, রায়মঙ্গলের বুক থেকে কুয়াশা হারিয়ে গিয়ে সদ্য শান দেওয়া বঁটির ফলার মতো ঝাঁ চকচকে রোদ নদীর জলস্রোতে অসংখ্য হিরকখণ্ড ছড়িয়ে দিল, সন্ধ্যার মুখে নদীর পার বরাবর গরান হরিতকি সুন্দরী মেহগনির ঘন জঙ্গলের নীচে এসে জমতে লাগল গুহামানবের কালের নিবিড় এবং আদিম অন্ধকার, ভুট্টা আর তরমুজের খেত ডিঙিয়ে ভেসে এল দূর দূরান্তের গাঁ-ঘরে ধ্বনিত শঙ্খধ্বনি, ওমনি সনাতন মৌলের ডাক ছড়িয়ে পড়ল মোল্লাচকের মাঠেঘাটে —হেই গো, শুনতে পাও কি, বনবিবি ডাইকতেছে গো। ইবারে যাত্রা করতি হয় যে!

যাত্রা শুরু হত। গাঁয়ের বউঝিরা ঘাটে এসে ভিড় জমাত। একটা একটা করে ডিঙি নৌকা

রওনা দিত দক্ষিণদেশে। যেখানে গাছে গাছে মধু। গাছের নীচে কাঁকড়াবিছে শঙ্খচূড় চন্দ্রবোড়া কালাচ পদ্মগোখরা। আর হেতালবনের আড়ালে আড়ালে তেনার নিঃশব্দ আনাগোনা অপেক্ষা করে আছে মধু শিকারিদের ভাঁড়ার ভরিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রতিবারই যত পুরুষ যাত্রা করত বনবিবির আঙিনায় মৌ-ভাণ্ডার পূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষায়, ঠিক গোনাগুনতি একজন পুরুষকে ফিরে পেত না গরানখালির মোল্লাচক-সহ আরো দু-দশটা গাঁয়ের বউঝিরা। কার মরদকে, কোন কিশোর কিংবা কিশোরীর বাপকে, কোন অভাগীর ভাইকে মধুর পূর্ণ ভাণ্ডারের পরিবর্তে ডোরাকাটা বড়মিয়ার সেবায় উৎসর্গ করে আসতে হয়েছে, তার হদিস পেতে ঘাটে দাঁড়িয়ে ফিরে আসা ধ্বস্ত মানুষগুলির মাথা গোনার প্রয়োজন পড়ত না। ঘাটের সিঁড়িতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে আছড়ে-পড়া বউ-বেটি-বেটার আকাশফাটা আর্তনাদই ঘোষণা করে দিত মরদটা কে!

কারো মুখে কোনো কথা থাকে না। দীর্ঘদিন ঘরছাড়া পুরুষটিকে ফিরে পেয়ে কোনো পোয়াতি বউয়ের বুকে সোহাগ জাগে না। কোনো কিশোরীর উৎসুক চোখজোড়ায় ফোটে না আব্বার প্রত্যাবর্তনের বিরল সুখের আলো। তবু মানুষগুলি নদীর পারের এঁটেলমাটিতে পায়ের দাগ ফেলতে ফেলতে ঘরে ফেরে। কেবল দাগ পড়ে না সেই পুরুষটার, যে পুরুষ গত বছরই চরক পার্বণে মোল্লাচকের হাটে চরকে আঠারো পাক ঘুরে অহঙ্কারী করেছিল তার নবপরিণীতাকে। পেছনে পড়ে থাকে চৈত্রের নদী। জাম হরিতকি ছাতিম শাল আর ভোলার নীরব জঙ্গল। আর নদীর দুই পারে নাই নাই শব্দে ফেরাফেরি করা সদ্য বিধবার আর্তনাদ।

তবু আসে অঘ্রান? মাঠের কাজ ফুরায়। অর্জুন হালদারের গোলায় গোলাজাত হয় ধান। তারপর আবার ভাসে ডিঙা। ঠাকুরানি। মুড়িগঙ্গা, রায়মঙ্গল, মাতলার শান্ত জলে দাঁড় টানার ছপছপ শব্দে নদীর দু-পারের ঘন গাছগাছালির শাখায় ঘর বাঁধা পাখপাখালির দল ডানা ঝাপটে উড়ে যায়। লাটের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে বাউলে-যাত্রার সঙ্গীত।

অনাদিচরণের পর নন্দ। একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। বৈচিত্র্যহীন এক সময়-পরিক্রমার ধারাপাত। নন্দর বয়স তখন আঠাশ। এক ছেলে ন্যাড়া, আর এক মেয়ে নেংটি সবে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে শুরু করেছে। আর শ্যামলী তার উষ্ণ শরীরে নোনা গাঙের ঘ্রাণ মেখে নন্দর এক-একটি রাতকে করে তুলছে উৎসবমুখর। এমন একদিনে নন্দ সনাতন সাউটিয়ার সঙ্গে রওনা দিল বাউলে। দলে পাঁচ-পাঁচজন তাগড়াই জোয়ান। এক এক পাতে হাফ কেজি চালের ভাত চালান করে দিতে পারে পেটের ভেতর। গোঁয়ার ষাঁড়ের গলার দড়ি ধরে দাঁড়ালে ষাঁড়েরও ক্ষমতা থাকে না এক পা এগোয়। বনে গিয়ে নন্দ গদাধর মল্লিককে কাঁধে তুলে ধরে। সনাতন সাউটিয়া উঠে যায় গাছের সেই ডালে, যেখানে মৌ জমিয়ে জমিয়ে মৌমাছিরা তৈরি করেছে বিশালাকার চাক। আর কামরুদ্দিন চাকের ঠিক নীচে টিন হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। গদাধর হাতের আঁকশিতে কেরোসিন ভেজানো বস্তা জড়িয়ে আগুন জ্বালায়। মশালের মতো তুলে ধরে আঁকশি মৌচাকের দিকে। মৌমাছির ঝাঁক চাক ছেড়ে উড়ে গেলে ওপরের ডালে ওঁত পেতে বসে থাকা সনাতন হাতের তীক্ষ্ণ কাটারি দিয়ে চিরে দেয় চাকের বুক। ফোটা ফোটা করে মধু ঝরতে শুরু করে চাক থেকে। কামরুদ্দিনের টিনে জমা পড়ে মধু। এমনি করে এক গাছ থেকে আর এক গাছ। এমনি করে এক টিন থেকে অন্য টিন। মধুর ভাণ্ডার পূর্ণ করে, নৌকা ফেরে মোল্লাচকের ঘাটে।

সেদিনও নন্দ তার অসুরতুল্য শরীর নিয়ে গদাধরকে কাঁধে তুলে দাঁড়িয়েছিল সাক্ষাৎ দানবের মতো। সনাতন সাউটিয়া ধূর্ত সরীসৃপের ক্ষিপ্রতায় তরতর করে উঠে গেছিল গাছের ডালে। আর কামরুদ্দিন নীচে টিন হাতে জায়গা নিয়েছিল। গদাধর বলল, নন্দ ভাইরে, দেখিস পা যেন টলে না!

— পর্বত টলতি পারে, কিন্তু কোন শালা বলে একমানুষ কাঁধে নিলে নন্দকুমারের পা টলে! বুকে ডান হাতের চাপড় মেরে উত্তর দিয়েছিল নন্দ।

আর ঠিক তখনই নন্দর চোখ গিয়েছিল হাত চারেক তফাতে হেতাল বনের ফাঁকে জ্বলে ওঠা দুটো উজ্জ্বল চোখের দিকে। কী ছিল ওই চোখে, আজ অন্তিমশয্যায় শুয়ে মনে করতে পারে না নন্দ। তবু সেদিন ওই দুই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবিষ্কার করেছিল দক্ষিণরায়ের দৃষ্টির সর্বগ্রাসী সৌন্দর্য! দেবরাজ ইন্দ্রের চোখের মণি দেখার সুযোগ ঘটেনি নন্দর। তবে ছোটোবেলায় ঠাকুরমা, পরবর্তীকালে মা-র মুখে দেবমহিমার যে গুণকীর্তন শুনেছে, তা থেকে দেবরাজের মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি আর সরোবরের মতো দুই চোখের একটা কাল্পনিক ছবি নন্দর মনে গেঁথে গেছিল। কিন্তু সেই চোখও দক্ষিণরায়ের রাজসিক মুখের ওপর গাঁথা হীরকখণ্ডের মতো মহিমাময় দুই চোখের কাছে নিতান্তই মলিন হয়ে গেছিল।

এমনই সম্মোহন ছিল সেই চোখজোড়ায় যে নন্দ মুখে কিছু বলা তো দূরের কথা, শরীরটাও সামান্য নাড়াতে পারেনি। বলতে পারেনি — সনাতনদাদা, গদাধর, কামরুদ্দিন ভাই; তুমরা সবাই হাঁটু ভেঙে বসে জোড়হাতে প্রণাম করো গো। দক্ষিণরায় এসেছেন আমাদের প্রণাম নিতে।

পরমুহূর্তেই চোখের সামনে যেন আকাশ চিরে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। সেই সঙ্গে দিগন্ত-কাঁপানো গর্জন। নন্দর কেবল মনে হল বিদ্যুতের রঙ হলুদ। তার ওপর কয়েকটা কালো ডোরা। ব্যস। আর কিছু মনে নেই।

নন্দর যখন জ্ঞান ফিরল তখন ডিঙা উজানি গাঙ ভাঙছে। কোনো কিছু বোঝার আগেই নন্দ টের পেল তার ডান পায়ের গোছের কাছে, আর মাজার ঠিক মাঝখানে দু-দুটো চুলা জ্বলছে। নন্দকে চোখ মেলতে দেখে কামরুদ্দিন আকাশফাটা আর্তনাদ করে উঠল, — তুয়ারে ফিরে পাইলাম। কিন্তু গদাধররে দক্ষিণরায়ের সেবায় রাইখে আসতি হল রে... এ...এ! কামরুদ্দিনের আর্তনাদ মেলানোর আগেই নন্দর দু-চোখে আঁধার ঘনাল।

নৌকা এসে ফিরেছিল ক্যানিংয়ের ঘাটে। সেখান থেকে ট্রেনে শিয়ালদহ। শিয়ালদহ থেকে স্টেশন লাগোয়া বিশাল হাসপাতালে। সেখানে তিন মাস কাটিয়ে উরু থেকে গোটা ডান পা-টা জমা রেখে কোমরের হাড়ে জটিল এক সংক্রমণ নিয়ে নন্দ যেদিন মুক্তি পেল, সেদিন গাঙ্গেয় বাংলায় ঘোর বর্ষা। লাটের জনমজুররা হালদার নস্করদের জমি জিরাতে বীজতলা রোয়াতে ব্যস্ত। ফলে হাসপাতালে নন্দকে নিতে এল শ্যামলী, শ্যামলীর ভাই আর নন্দর মা কুঁজোবুড়ি।

তবে গরানখালির মোল্লাচকের তিন পুরুষের বাস্তুভিটায় ফেরা হল না নন্দর। এই তিন মাসেই নন্দর অগোচরে তার পরিবারে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মোল্লাচকের মায়া কাটিয়ে

নিতান্ত পেটের দায়ে শ্যামলীকে বুড়ি শাশুড়ি আর দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠে আসতে হয়েছে ক্যানিং মহকুমার অন্তর্গত নুনতলায়। সেই থেকে নন্দর আশ্রয় বিছানা। কোমরের পর থেকে গোটা শরীর শুকিয়ে আমসি। কোমরের হাড়ে বাসা-বাঁধা জটিল সংক্রমণ পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে মস্তিষ্কের কোষে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে দুই হাতেও কোনো সাড় নেই। মাথার চুল খসে গেছে। কোটরে সেঁধিয়ে গেছে দুই চোখের মণি।

২

'— ডোলা রে ডোলা রে ডোলা...।' সদ্য জল-সরা পলি-জমা উঠোনে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচছিল ন্যাড়া আর নেংটি। ন্যাড়ার কোমরে দড়ি দেওয়া ইজের। পাছার দিকটায় গোটা তিনেক তালি লাগানোর পরেও ফেঁসে গেছে। সেই ফাঁসা দরজার আড়াল ঠেলে শুকনো হিপ দুটো বেরিয়ে আছে। নাচের তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ওঠানামা করছে মাংসবিহীন পেছন। নেংটির পরনে বাস্তবিক একটা নেংটি ছাড়া আর কিছুই নেই। নেংটিটা কোমরের কাছে গিঁট বাঁধা। আশ্চর্য এক কৌশলে নাচের সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে আছে নেংটিটাকে। মেয়ে হওয়ার কারণেই হয়তো এই বয়সেই কোমরের নীচের অঙ্গের গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব বুঝে ফেলেছে। তাই ন্যূনতম আচ্ছাদনটিকে হাতের মুঠোয় ধরে রেখে দাদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৃত্যচর্চার মতো জটিল প্রক্রিয়া আজ নেংটির করায়ত্ত।

দাওয়ার ওপর একতাল পরিত্যক্ত ত্যানা কাপড়ের মতো দু-হাঁটুর মাঝখানে মুখ ডুবিয়ে বসেছিল কুঁজোবুড়ি। আর মাঝেমধ্যে মুখ তুলে নৃত্যরত নাতি-নাতনিকে সাবধান করে দিচ্ছিল, — এই ন্যাড়া, এই নেংটি, থাম দেখি ইবারে। উঠোন যা পিছল, পা পিছলে কোমর ভাঙবি।... কুঁজোবুড়ির শাসনে যে বিশেষ কোনো কাজ হচ্ছিল না, তা ন্যাড়া এবং নেংটির নৃত্যচর্চায় একাগ্রতা দেখে টের পাওয়া যাচ্ছিল।

দুপুর গড়িয়ে গেছে কিছুক্ষণ। বেলা বোধহয় এখন বিকেলের কাছাকাছি পৌঁছিয়ে গেছে। মেঘে মেঘে দিন গেছে বলে ঠাহর হয়নি। কুঁজোবুড়ি একবার মুখ উঁচিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তাকাল। ওদিকের আকাশে ঘন মেঘের স্তূপ এখনও পাতলা হয়নি। কেমন যেন আদিমযুগের অন্ধকারের মতো কালচে মেঘ স্তরে স্তরে জমে আছে। ওইদিকে আছে কুঁজোবুড়ির বাস্তুভিটে। গরানখালির মোল্লাচকে সাড়ে তিনকাঠা জমির ওপর বাঁশ-বাখারির ঘর। আর সনাতন পীরের আস্তানার ধারে তিন বিঘা নোনাজমি। আজকাল যখন নিজের পেটে চুলা জ্বলে অষ্টপ্রহর, নাতি-নাতনি দুটো খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে কুঁজোবুড়ির পিঠে কিল মারে, তখন কুঁজোবুড়ি দাওয়ার এই কোণটায় বসে মুখ উঁচিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে বসে। স্বামী তার চেয়েছিল পীরতলার নোনাজমিটাকে আবাদযোগ্য করে তুলতে। বার দুই-তিন চষে চষে বীজধান ছড়িয়েছিল। কিন্তু রায়মঙ্গলের পাড় উপচিয়ে নোনাজল ঢুকে বীজতলা ফুটতে দেয়নি। মাথায় মহাজনের দেনার পাহাড় নিয়ে চলে গেল বনবিবির আশ্রয়ে। বনবিবি বিমুখ করেনি তাকে।

বাপের দেখাদেখি পেটের ছাবালটাও ভুলল বনবিবির বাঁশির সুরে। ঘরে দু-দুটো ছাবাল, সমস্ত বউ আর বুড়ি মা-র কথা ভুলে ছাবাল তার বাউলে যায়। ফেরে। আবার যায়। আবার

ফেরে। কুঁজোবুড়ি বনবিবির ব্রত পালন করত। বউ শ্যামলীকে দিয়ে দক্ষিণরায়ের পুজো করাত। দক্ষিণরায় যেন কৃপা করেন শ্যামলীর স্বামীরে। দক্ষিণরায়ের দয়ায় স্বামী যেন ফি-বার অক্ষত শরীর নিয়ে ঘরে ফিরতে পারে।

কিন্তু শেষরক্ষা হল কোথায়? মোল্লাচকের ওলাউতলার মণ্ডলবাড়ির জোয়ান ছাবাল গদাধরকে নিয়েও তুষ্ট হয়নি দক্ষিণরায়। সঙ্গে নন্দর ডান পা-টা নিল। মাজার হাড়ে বিষনখ বসিয়ে গোটা শরীরটাকে বিষিয়ে দিয়ে গেল। কার পাপে যে দক্ষিণরায় কুঁজোবুড়িকে এত বড়ো শাস্তি দিলেন, কুঁজোবুড়ি আজও বুঝে উঠতে পারল না।

ঘরে শালগাছের মতো গায়েগতরে বেড়ে ওঠা ছেলে শীর্ণকায় নিস্তেজ শরীর নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে আছে। বাইরের দাওয়ায় বসে আছে কুঁজোবুড়ি। পুত্রবধূ ভোর সকালে বেরিয়ে যায় বাদার দেশে। বউ-এর ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। তখন শ্যামলী সঙ্গে করে বয়ে আনে গামলাভরতি ভাত, ডাল, সবজি। কোনো-কোনোদিন মাটির সরায় থাকে গোটা কয়েক ট্যাংরা, বোয়ালের দু-চার টুকরো। তখন যেন বাড়িতে উৎসব লেগে যায়। সারাদিনের মধ্যে ওই একবেলা ভাত জোটে বাড়ির মানুষগুলির।

যেদিন ভরদুপুরে খিদের জ্বালা সইতে না পেরে ন্যাড়া এবং নেংটি অস্থির হয়ে ওঠে, নিত্যনতুন হিন্দি ফিল্মের জনপ্রিয় গানের কলি উচ্চারণ করতে করতে আদুল গায়ে বৃত্তাকারে পাক খেতে খেতে নৃত্যচর্চার মতো লোভনীয় প্রক্রিয়াতেও মন লাগে না, তখন কুঁজোবুড়ি ন্যাড়া এবং নেংটিকে নিয়ে এক দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে যায়।

ঠাকুরানির ঘাট যেখানে পুরন্দরপুর মোড় পেরিয়ে সরবেরিয়ার সবজি, ফল-পাকুড় কিংবা মাছ বোঝাই নৌকা এসে ভেড়ে, সেখানে রোজ দুপুরে শাকসবজি, ফলপাকুড়, মাছের নিলাম বসে। ব্যাপারীরা আসে ক্যানিং শহর থেকে। কেউ আসে নৌকা করে। কেউ বা আসে ম্যাটাডোর ভ্যানে চড়ে। চাষি, জেলেদের দর হাঁকা, ব্যাপারীদের চিৎকার আর মজুরদের হাঁকডাকে তখন ঠাকুরানির ঘাট ছেড়ে জলের কুমির কামোট কিংবা জলঢোঁড়া সাপেরাও মাঝগাঙে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ঝুড়িভরতি ফলপাকুড়। বস্তাভরতি কুমড়ো থেকে শুরু করে লাউ আর ঝুড়িভরা মাছ দাঁড়িপাল্লায় তোলার সময় একটা দুটো তরমুজ কিংবা কুমড়ো অথবা কোনোদিন একটা গোটা পোনা ঝুড়ি থেকে মাটিতে পড়ে যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তটাকে অত্যন্ত নিপুণভাবে সদ্ব্যবহার করে কুঁজোবুড়ি। নিজে আড়ালে থেকে কখনও ন্যাড়া, কখনও নেংটিকে লেলিয়ে দেয় ভিড়ের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ে মাটিতে পড়ে-থাকা কুমড়োটাকে কি লাউটা কিংবা পোনার বাচ্চাটাকে হস্তগত করার উদ্দেশে। ন্যাড়া কিংবা নেংটি মাটিতে বুক হেঁচড়ে যখন ডজন ডজন মুটেমজুর, ব্যাপারী বিক্রেতার পায়ের ফাঁক গলে এগোয় কিংবা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটিকে হস্তগত করে কুঁজোবুড়ির কাছে ফিরে আসে, তখন কুঁজোবুড়ির মনে হয় ন্যাড়া আর নেংটি যেন মানবপুত্র বা মানবকন্যা নয়, দু-জনেই যেন মা মনসার সন্তান। মা মনসা স্বয়ং নবরূপ ধরে তার পুত্রবধূর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন।

এই আয়াসসাধ্য কাজে রোজই যে কুঁজোবুড়ির ইচ্ছা পূর্ণ হয়, এমন নয়। কোনো-কোনোদিন ন্যাড়া কিংবা নেংটি ব্যাপারী কিংবা জেলে চাষিদের চোখে পড়ে যায়। তখন তাদের হাত থেকে

হস্তগত হওয়া দ্রব্যটিই যে কেবল খোয়া যায়, এমন নয়। উভয়ের কপালে দু-চার ঘা চড়-চাপড়ও পড়ে। তার আশ্চর্যের এটাই যে ন্যাড়া এবং নেংটি, উভয়েই মারধোর খেয়ে কাঁদে না। দাঁত ছড়িয়ে হাসে। কুঁজোবুড়ির বুক টাটায়।

ঘরের ভেতর থেকে একটা গোঙানির শব্দ ভেসে এল দাওয়ায়, অনেকদিন পড়ে আজ নন্দ রাজপুত্রের মতো সাজগোজ করে 'সেভেন বুলেট' ক্লাবের ছেলেদের কাঁধে চেপে সমগ্র চৌভাগা ঘুরে এসেছে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে আজই ছিল প্রচারের শেষদিন। নুনতলা, মাদারিপুর, চকবিষ্ণুপুর, গাজিপুকুর, সরবেরিয়া ; আরো দু-দশটা গাঁ-গঞ্জ নিয়ে যে বিধানসভা কেন্দ্রটি আছে, জনসংখ্যা এবং নির্বাচকের হিসাবে নুনতলায় ভোটারের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। আর এবারের নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে প্রার্থীদের মধ্যে প্রধান দুই প্রার্থী গণেশ নস্কর আর জগবন্ধু প্রতিহারের বসবাস এই নুনতলাতেই। ফলে দুই প্রধান প্রার্থী নুনতলার ভোটারদের মন পেতে সর্বশক্তি দিয়ে প্রচারে নেমে পড়েছিল। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বেশ কড়াকড়ি। ঘরবাড়ির দেওয়ালে যেমন প্রার্থীর জন্য লিখে ভোট প্রার্থনা করা যাবে না, তেমনি গঞ্জে, হাটতলায়, ঠাকুরানির ঘাটে কিংবা কোথাও কোনো ফেস্টুনও ঝোলানো চলবে না। তাই দুই প্রধান প্রার্থী নিত্যদিন প্রচারের অভিনব সব পদ্ধতি আবিষ্কার করে চলেছেন। প্রচারের পদ্ধতিগত অভিনবত্ব দেখে কুঁজোবুড়ি যে কুঁজোবুড়ি, তারও মনে বিস্ময় জেগেছে। গণেশ নস্কর আর জগবন্ধুর এমন বিপুল রোমহর্ষক উদ্‌ভাবনী শক্তি দেখে কুঁজোবুড়ির মনে হয়েছে, দু-জনেই নিশ্চয় দেবতার কৃপাধন্য। না হলে এত মেধা পাবে কেমন করে!

জগবন্ধু প্রতিহারের মদতপুষ্ট মীরঘাটার 'লাশ ফেলা যুবক সঙ্ঘ'র ছেলেরা দু-দিন আগেই নুনতলার মানুষদের রীতিমতো চমকে দিয়েছিল। ফুলে মালায় সাজিয়ে একটা মরা ছাগলকে খাটিয়ায় চাপিয়ে কাঁধে করে সারা নুনতলা ঘুরিয়েছিল। আগে আগে চলছিল জগবন্ধু প্রতিহারের টাটা সুমো। টাটা সুমোয় জগবন্ধু প্রতিহারের পাশে বসে হাতে মাইক নিয়ে ঘোষণা করে চলেছিল 'লাশ ফেলা যুবক সঙ্ঘ'র সেক্রেটারি সদাশিব তা। 'দেখুন দেখুন, ওদের উন্নয়নের প্রকৃত অবস্থা দেখুন। ঠাকুরানির চরে মার্টিন বাঁধকে পাকা করা হবে বলে ওরা প্রতিবার প্রতিটি নির্বাচনে কথা দিয়ে আপনাদের ভোট লুট করে জয়ী হয়। অথচ মার্টিন বাঁধ প্রতি বর্ষায় ভেঙে পড়ে। ঠাকুরানির জলে ভাসে নুনতলা। মরে গরু ছাগল। আমরা তাই মরা ছাগলকে মিছিলে সামিল করে আপনাদের কাছে এই আবেদন পৌঁছিয়ে দিতে চাই যে আপনারা মৃত ছাগলের নামে শপথ নিয়ে সংকল্প ঘোষণা করুন আগামী নির্বাচনে আপনারা আপনাদের সঙ্গী ছাগলের মৃত্যুর বদলা নেবেন। মৃত ছাগলের আত্মার শান্তিলাভের জন্য আমাদের প্রার্থী ছাগলপ্রেমী জগবন্ধু প্রতিহারকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন।'

জগবন্ধু প্রতিহারের এই অভিনব প্রচার গণেশ নস্করের ছেলেদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্টই ছিল। 'সেভেন গ্রেনেড ক্লাব'-এর ছেলেরা এসে গণেশ নস্করকে বলেছিল— একটা কিছু করুন দাদা। আর মাত্র একদিন হাতে আছে। তারপর আর প্রচার চলবে না। এখন নুনতলার বাতাসে তো মৃত ছাগলের আত্মা কেঁদে বেড়াচ্ছে। জগবন্ধু প্রতিহার শেষবেলায় এভাবে লেঙ্গি মারবে, কে ভেবেছিল বলুন দাদা!

গণেশ নস্কর দমেনি। হঠাৎ সে বলে উঠল — 'নন্দ। আমার জন্য মহারাজ নন্দকুমার অপেক্ষা করছে। দেখি এবার জগবন্ধু প্রতিহার থাকে কোথায়?' গণেশ নস্কর ছেলেদের বুঝিয়ে দিয়েছিল তার পরিকল্পনা।

নন্দ। গরানখালির মোল্লাচকের সুখী মানুষ নন্দ। নন্দর জন্ম হয়েছিল আজ থেকে উনচল্লিশ বছর আগে, স্বাধীনতার দিনে। প্রায় চল্লিশই ধরা যায়! চল্লিশ বছর আগে তো ওদের, মানে জগবন্ধুদের সরকারই ছিল এই বাংলায়। সেই সরকারের, সেই দলের জ্বলন্ত প্রতীক তো স্বয়ং নন্দকুমার। পেটের দায়ে জঙ্গলে গিয়ে পা খোয়াতে হয়েছে। মাজার হাড়ে বিষ বীজাণুর বাসা বেঁধেছে। ঘরবাড়ি ছেড়েএই নুনতলার জলাজমিতে ঘর বেঁধে কোনোরকমে টিকে আছে নন্দ।

সেই নন্দকে ফুলে মালায় সাজিয়ে দলের প্রতীকচিহ্ন আঁকা গেঞ্জি পরিয়ে সুন্দর একটা খাটে তুলে নিয়ে গণেশ নস্করের ছেলেরা প্রচারের শেষদিনে নুনতলায় চরকির মতো পাক খেয়েছে। সঙ্গে শাদা অ্যাম্বাসাডারে গণেশ নস্কর আর সেভেন গ্রেনেড ক্লাবের সচিব হারাধন মণ্ডল। মাইকে কাঁপা কাঁপা গলায় ঘোষণা করছে হারাধন — 'দেখুন আপনারা, দেখুন, চেয়ে চেয়ে দেখুন। ওদের শাসনকালের প্রকৃত অবস্থাটা দেখুন। এই নন্দ, যার জন্ম উনচল্লিশ বছর আগে, ওদের শাসনকালে, কেমন করে বেঁচে আছে দেখুন। ওদের শাসন মানেই ঘরে ঘরে জোয়ান মরদের পা খোয়ানো, বিষ-বীজাণুতে ক্ষয়া মাজা নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকা। সেই ভয়াবহ দিনগুলিকে যদি আবার ফিরিয়ে আনতে না চান, তাহলে আমার আপনার প্রিয় মানবপ্রেমী গনেশ নস্করকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন।

একেই বলে ওস্তাদের মার শেষ রাতে। এখন বিকেল পাঁচটা। কিছুক্ষণ আগেই গণেশ নস্করের ছেলেরা নুনতলা ঘুরিয়ে নন্দকে তার পরিচিত বাঁশের মাচার ওপর আবার শুইয়ে দিয়ে গেছে। যে সেগুনকাঠের খাটে শুইয়ে ওরা নন্দকে নিয়ে পরিক্রমায় বেরিয়েছিল, সেই খাটটা আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

কুঁজোবুড়ি জিজ্ঞেস করেছিল — 'খাটটা তোমরা আমার নন্দরে দিবে না বাবা!'

—'এখন দিলি পর চইলবে কেমন করি দিদা! আসছে বছর আবার হবে। বারবার নতুন খাট কি কিনা যায়!' ... এ-কথা বলে, চলে গেছে ওরা।

উঠোনে অন্ধকার নামছে। লাটের আকাশ থেকে বিনবিন করে নেমে আসছে কয়লার গুঁড়োর মতো আঁধারের কণা। অদ্ভুত আলোআঁধারি মায়াজাল রচনা করেছে উঠোনে। সেই আঁধার মেশানো নিস্তেজ আলোর ভেতর আদুল গায়ের ন্যাড়া আর নেংটির নৃত্যচর্চা দেখতে দেখতে কুঁজোবুড়ির মনে হল, উঠোনে তার পরিচিত ন্যাড়া আর নেংটি নয়, কোন অশুভ প্রেতলোক থেকে নেমে এসেছে হাড় জিরজিরে দুই নরকঙ্কাল। এই কঙ্কাল কিশোর-কিশোরী জন্ম নিয়েছে বনবিবির কোলে। দক্ষিণরায়ের ঔরসে। এবার তারা তাকেও গিলে খাবে!

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল কুঁজোবুড়ির। অনেকদিন পরে চোখে ভেসে এল মাতলা নদীর বুকে ভাসমান ডিঙি নৌকা। অনেকদিন পরে কানে ভেসে এল দাঁড় টানার ছলাত ছলাত শব্দ। ওই তো যায় নন্দর বাপ। বাবা দক্ষিণরায়, মানুষটারে ফিরায়ে দিয়ো বাবা।... কাকে কে জানে, কুঁজোবুড়ি দুই হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল।

সারাদিনের শেষে সন্ধ্যা পার করে ঘরে ফিরল শ্যামলী। সন্ধের পর থেকে আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। এখন তারার ফুলঝুরি-জ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে কে বলবে গত তিন দিন, তিন রাত এই আকাশ অঝোরে জল ঝরিয়েছে! ঠাকুরানির বুক যেভাবে জলে উথলে উঠেছিল, তার ফোঁসফোঁসানির শব্দ নুনতলা খেজুড়ির মানুষজনের মনে হিমপাথর চাপিয়ে দিয়েছিল। ঠাকুরানির বুকে ফোঁসফোঁসানি জাগা মানেই মার্টিন বাঁধের বিপদ ঘনিয়ে আসা। আর মার্টিন বাঁধের গায়ে ফাটল ধরা মানেই নুনগোলার মানুষজন, ঘরবাড়ি, দোকানপাট, গোয়ালঘর, গাই-বাছুর, ছাগল-পাঁঠা, হাঁস-মুরগিরও সর্বনাশ। তখন নুনগোলার মানুষদের প্রাণ বাঁচাতে ছুটতে হয় পঞ্চায়েতের সর্বশিক্ষা অভিযানের টাকায় নির্মিত দোতলা প্রাইমারি স্কুলে আশ্রয় নিতে। সেখানে যাদের জায়গা মেলে না, তারা ছোটে জেলা পরিষদের উঁচু সড়কে। তারপর যেই জল কমল, অমনি পড়িমরি করে আবার ঘরে ফেরার জন্য দৌড়। দেরি হলে কার ঘরের চালা, কার ঘরের ছাদে গিয়ে চাপবে, কার ঘরের দেয়াল যে কার ভিটেয় জায়গা পাবে, ঠিক নেই।

দাওয়ার ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে শ্বাস ছাড়ল শ্যামলী। মাজা-পিঠ ব্যথায় বিষ হয়ে আছে। আড় ভেঙে শরীরটাকে একটু সতেজ করতে চাইল। তারপর দাওয়ার ওপর নামিয়ে রাখা ম্যানেজারবাবুর ঘর থেকে বয়ে আনা ভাত ঝোলের হাঁড়িটাকে হেঁশেলঘরের উঁচু থাকটায় তুলে রাখল। হেঁসেলঘর থেকে বেরিয়ে শ্যামলী নিতান্ত কৌতূহলবশে নন্দর ঘরের দরজায় উঁকি দিল। ঘরের ভেতর মিশকালো অন্ধকার। শাশুড়িবুড়ি কুপিটুকুও জ্বালিয়ে যায়নি। অন্ধকারে মশার ভনভনানি কানে বাজছে। নন্দর মাথার কাছে খোলা দরজাসদৃশ জানলার বাইরের খোলা জমিটায় জল জমে আছে। ব্যাঙ ডাকছে জমা জলে। ঠাকুরানির বুকের ওপর জমে থাকা জলের উচ্চতা না কমা পর্যন্ত ওই জল সরবে না। জমা জলে সম্ভবত কোনো কুকুর কিংবা বেড়াল মরে পড়ে আছে। উৎকট দুর্গন্ধে ভরে আছে নন্দর ঘর।

পেটে আর একটা আসছে। শ্যামলী জানত এমনি কোনো আপদ পেটে জায়গা করে নেবেই। এতদিন আসেনি, এটাই তো রীতিমতো বিস্ময়ের। যে-জন ভরপেট অন্ন জোগায়, পরনের কাপড় জোগায়, সাধ-আহ্লাদ মেটানোর জন্য সময় অসময়ে দশ টাকা, কুড়ি টাকা, মায় পঞ্চাশ টাকার নোটও হাতে গুঁজে দেয় শ্যামলীর, সে-জন শ্যামলীর পেটে কোনো আপদের জন্ম দেবে না, সে তো আর হতে পারে না। গাজিপুর, বামুনহাটি, মীর্জাচকে ছড়িয়ে আছে যে-সব মাছের ভেড়ি, সে-সব ভেড়ির বয়স কম হয়নি। কেউ কেউ বলে এই ভেড়িগুলির জন্ম সেই বৃটিশ আমলে। সেকালে সাহেব ব্যাপারীরা নোনাজলের দেশে এসে যেমন লাটের ইজারা নিত, তেমনি ইজারা নিত এক একটি ভেড়িও। তখন ভেড়ির মাছ নৌকায় চালান যেত বিদ্যেধরীর স্রোত বেয়ে হাড়োয়া, দেগঙ্গার মাছের নিলাম-বাজারে। আজ সাহেব নেই, কিন্তু ভেড়িগুলির নামের সঙ্গে সাহেবদের নামগুলির স্মৃতি জড়িয়ে আছে। যেমন কোনো ভেড়ির নাম কর্নেল ভেড়ি, কোনোটির নাম লুইস সাহেবের ভেড়ি। কোনোটি আবার এডওয়ার্ড ভেড়ি।

এডওয়ার্ড ভেড়ির মালিক থাকেন ক্যানিং শহরে। তার ম্যানেজারবাবুর দয়ার শরীর। দক্ষিণরায়ের দয়ায় প্রাণ পেলেও জীবন্মৃত নন্দ যেদিন মোল্লাচকের ঘরে না ফিরে গিয়ে আশ্রয়

নিল কলকাতার হাসপাতালে, আর শ্যামলী যখন জানতে পারল দক্ষিণরায়ের থাবার কল্যাণে নন্দ ঘরে ফিরে এলেও একটা পা রেখে আসতে হবে হাসপাতালে, সেই সঙ্গে কোমরের হাড়ে বিষ-বীজাণু বয়ে ঘরে ফিরবে নিষ্ক্রিয় শরীর নিয়ে, তখন শ্যামলীর কাছে একটাই রাস্তা খোলা ছিল। রাস্তাটি মোল্লাচকের মেয়েমানুষদের কাছে খুব পরিচিত। ন্যাড়া আর নেংটিকে নিয়ে গলায় কলসি বেঁধে ঠাকুরানির বুকে ঝাঁপ দেওয়া।

কিন্তু সে-পথে যেতে দিল না এডওয়ার্ড ভেড়ির ম্যানেজারবাবু। মোল্লাচকের যেসব বউদের মরদরা বাউলে গিয়ে ফিরে আসে না, ঘাটের সিঁড়িতেই শাঁখা ভেঙে সিঁদুর ধুয়ে ফেলে, তাদের মধ্যে রূপযৌবনের অধিকারীরা অধিকাংশই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আশ্রয় নেয় গাজিপুর, বামুনহাটি, মীর্জাচকের ভেড়ির ম্যানেজারবাবুদের ঘরে। সেরকমই একজন আকন্দ। আকন্দই বলেছিল — 'শ্যাম্‌লী, তুর কপাল ফিরতি চলিছে। এডওয়ার্ড ভেড়ির ম্যানেজারবাবুর তোরে মনে ধরিছে।'

ঘর খালি ম্যানেজারবাবুর। পরিবার থাকে সন্দেশখালি ছাড়িয়ে কোন বনবাদাড়ে। বড়ো একটা যাওয়া হয় না ম্যানেজারবাবুর। ফলে ম্যানেজারবাবুর মনে সুখ ছিল না। সেই ম্যানেজারবাবুর মনে সুখ এনেছে শ্যামলী। নিজের হাতে ভাত, সবজি, মাছের ঝাল রেঁধে খাওয়ায় শ্যামলী। ফলে ম্যানেজারবাবুর গ্র্যানাইট পাথরে খোদাইকরা বিশাল শরীরে এখন দানবের শক্তি! এই শরীর নিয়ে ম্যানেজারবাবু যখন শ্যামলীর শরীর চায়, তখন শ্যামলীও সাড়া না দিয়ে পারে না। প্রায় উনিশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল শ্যামলীর। নন্দও তখন তাগড়াই জোয়ান। যেন মানুষরূপী শালগাছ। শ্যামলীর বয়স যখন পঁচিশ, তখনই শ্যামলী দুই ছেলে মেয়ের মা। কিন্তু পঁচিশ বছরে বাদা অঞ্চলের নোনামাটির, নোনাজলের মেয়েদের শরীর থেকে সব খিদেতৃষ্ণা হারায় না। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে শ্যামলী আজ সধবা হয়েও বিধবা। পুরুষসঙ্গহীন রাত্রিগুলি কাটে গোরস্থানের শীতলতা নিয়ে। শ্যামলী জেনে গেছে এই জীবনে আর স্বামীর শরীর তাকে উত্তাপ দেবে না।

এই পরিস্থিতিতে ম্যানেজারবাবুর কাছে প্রশ্নহীনভাবে নিজেকে সঁপে দেয় শ্যামলী। তবু উত্তাপ বিনিময়পর্ব সারা হয়ে গেলে রমণতৃপ্ত ম্যানেজারবাবু যখন মাঝদুপুরের ঘুমে তলিয়ে যায়, যখন এডওয়ার্ড ভেড়ির জল ডিঙিয়ে ছুটে আসে নোনা বাতাস, তখন নিয়ম করে একবার শ্যামলীর বুকের ভেতর দক্ষিণরায়ের গর্জন ধ্বনিত হয়। শ্যামলীর কালো বুকের স্তনযুগলে সদ্য এঁকে দেওয়া ম্যানেজারবাবুর দংশনের ক্ষতস্থানে নোনাঘাম লেগে জ্বালা জ্বালা করে উঠলে শ্যামলীর মনে হয় তার বুকে দংশন বসিয়ে গেছে স্বয়ং দক্ষিণরায়।

দক্ষিণরায়ের জন্যই শ্যামলী আজ শ্বশুরভিটে ছেড়ে ভেড়ির দেশে পড়ে আছে। দক্ষিণরায়ের কল্যাণে নন্দ আজ বেঁচে থেকেও মরে আছে। দক্ষিণরায়ের বিধানে শ্যামলীকে ভেড়ির ম্যানেজারের কাছে শরীর বেচে ঘরের মানুষগুলির জন্য একবেলার আহারের ব্যবস্থা করতে হয়। তবু দক্ষিণরায়ের ওপর রাগতে পারে না শ্যামলী। কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানায় শ্যামলী।

কুপি জ্বালালো শ্যামলী। একটা এনামেল-চটা কলাই-এর বাটিতে দু-মুঠো ভাত নিয়ে চটকে নিল। সঙ্গে একটু ঝোল মেশাল। তারপর কুপি হাতে বাটি নিয়ে নন্দর বিছানা ঘেঁষে দাঁড়াল।

ঠিক যেন কঙ্কাল। ভাঙা গালের দু-পাশ ঠেলে দাঁতের মাড়ি ঠেলে উঠেছে। কোটরে সিঁধিয়ে যাওয়া চোখ দেখে বোঝার উপায় নেই মানুষটা বেঁচে আছে না মরে গেছে। কোমর, লিকলিকে বাঁ পা-টা এমনভাবে বিছানায় পড়ে আছে যেন কেউ শ্মশানঘাটায় পরিত্যক্ত কোনো শবদেহ থেকে কঙ্কালসার একটা ঠ্যাঙ তুলে এনে জুড়ে দিয়েছে নন্দর কোমরের সঙ্গে।

কুপিটা রাখল নন্দর মাথার কাছে। তারপর শ্যামলী একদলা ভাত মুঠো করে ধরল নন্দর মুখের কাছে। নন্দ কিন্তু আজ মুখ হাঁ করল না। কারণটা আন্দাজ করার জন্য শ্যামলী বাঁ হাতে কুপিটা তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল নন্দর মুখের ওপর। একী! শ্যামলী অবাক বিস্ময়ে দেখল নন্দর সারা মুখে আঁকা হয়ে আছে চন্দনের ফোঁটা। গলায় একটা গোড়ের মালা। গায়ে ধপধপে শাদা গেঞ্জি। গেঞ্জির বুকের ওপর গণেশ নস্করের নির্বাচনী প্রতীকচিহ্ন!

মুখ টিপে হাসছে যেন নন্দ। শ্যামলীর মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। মনে পড়ল অঘ্রাণের সেই রাত্রির কথা। সরবেরিয়ার বাখরগঞ্জে মণ্ডলবাড়ির ছোটো মেয়ে শ্যামলীর গলায় মালা পরাতে এসেছে গরানখালির নস্করবাড়ির ডাকাবুকো ছেলে নন্দ। শঙ্খধ্বনি আর উলুরবে কেঁপে উঠছে লাটের অঘ্রাণের হিম-জড়ানো আকাশ। শুভদৃষ্টি হবে এবার। মুখের সামনে থেকে দর্পণ সরিয়ে শ্যামলী দেখছে চন্দনশোভিত নন্দর মুখ। দুই চোখে বনবিবির অতল রহস্য।

কোনোরকমে একছুটে দাওয়ায় বেরিয়ে এল শ্যামলী। তারপর ওয়াক ওয়াক শব্দে দুপুরে পেটপুরে খাওয়া ভাত আর ট্যাংরা মাছের ঝাল উগলে দিল উঠোনে।

আকাশের নীচে

কল্যাণ মজুমদার

'কুইনস নেকলেস' বলা যাবে না এই পথকে, তবু এ-পথে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় প্রতিবার মেরিন ড্রাইভের অসম তুলনাটা মনে আসেই। একপাশে সমুদ্র ছাড়া তেমন কোনো মিল আর নেই। এমনো নয় যে খুব দীর্ঘকাল মুম্বাইয়ে থেকেছে। মানুষের মনে নস্টালজিয়ার একটা ভিন্ন ভুবন থাকে যার পরিচয় সবসময় নিজেরও জানা থাকে না। হঠাৎ করে স্মৃতিতে উজিয়ে উঠলে প্রসন্ন বিস্ময়ে চিত্তে ভিন্নতর মাধুর্যের ছলক লাগে। সকালে যখন বেরিয়েছিল আকাশ ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেপ্টেম্বরের পোর্ট অব স্পেনে এমনই হয়ে থাকে। অথচ বিকেলের ঝকঝকে নীলিমায় নীল আকাশ কেমন যেন শরতের আবহ মনে পড়িয়ে দেয়। আঃ, কতকাল যে বাংলার শরৎ দ্যাখেনি! তার জন্য যে মনখারাপ করে তা নয়। তবে শৈশবের গাঢ় স্মৃতির মাদকতা চেষ্টা করেও ভোলা যায় না। আজ নীলনের মনটা একটু বেশি খুশি খুশি। কিছুদিন আগে আলাস্কায় মাছ ধরতে গিয়ে যে ছবি তুলেছিল হ্যান্ডিক্যামে, সেগুলো দিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করার প্রস্তাব একটা ব্রিটিশ প্রাণীপ্রেমী সংস্থা অনুমোদন করেছে। আর গতকালই এখানকার মিনিস্ট্রি অব শিপিং ইনভেডারস বে-র কাছে একটা মেরিন ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটার জন্য নীলন দীর্ঘদিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

আজ মার্থাকে নিয়ে রাস্ট স্ট্রিটে 'দ্য ভেরেন্ডা'য় খেতে যাবে। ওকে নিয়ে অনেকদিন কোথাও বেরুনো হয়নি। ভেরেন্ডা'র পুকুরঘেরা উঠোন, পাশে জলপ্রপাতের ধ্বনিতরঙ্গ এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। ওখান থেকে বেরিয়ে ভিক্টোরিয়া এভিনিউর ফ্রাইডে নাইট ক্লাবেও যাওয়া যেতে পারে। আসল নাম 'টিজিআই ফ্রাইডে' হলেও নীলন শুধু 'ফ্রাইডে' বলে। এও মার্থার খুব প্রিয় নিশালয়।

ডোরবেলের শব্দ শুনে মার্থা দরজা খোলে। হাতের ব্রিফকেস সোফায় ছুঁড়ে নীলন ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে ফটাফট কয়েকটা চুমু খেয়ে বলে, চলো, আজ আমরা বাইরে খাব। তারপর ডিস্কো।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মার্থা বলল, ব্যাপার কী! হঠাৎ এত উল্লাস কীসের?

জামাকাপড় বদলানোর মধ্যেই নীলন নিজের স্বপ্ন-সফলতার কথা বলে। বলার আনন্দে খেয়ালও করে না যে মার্থার মুখ ভারী হয়ে উঠেছে। চোখে জমছে কুয়াশা। মুখ ঘুরিয়ে নীলন বলে, কিছু বলছ না কেন!

— আমি আর কী বলব। তোমার খুশি লাগছে, বন্ধুদের নিয়ে ফুর্তি করে এসো। একটু পরেই তোমার প্রাণের প্রাণ ডেরেক হার্পার হাজির হবে। তোমার সঙ্গে না থাকলে নির্ঘাত ভাবতাম তোমরা হোমো।

— মার্থা, মাই ডিয়ার, তোমার এসব বলা মানায় না। এখানে ডেরেকই আমার প্রথম বন্ধু। লন্ডনে আমরা একসঙ্গে বোর্ডিং করতাম। ও না থাকলে আমি হয়তো এখানে আসতামই না। ডেরেকই কিন্তু আসলে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

— একদম বাজে কথা। ও তোমাকে নিয়ে আমাদের অফিসে এসেছিল এই যা। জাস্ট এ গাইড। আমি তোমাকে কফি অফার করেছিলাম। আর সন্ধেবেলা ফের ডিস্কোতে দেখা হল। ব্যস আমি গলে গেলাম। সাচ এ ফুল আই ওয়াজ। তোমার এখানকার কাজ তো শেষ হল তা হলে। নেক্সট কোথায় যাবে?

— কাজ এখনও শেষ হয়নি। আরও কয়েক মাস লাগবে। নরওয়েতে যাওয়ার কথা তো হয়েই আছে।

— তুমি নরওয়ে যাবেই? আমি আগেই বলেছি ত্রিনিদাদ ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

— মনে আছে। সে যখন যাবার তখন ভাবব। এখন রেডি হয়ে নাও।

— তা না হয় হচ্ছি। তুমি কলকাতায় একটা ফোন কর। ওয়ান মি. বিড়েন দশ, তিনবার ফোন করেছিলেন। খুব আর্জেন্ট নাকি।

বিড়েন দশ মানে বীরেন দাশ বুঝতে অসুবিধে হল না। হঠাৎ ফোন করবে কেন! করেছে যখন নিশ্চয় জরুরি দরকার আছে। ফুলমাসির কিছু হয়নি তো? বীরেন ওর বাবার আমলের মানুষ। অত বড়ো বাড়ি বীরেনই দেখেশুনে রাখে। ফুলমাসির বয়েস হয়েছে, এখন আর খাটাখাটনি করতে পারেন না। তবু তিনিই একমাত্র তার অতীত অস্তিত্বের যোগসূত্র। আত্মার অংশীদারও। নীলন ঘড়ি দেখে। সন্ধ্যা আটটা। কলকাতায় এখন ভোর সাড়ে পাঁচটা হবে। বীরেন বোধহয় পাঁচটাতেই উঠে পড়ে। জরুরি বলেছে যখন হয়তো অপেক্ষায় থাকবে। ও ডায়াল করে। খুটখাট শব্দের সঙ্গে রেডিয়োর কঁকানির মতো কিছু অপার্থিব আওয়াজ, তারপরই চেনা রিংটোন।

টেলিফোন বেজে যায় অনেকক্ষণ। হয়তো কেউ ওঠেনি। বা টেলিফোন থেকে দূরে আছে। হতাশ হয়ে ছেড়ে দেবার পূর্বমুহূর্তে চেনা গলা শোনা গেল, হ্যালো —

নীলন বলল, বীরেনদা, আমি নীলু বলছি। তোমরা সবাই ঠিক আছ তো! ফোন করেছিলে কেন?

ভাঙা গলায় বীরেন বলে, তুমি শিগগির এসে যা করার করো। আমি আর তোমাদের ঘরবাড়ি ধরে রাখতে পারব না।

বোঝা যায় বীরেন বেশ উত্তেজিত। ব্যাকুল ও শঙ্কিত। নীলন বলল, ফুলমাসি কোথায়? ফুলমাসিকে দাও।

— তিনি থাকলে কি আর তোমাকে বিরক্ত করতাম! জ্যাঠাবাবু আমার হাতে সব তুলে দিয়ে গেছেন, আমি সেসব আর রাখতে পারছি না। এই দুঃখ অপমান আমি কাকে বলব!

বাবাকে বীরেন জ্যাঠাবাবু বলে ডাকত মনে আছে। এও মনে আছে বাবা বলেছিলেন, তুই বেশিরভাগ সময় বিদেশেই থাকিস। তবে এটা আমাদের পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার। একে রক্ষা করা আমাদের পরম কর্তব্য। যতদিন বীরেন থাকবে ওই দেখেশুনে রাখবে। তুই রাখতে না পারলে ওকে যেন বঞ্চিত করিস না। তোর ফুলমাসির কথা আমি আর কী বলব। মাসি না বলে তোর ওঁকে মা-ই বলা উচিত।

— ফুলমাসি কোথায় বলছ না কেন?

— ফুলমা আমায় বারবার বলেছেন তোমাকে না বলতে। কিন্তু আমি কী করব। ফুলমা হাসপাতালে ছিল গত দু-মাস ধরে। গতকাল বিকেলে চলে গেলেন। তারপর থেকেই তোমাকে ফোনে চেষ্টা করে গেছি আর এদিকে ...

ফুলমাসি নেই! মুহূর্তে নীলনের মাথায় লোডশেডিং। সমস্ত অনুভূতি অবশ। চোখ জুড়ে গাঢ় অন্ধকার। ওর চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয়। পারে না। কণ্ঠা ধরে একটা বোবা আর্তনাদ কবন্ধের মতো ঝোলে যেন। আর বীরেনদার কাছে ফুলমাসির চলে যাওয়ার চেয়ে বাড়ি বেদখল হবার খবরটাই বেশি জরুরি হল! জীবনের হিসেব তো এমনই হয়। ফুলমাসি নেই। কিন্তু বাড়ি জমি তো বাস্তবিকই বিস্তৃতভাবে আছে। এবং তা নিজের দখলে সুস্থির রাখার প্রামাণ্য দায় আছে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও।

— নীলুভাই... নীলুভাই, তুমি শুনছ? পার্টির ছেলেরা নিচতলাটা দখল করে নিয়েছে। বলছে, পুরো সম্পত্তিই ওরা নিয়ে এখানে হাউজিং এস্টেট বানাবে। তুমি শিগগির এসে কিছু একটা করো।

নিছক অনিচ্ছায় গলা যথাসাধ্য পরিষ্কার করে নীলন কোনোমতে বলে, তোমাকে তো পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দেওয়াই আছে। দু-চার দিনের মধ্যে আমি তোমার নামে সবকিছু লিখে হাই কমিশনের মাধ্যমে পাঠাচ্ছি। দ্যাখো যদি বাবার স্মৃতিটুকু রাখতে পারো। ফুলমাসি নেই, আমি আর কেন যাব!

টেলিফোন রেখে বাহুর ভাঁজে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে থাকে। বুকের ভেতরে ঝরে যায় অনিঃশেষ প্রপাত। হৃৎপিণ্ডের জায়গাটায় এক অপার শূন্যতা। এমন শূন্যতা যেখানে বিন্দুমাত্র বায়ুপ্রবাহও নেই।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গলা তুলে বলল, মার্থা, আমি একটু ঘুরে আসছি।

মার্থাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দরজা টেনে বেরিয়ে গেল নীলন। গাড়ি চালিয়ে চলে এল সমুদ্রের ধারে। স্বাভাবিক ছন্দে সমুদ্রতরঙ্গ আছড়ে পড়ছে প্রস্তরসংকুল তটে। ওর মনে হল যেন ডাকছে, আয়। নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি রেখে নীলন চলে এল বোট ক্লাবে। বোটম্যান জো ডিলান ওকে দেখে বলল, হাই নীল, ওয়ান্ট আ বোট? টেক দ্যাট ওয়ান। হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু। শী ইজ নিউ অ্যান্ড প্রেটি। উইথ ওয়েল স্টকড বার।

লগবুকে সই করে চাবি নিয়ে বোট চালিয়ে দিল নীলন। বোটটা ছোটো কিন্তু সত্যিই সুন্দর। যেন ওর দীর্ঘদিনের পোষা। সমুদ্রের ঢেউ ডলফিনের মতো বোটের গায়ে মুখ ঘষে। আকাশ এখানে বিপুল। তারায় তারায় কোভাগরী। কতক্ষণ ঘোরের মধ্যে বোট চালিয়েছে জানে না। মাথার চুলে বাতাসের খুনসুটিতে আস্তে আস্তে ভেতরের অবদমিত রুদ্যমান ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে আসে। মাঝ সমুদ্রের নিবিড় নির্জনতায় একা বোটে ভাসতে ভাসতে ও ফিরে যায় কলকাতার লেক ক্লাবে বোটিংয়ের সোনালি দিনগুলোয়। বাবা নিয়ে গিয়ে ভরতি করে দিয়েছিল। শৈশব থেকেই জলের সঙ্গে ওর প্রাণের বন্ধন। কখনও জলের থেকে দূরে থাকতে পারেনি। যখন যেখানে গেছে সেখানের বোট ক্লাবের সদস্য হবার চেষ্টা করেছে। কিংবা ভাড়া নিয়ে বোটিং করেছে। জল কথা শোনে। জলের সঙ্গে কথা বলে ও-ও মনের বেদনা কলুষ প্রক্ষালন করে নিতে পারে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ায়, জলের সঙ্গে সখ্যকে পেশার সঙ্গে

মিশিয়ে দিতে পেরেছে। শুধু ফুলমাসির চোখের জল ও সইতে পারত না। আবার ও নিজেই ফুলমাসির কত অশ্রুপাতের কারণ হয়েছে। সেসব কথা এখন রেগাটা-র বোট মিছিলের মতো নিরন্তর ছুটে আসছে।

একটা বিয়ারের বোতল খুলে ঢকঢক করে গলায় ঢালে। বুক জুড়ে সাহারা পিপাসা।

পৈতৃক বাড়ি জমি দখল হয়ে যাচ্ছে বীরেনদা বলল। বাড়িটাকে ঘিরে প্রায় দেড় বিঘা জমি। ফল ফুলের চাষ হত। বাড়ির উঠোনেই প্রথম ফুটবল খেলেছিল। সেই উঠোনেই দেখেছিল মা-র শরীরের ধ্বংসাবশেষ। তখন বয়েস মাত্র চার। মার স্তনে ক্যান্সার হয়েছিল। মা-র মৃত্যুর সময় শব্দগুলোর মানে বুঝত না। পরে বড়ো হয়ে জেনেছে। মা-র মৃত্যুর বছরখানেক আগে ফুলমাসি বিধবা হয়েছিলেন। মেসো কেন আত্মহত্যা করেছিলেন কোনোদিন জানা যায়নি। নিঃসন্তান ফুলমাসি নীলুর দায়িত্ব নেবেন, এ-যেন স্বতঃসিদ্ধই ছিল। বড়ো হবার সময়ে বাবা ও মাসিকে নিয়ে নানা চাপা কুকথা কানে এসেছে। সেসবই ছিল নিছক গুজব। যৌন অনাচারের কল্পকাহিনীর মতো মুখরোচক বিনোদনের কোনো বিকল্প সঙ্কীর্ণ মধ্যবিত্ত জীবনে আর নেই। নিজের যৌন চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে খুব সচেতনভাবে দিনের পর দিন বাবা আর ফুলমাসির আচরণ লক্ষ করে নীলন নিশ্চিত হয়েছিল চলতি কুকথার মধ্যে বিন্দুমাত্রও সত্যতা নেই। কেননা ফুলমাসি বাবার সঙ্গে সরাসরি খুব কম কথাই বলতেন। বাবাও ফুলমাসির প্রসঙ্গে সর্বদা পরিচ্ছন্ন সম্ভ্রমের পরিচয় দিয়েছেন। ওঁদের মধ্যে যদি কিছু থাকত বা ঘটত তাতেই বা কী এসে যেত! চার বছরে ফুলমাসির কোলে ওঠার পর এই প্রথম জানতে পারল মাতৃহারা শব্দটির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য। বাস্তবিকভাবে ছয় বছরের পর আর প্রকৃতই কোলে ওঠা সম্ভব ছিল না, কিন্তু পাশে বসে থাকলেও মনে হত যেন কোলেই আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য বিলেত যাওয়ার দিন ফুলমাসিকে প্রণাম করে গাড়িতে ওঠার সময় যথার্থ মনে হয়েছিল ওকে যেন কেউ জোর করে ফুলমাসির কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওঁর স্নেহের আলিঙ্গনে কোলের চেয়েও বেশি উষ্ণতা ছিল।

ফুলমাসির খুব সাধ ছিল ও দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে করে থিতু হোক। কিন্তু ও তো পিঠের নীচে জল নিয়ে জন্মেছে। এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রে, এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে ওর অন্তহীন যাত্রা। তারপর ইউএনডিপির ডাকে প্রথমে গ্রিস পরে ত্রিনিদাদ চলে আসা। এখানে এসে পরিচয়ের পর ফোন করে ফুলমাসিকে বলেছিল মার্থার কথা। মার্থা দেখতে মুলাটো হলেও ওর মধ্যে রয়েছে ভারতীয়, ব্রিটিশ ও আফ্রিকান রক্তের এক অপূর্ব সমন্বয়। একবার ভেবেছিল নামটা বদলে শ্যামলী রাখবে। শ্যামলী শব্দের মহিমা বোঝাতে ক-বোতল বিয়ার শেষ হবে তা অনুমান করতে না পেরে সেই চেষ্টাটা আর করেনি। ফুলমাসি বলেছিল, তুই ওকে বিয়ে করলে আমার কোনো আপত্তি হবে না। শুধু একবার আমাকে দেখাতে নিয়ে আসবি। ও বলেছিল, আমরা বিয়ের কথা ভাবছি না। শুধু একসঙ্গে থাকছি। ক-দিন পর আমি আবার কোথায় চলে যাব নিজেও জানি না।

— তুই ওকে ভালোবাসিস না? মাসি জানতে চেয়েছিল।

নীলন বলেছিল, এক জীবনে কত আর ভালোবাসা যায়! তোমার পর আর কারুর জন্যই আমার ভালোবাসা আসে না। শোনো, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হলে আমি দেখি ও পরিচ্ছন্ন কি না, মুখে বা দেহে দুর্গন্ধ আছে কি না, আর মোটামুটি বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলতে পারে কি না। মার্থা এই সব পয়েন্টেই স্টার পেতে পারে। তবে ওর মুশকিল ত্রিনিদাদ ছেড়ে যাবে না। ওর মা এখান থেকে অল্প দূরে একা থাকেন। তিনি আবার প্রতিবন্ধী। আর্থিক সঙ্গতি ভালো নয় বলে মার্থাকেই দেখতে হয়। আমি অবশ্য বলেছি যথাসাধ্য করব। এরা এমন আত্মাভিমানী যে সহজে কারো সহায়তা নিতে চায় না। তবে মাসি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, মার্থা আমাকে সত্যিই খুব ভালোবাসে।

—বিয়ে কর্ বা না কর্ তবু ওকে নিয়ে একবার আয়। কতকাল তোকে দেখি না। তোর আমাকে দেখতে আজকাল একটুও ইচ্ছে হয় না রে!

— ফুলমাসি, এভাবে বোলো না, আমি কেঁদে ফেলব। তোমাকে দেখতে যে কী ইচ্ছে হয় কী বলব! কিন্তু এমন কাজের বোঝা, বেরুবার পথ পাই না। তবু এবার একবার ঠিক চলে আসব।

— আমি থাকতে থাকতে আসিস।

না, যাওয়া হয়নি। ছুটি পেলেই চলে গেছে অন্য আবিষ্কারে। মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া, কোথায় যায়নি। কেন যে জল ওকে অমোঘ টানে, বুঝতে পারে না। অজানা সমুদ্রের ডাক এলেই ও উন্মাদের মতো ছুটে যায়। তখন ফুলমাসির কথাও মনে পড়ে না, প্রিয় নারীর তীব্র আকর্ষণও তুচ্ছ।

খালি বোতল সমুদ্রে ছুঁড়ে আর একটা বোতল খোলে নীলন।

এখন ফুলমাসির জন্য যে কষ্ট হচ্ছে তাও সত্য, সেখানে কোনো ফাঁকি নেই। বাড়িটা বেদখল হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য বিন্দুমাত্রও মানসিক বিকার নেই। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, ইন্টারনেটে এবং পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শুনেছে পশ্চিমবাংলায় এখন চলছে মুষলপর্ব। ফ্যাসিবাদের এক বদান্য মুখ। হিপোক্র্যাসির চূড়ান্ত রমরমা। প্রমোটাররাজ নামক এক নবীন দানবীয় পেশি-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। খালি জমি দেখলেই দখল করা এখন পার্টির একমাত্র প্রধান কর্মসূচি। খুন ধর্ষণের রোজনামচাও অজানা নয়। যেমন এখনো সুযোগ পেলে খোঁজ নেয় ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলার ফল কী হল। সুতরাং বেওয়ারিশ বাড়ি দখল হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবু হাই কমিশনের মাধ্যমে বীরেনদার নামে সব লিখে দেবে। দখল রাখতে পারবে কী পারবে না বীরেনদা বুঝুক। নীলন বাবার কথা অমান্য করবে না। ফুলমাসি থাকলে তবু নিজে গিয়ে একবার দেখত। ... ফুলমাসি, তুমি আমাকে একা ফেলে চলে গেলে!

আকণ্ঠ বিয়ার গিলেও যেন তৃষ্ণা মিটছে না। ও আরো বিয়ার ঢালে গলায়।

নীলনের চোখ বেয়ে অঝোরে জল নামে। চোখের জল সমুদ্রের জলে মিশিয়ে দিতে আকাশও ওপর থেকে জল ঢালতে শুরু করে। বোটের গায়ে ছলাত ছলাত শব্দ ফুলমাসির পিঠ চাপড়ে দেবার কথা মনে করিয়ে দেয়। ও এবার নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গলা চিরে চিৎকার করে কাঁদে। বর্ষণমুখর আকাশের নীচে সমুদ্রের তরঙ্গমালায় রচিত হয় নতুন প্রণব। আকাশ আর সমুদ্রই তার ভাষ্যকার।

বলেছিল 'ভেরেন্ডা'য় খেতে যাবে, তারপর ডিস্কোতে। অথচ হঠাৎ 'একটু ঘুরে আসছি' বলে বেরিয়ে যাবার পর দু-ঘণ্টা কেটে গেল নীল এখনো ফিরল না। এমন কখনো হয়নি আগে। মার্থা চিন্তায় পড়ে ভাবার চেষ্টা করে কোথায় যেতে পারে। সেই সঙ্গে এ-কথাও মনে হয়, কলকাতায় কী কোনো খারাপ খবর শুনেছে! খারাপ খবর কী হতে পারে? ওর মা-বাবা নেই জানে। এও জানে নীল একমাত্র সন্তান। তা হলে কী হতে পারে! তা ছাড়া ওর জীবনচর্যা দেখে কখনো মনে হয়নি দেশের প্রতি বা দেশের মানুষের জন্য আবেগঘন কোনো বিবশতা আছে। নীল বেশ ক্ষ্যাপাটে, যাকে বলে আনপ্রেডিক্টেবল। আর সেটাই ওর প্রধান আকর্ষণ। সব সময় যেন অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে থাকে। সরল সততাও ওর চরিত্রের প্রধান পরিচয়। আলাপ হবার তিনদিন পরই নীলন বলেছিল, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তোমাকে আমি বিশেষ বন্ধু হিসাবে পেতে চাই।

ঠোঁটকাটা মার্থা অবলীলায় বলেছিল, কোথায় পেতে চাও? বিছানায়?

নীলন অতি সহজ স্বরে বলেছিল, সে তো চাইবই! তবে সারাদিনে সে আর কতটুকু সময়! আমি চাই সারাক্ষণের জন্য। একসঙ্গে সপাটে জড়িয়েমড়িয়ে জীবনযাপন।

কী যে ছিল ওর উচ্চারণে! মনে হয়েছিল শব্দ হয়, হৃদয়ের অন্তর্গত বিশ্বাস উঠে আসছে কণ্ঠ বেয়ে। আর কিছু না বললেও বিছানায় যেতে আপত্তি হত না। মার্থা নিজেই আগ্রহী হয়েছিল নীলকে বুকে জাপটে চুমু খেতে। বাধা দিয়ে নীলন বলেছিল, আমি একটা সত্যি কথা এখনই বলতে চাই, যাতে পরে কেউ কারুকে দোষারোপ না করতে পারি। আমার তোমাকে ভালো লেগেছে এটা যেমন সত্যি, তেমনি এও সত্যি যে আমি খুব বেশিদিন ত্রিনিদাদে থাকব না। কবে কোথায় যাব জানি না। পছন্দের আহ্বান এলেই চলে যাব। তখন ইচ্ছে করলে তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পারো। না গেলেও আমার কিছু বলার থাকবে না।

নিজের মা-র কথা বলে মার্থা বলেছিল, আমার যাওয়া সম্ভব নয়। তবে এখন তোমার সঙ্গে আছি, থাকব।

গত দুটি বছর চমৎকার কেটেছে। অন্য মেয়েরা ওকে হিংসে করে ওর পুরুষ-ভাগ্য দেখে। নীল সুপুরুষ, প্রভাবশালী। যেমন রোজগার করে, হইহই করে খরচ করতেও ভালোবাসে। আজও তো তেমনই হইহই করার কথা বলেছিল। অথচ এখনো ফিরল না, একটা ফোনও করল না। এমন তো নীল করে না।

কী আশ্চর্য, আজ ডেরেকও এল না। ফেডারেশন পার্কের এই বাড়িতে ডেরেকবিহীন সন্ধ্যা অভাবনীয়। দু-জনে কোথাও বিয়ার নিয়ে বসে পড়েছে নাকি? বাস্কেটবলের খেলা আছে কোনো? মার্থা ডেরেকের বাড়িতে ফোন করে। ডেরেক থাকবে না জানা। তবে ওর বউ ক্লডিয়া ঠিক বলতে পারবে দু-জন কোথায় যেতে পারে। তিনবার রিং বাজতেই মার্থাকে অবাক করে ফোন ধরে ডেরেক।

— ইয়া ...

— ডেরেক, মার্থা বলছি। তুমি এসময় বাড়িতে? নীল কোথায়?

— অফিস ছাড়ার আগে নীল আমাকে ফোন করে বলেছিল তোমাকে নিয়ে ডিনারে যাবে। ডিনারের পর কোথায় বসবে জানাবে বলেছিল। আমি তো ওর ফোনের জন্যই বসে আছি। বোর হয়ে জাস্ট একটা রাম ঢেলেছি।

বোঝা গেল ডেরেক কিছুই জানে না। মার্থা সংক্ষেপে সব কিছুর বিবরণ দিয়ে বলল, এতক্ষণ হয়ে গেল! আমি কী করি বলো তো? কোথায় খোঁজ করব? হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি নামছে। গাড়িটাও নীল নিয়ে গেছে।

ওকে আশ্বস্ত করে ডেরেক বলল, চিন্তা কোরো না। বাড়িতে থাকো। আমি আসছি।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ডেরেক এসে গেল। বলল, আরো একবার তুমি আমাকে বলো, ঠিক কী কী হয়েছিল। নীল কী বলেছে।

কলকাতার ফোনের কথা শুনে ডেরেক বলল, ও যখন কলকাতায় কথা বলছিল, তুমি কিছু শুনেছিলে?

— শুনিনি। আমি ড্রেস করছিলাম। তা ছাড়া নিজের দেশের ভাষায় কথা বলছিল নীল। আমার বোঝার বাইরে।

— বেরিয়ে যাবার সময় নীলকে দেখেছিলে?

— না। ও হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, মার্থা, আমি একটু ঘুরে আসছি। গলাটা খুব ভারি ছিল। কখনো আপসেট হলে বা রেগে থাকলে অনেক সময় হয়েছে এরকম।

ডেরেক বলল, ফোনটা দাও।

তিন চারটে ফোন করার পর বলল, মনে হয় বুঝতে পেরেছি ও কোথায় গেছে। আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।

মার্থা বলল, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

দ্বিধায় পড়ে ডেরেক। রাত হয়েছে। সমুদ্রে ওকে নিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে! কিন্তু ও যা একগুঁয়ে, নিরস্ত করা কঠিন। তবু বলল, এই রাতে তুমি আর কোথায় যাবে। আমি দেখে আসছি। তুমি শান্ত হয়ে অপেক্ষা করো। ডিনারে যাওয়া হবে বলে মনে হয় না। তুমি ঘরেই যা হোক কিছু করে রাখো।

মার্থা নাছোড় গলায় বলল, আমি যাবই। ঘরে খাবারের অভাব নেই। তুমি চলো। আমার ভেতরে যে কী হচ্ছে তুমি বুঝবে না।

গাড়িতে উঠে ডেরেক বলল, আমার ধারণা নীল সমুদ্রে গেছে বোট নিয়ে।

— সে কী! একা একা এই রাতে শুধু শুধু সমুদ্রে যাবে কেন?

— আমরা যারা বোটিং করি তাদের কাছে জলই জীবন। আমাদের সুখ দুঃখ বেদনা আনন্দ সব জলের সঙ্গে ভাগ করে না নিতে পারলে আমরা শান্তি পাই না। নীলকে আমরা জলজ প্রাণী বলতাম। ওর কাছে জলই পৃথিবী।

বোট ক্লাবে এসে জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল নীল একটা বোধ নিয়ে বেরিয়েছে। লগবুকে তার প্রমাণও পাওয়া গেল। কিন্তু কোন দিকে গেছে? ওই বোটে রেডিয়ো নেই। আরো একটু খোঁজ করে মোটামুটি একটা আন্দাজ পেল কোনদিকে যেতে পারে। সদ্য ফেরা একটা ট্রলারের কাছ থেকে জানা গেল, 'হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু' বোটকে উত্তরপশ্চিম দিকে যেতে দেখেছে।

ডেরেক একটা হাই স্পিড বোট ভাড়া করে মার্থাকে ডাকে, এসো।

এই বোটটায় রেডিয়ো আছে। বোট অফিসকে বলল ডেরেক, নীলের কোনো খবর পেলে বা ও ফিরে এলে আমাকে জানিয়ে দিয়ো।

পরিচিত বোটম্যান জেরি রামধনকে বলল, জেরি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে।

আকাশে আবার তারার মেলা দেখা যাচ্ছে। দূরে বড়ো বড়ো জাহাজের আলো সমুদ্রের জলে বিম্বিত হয়ে নানা রকমের আলোর আল্পনা তৈরি করেই ভেঙে ফেলছে। গম্ভীর শঙ্খনাদের মতো জাহাজের ভোঁ অপ্রাকৃত সঙ্গীতের আবহে বাজে। ডেরেক বলে, মার্থা, ভয় লাগছে না তো ?

— না। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে ওকে খুঁজে পাবো!

জেরি বলল, ডোন্ট ওয়ারি। বেরিয়ে পড়েছি যখন ঠিক খুঁজে নেব। তুমি আমাকে এক পাঁইট বাকার্ডি খাওয়াবে।

বেশ অনেকদূর চলে এসেছে। কোথাও নীলের বোটের চিহ্ন নেই। আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। ডেরেক রেডিয়োতে সব বোটকে বলে 'হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু'র জন্য নজর রাখতে। কিন্তু কোথা থেকেও সাড়া আসে না। ডেরেকের মন বলে ও ঠিক দিকেই যাচ্ছে। ওরা দু-জনে বহুবার বোট নিয়ে নিজেদের মধ্যে খেলা খেলা প্রতিযোগিতা করেছে। এই সমুদ্রের উত্তর পশ্চিম অংশটাই ওদের পছন্দ ছিল। তবে এখন বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বোটের আলোতে সমুদ্রতরঙ্গকে মনে হয় যেন লক্ষ লক্ষ সাপ কিলবিল করছে। মার্থা অস্থিরভাবে নিজের দু-চোখকে সার্চলাইট করে সমুদ্রের প্রতি কোনার তল্লাশি নেবার প্রয়াস চালায়।

আরো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর আচমকা মার্থা চেঁচিয়ে ওঠে, সামনে বাঁদিকে দ্যাখো। আমি যেন নীলের গলা শুনতে পেলাম।

জেরি বলে, কুল ম্যাম কুল। এই বৃষ্টি, তারপর সমুদ্রের হাওয়া। ঢেউয়ের গর্জন। এর মধ্যে নীলের গলা শুনবে। ভুল শুনেছ।

ওর কথা উড়িয়ে দিয়ে মার্থা বলল, ডেরেক, আলোটা সামনে বাঁদিকে ফ্যালো, আরো একটু এগিয়ে, ওই দ্যাখো একটা বোট দুলছে। এই আবার নীলের গলা শুনলাম। তাড়াতাড়ি চলো, প্লিজ। ফাস্টার, ফাস্টার ...

আরো কিছুটা এগুলে মার্থার কথামতো একটা বোটের আদল ফুটে ওঠে। আরো এগোলে জেরি সোল্লাসে চেঁচায়, ওই তো 'হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু'। আমি ওটাকে খুব ভালো চিনি।

ডেরেক দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। মার্থা পারলে লাফিয়ে চলে যেত নীলের বোটে। একপল দেরিও ওর কাছে ভীষণ দীর্ঘ মনে হচ্ছে। বৃষ্টি আরো ঝাঁপিয়ে এল। সঙ্গে তুমুল হাওয়া। ডেরেক নীলের বোটের ওপর আলোর ফোকাস ধরে রাখে। বোটটা স্পষ্ট হতেই এলিয়ে-পড়ে-থাকা নীলকে দেখা যায়। বোটের কাছ ঘেঁষে এলে শোনা যায় অসংবৃত কণ্ঠধ্বনি। মার্থা বাস্তবিকই শুনেছিল নাকি তার অনুভবের গভীরের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছিল বলা কঠিন।

নিজেদের বোট নীলের বোটের গায়ে ঠেকিয়ে ডেরেক বলল, জেরি, তুমি এর কন্ট্রোলে বোসো। আমি গিয়ে দেখছি নীল কী অবস্থায় আছে।

মার্থা বলল, আমিও যাব।

ডেরেক বলে, তুমি পারবে? মুরিং নেই। দেখছ তো কেমন দুলছে। তবু আমি যাই আগে।

দোদুল্যমান বোট থেকে লাফিয়ে ডেরেক কোনোমতে নীলের বোটে এল। দেখল বোটের ইঞ্জিন অফ করে ও বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। হাতে তখনো একটা বিয়ারের বোতল। নেশার মধ্যেই কিছু অস্পষ্ট শব্দ ওর গলা থেকে বেরিয়ে আসছে যা ডেরেক বুঝতে পারল না।

মার্থা ওদের বোটের ধারে দাঁড়িয়ে ডাকে, ডেরেক আমার হাতটা ধরো। আই মাস্ট গো টু হিম।

— খুব সাবধান মার্থা। বী ভেরি ভেরি কেয়ারফুল। আমি ধরছি তোমাকে। চিন্তা কোরো না। — নীল ইজ ওকে।

প্রায় ট্র্যাপিজের খেলার মতো দোদুল্যমান বোট থেকে মার্থাকে ঝাঁকিয়ে তুলে আনে ডেরেক। হাওয়ার দাপটে স্কার্ট যেন উড়ে যাবে। কোনোরকমে সামলে মার্থা নীলের কাছে গিয়ে হেলে-পড়া মাথাটা বুকের ওপর আঁকড়ে নরম স্বরে ডাকে, নীল! নীল! নীল, মাই লাভ! মাই ডার্লিং!

নীল মার্থাকে জড়িয়ে ধরে বলে, ফুলমা, দ্যাখো আমি এসেছি। আই হ্যাভ অ্যারাইভড। আর কখনো তোমাকে ছেড়ে যাব না। ফুলমা, আই উইল নেভার লিভ ইউ। বিলিভ মি। আই প্রমিজ। আই উইল নেভার লিভ।

মার্থা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে নীলকে আরো গাঢ় আশ্লেষে জড়িয়ে বলে, আই নো, নীল। আই বিলিভ ইউ।

ডেরেক 'হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু'র ইঞ্জিন চালু করে জেরি কে বলল, ফিরে চলো জেরি। স্টার্ট নাউ।

সমুদ্রের ওপর, আকাশ থেকে ঝরে-পড়া জলের শব্দে ক্যালিপসো সঙ্গীতের অনির্বচনীয় মূর্ছনা সঙ্গে নিয়ে দুটি বোট ছুটে চলল নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।

তৃতীয় পক্ষ

শচীন দাশ

আদিত্য আমাকে মোবাইলে ধরল। ধরেই জানাল, আমার সঙ্গে ওর দরকার। আর দরকারটা এতই জরুরি যে দেখা একবার না হলেই নয়। পারলে যেন আজই একবার চলে যাই। অথবা আদিত্য নিজেও আসতে পারে আমার অফিসে। কেননা কিছু আলোচনা আছে। প্রয়োজনে নাকি পরামর্শও নিতে পারে সে আমার কাছ থেকে।

আমি অবাক। আদিত্য বলে কী! সে নেবে আমার পরামর্শ! কিংবা আমি তাকে ওর ব্যাপারেই বলব যে, এটা ঠিক করছিস না তুই অথবা এটাই ঠিক তোর রাস্তা! ভাবতেই ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকল। আদিত্য কি তাহলে কোনো সমস্যায় পড়েছে! নাকি কোনো উটকো ঝামেলা!

এই সুযোগে বলি, আদিত্য আমার বন্ধু। কেবল বন্ধু বললে বোধহয় সবটা বলা হয় না, বরং বলাই ভালো, ছেলেবেলা থেকেই আমরা দু-জন পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ। আমরা দু-জনে একই জেলা শহরে একটি নদীর মুখোমুখি বড়ো হয়েছি। দু-জনে একই সঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়েছি। আর সে-সময়ে আদিত্য যদি সিগারেট ধরেছে তো আমাকেও তা ধরিয়ে ছেড়েছে। আদিত্য যদি প্রেম করেছে তো চেষ্টায় থেকেছে আমারও যাতে প্রেমিকা জোটে, তা বাদে পালায়—পার্বণে বলো, হই-হুজ্জুতি আর নেশাভাঙেই বলো, আমি কিন্তু চিরকালই আদিত্যর ছত্রছায়ায়। ছায়া হয়েই থেকেছি। তা সেই আদিত্যই কিনা নেবে আমার পরামর্শ? শুনে আমি যত না উজ্জীবিত তার চেয়েও বোধহয় বেশি চিন্তিত। চিন্তা, না অস্বস্তি? কেননা আদিত্য কখনোও কারো পরামর্শের ধার ধারেনি। কারো উপদেশের তোয়াক্কা করেনি। তা ছাড়া এই শহরে আমি এসেছি এই সেদিন, কিন্তু আদিত্য পা রেখেছে তারও আগে। আর এসেই গুছিয়ে-গাছিয়ে মোটামুটি দখল নিয়েছে সে-শহরটাকে। এ-হেন আদিত্য কিনা নেবে আমার পরামর্শ!

বাসে উঠতে যাচ্ছিলাম। মোবাইলটা পেয়ে আবার অন্য একটা বাস ধরে নিলাম। তারপর তাতে চেপেই মিনিট কুড়ির ভেতরে একসময় আদিত্যর অফিসের দোরগোড়ায়। এরপর লিফটে উঠে সোজা পাঁচতলা।

এসেছিস!

হ্যাঁ।

চল্ তাহলে—

হয়েছে কী বল্ তো?

বলতে বলতেই আড়চোখে একবার আদিত্যকে লক্ষ করি। কিন্তু আদিত্য বোধহয় টের পায় না সেটা। বোধহয় আজই আসছি জানিয়ে দেওয়ায় মনে মনে তৈরি হয়েছিল। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল।

বলব বলব। বলার জন্যই তো আসতে বলা—

তবে আর উঠছিস কেন! এখানেই বল্ না?

না, অফিসে নয়। অফিসে এসব হবে না।

তাহলে?

তাহলে কী, কলকাতায় কি জায়গার অভাব! পার্ক আছে রেস্তোরাঁ আছে মল আছে। কলকাতা তো এখন উন্নয়নমুখী—

পার্ক একটা বেছে নিয়েছিলাম। বসতেই আদিত্য একটা সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে প্যাকেট ও লাইটারটা আমার দিকে ঠেলে দিয়েই এক নিঃশ্বাসে অনেকটা ধোঁয়া ছাড়ল। এবং এরপরেই ওই সমস্যার কথা।

সমস্যা আসলে একটি মেয়েকে নিয়ে। আদিত্য মেয়েটিকে ভালোবাসে। এই শহরে এসে এক অপরাহ্ণবেলায় মেয়েটির সঙ্গে ওর পরিচয়। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা। তারপর প্রেম। প্রেমে আদিত্য আগেও পড়েছিল বার কয়েক। কিন্তু সেগুলো নিছকই ভালো লাগা। ভালো লাগায় ঘনিষ্ঠ যেমন হয়ে উঠেছিল তেমনি মোহ কাটায় দূরত্বও বেড়েছিল আবার। কিন্তু প্রেম এসেছে এই প্রথমই। এই প্রথমই আদিত্য অনুভব করেছে ভালো লাগার পরেও একটা সম্পর্কের জায়গা আছে। যে-জায়গায় রয়েছে রাগ-দুঃখ-ঈর্ষা-আনন্দ, মান-অভিমান আর বিশ্বাস। ফলে ভালোবাসতে আর দেরি হয়নি। হয়নি আরো একটা কারণে। মেয়েটিও এসেছিল এগিয়ে। আদিত্যর প্রেমে সাড়াও দিয়েছে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কিন্তু সমস্যা তবুও দাঁড়িয়েছে।

তা দাঁড়ালটা কোথায়?

আদিত্যর দিকে তাকিয়ে দেখি যেন বিড়বিড় করছে সে নিজের সঙ্গে। আশ্চর্য! আদিত্যকে এমন তো আমি দেখিনি কোনোদিন। কোনোদিন এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে অপেক্ষাও করেনি সে। সিদ্ধান্ত যা নেবার নিজেই নিয়েছে। মুখে যা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলেছে। কিন্তু এই শহরে এসে শহরটা যে এভাবে ওকে গিলে নেবে...

জানাল আদিত্য, সমস্যা আসলে অন্য একটি জায়গায়। মেয়েটি আরো একটি ছেলেকে ভালোবাসে।

মানে?

ওই মানেটাই তো ধরতে পারছি না আমি।

আদিত্য চুপ। একসময় আবার জানাল, আর সে-জন্যই তোর সঙ্গে আলোচনা। তোর পরামর্শ চাইতে ডেকে আনা। কী বলবি তুই?

কী বলব! একই সঙ্গে দু-জনকে। দুই পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক! কিন্তু বিশ্বাসের জায়গাটা তাহলে কার সঙ্গে!

ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে আবারও ফিরে আসছিলাম। কিন্তু ফিরলেও মনের মধ্যে সেই একই প্রশ্ন, বিশ্বাসের ভূমিটা তাহলে কোনদিকে?

এক বিকেলে ফিরছি, আদিত্যর সঙ্গে দেখি একটি মেয়ে। দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল।—এই যে সমু—।

দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কাছে এসে বলল, দাঁড়া, আগে পরিচয়টা করিয়ে দিই—

তারপরেই তার সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় হল। কথা হল। এবং হতেই আমাকে টেনে নিয়ে সবুজ এক ঘাসের দেশে।

আসুন, চলুন না আমাদের সঙ্গে। আরো কত কথা বলা যাবে।

এবং বলতে বলতেই তখন ময়দানে আদিত্য, অঙ্কিতা ও আমি। হাঁটছি ও হেঁটে যাচ্ছি। আর এভাবে হাঁটতে হাঁটতেই অবশেষে একসময় নদীরই ধারে। অঙ্কিতা তখন গুনগুন করছে। গলায় যেন সুর, কিন্তু আসি আসি করেও যেন আসছে না। শব্দেরা তাই যেন স্পর্শহীন, কথারা ধরারও বাইরে।

একী, এভাবে কী হয়?

কী! অঙ্কিতা চমকে উঠল।

আমি হাসলাম, শুধু গুনগুন করলেই হবে। শব্দ কোথায়, কথা কোথায়? শব্দের সঙ্গে কথা, আর কথার সঙ্গে সুর... এই দুই না হলে—

অঙ্কিতা যেন লজ্জাই পেল।

তখন আমি আবার বলে ফেলেছি, নাকি শোনার অধিকার কেবল আদিত্যরই। তাহলে থাক—

এস্মা, একী!

বলতে বলতে অঙ্কিতা যেন সরেই গেল একটু। আর ওই তখনই 'কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে...'

থেমে থেমে গাইছিল অঙ্কিতা। কিন্তু 'ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে'-র জায়গায় এসেই যেন গলাটা স্তব্ধ। আচমকা যেন সুরহারা হল সে।

আদিত্য এগিয়ে গেল, কী হল!

কিন্তু অঙ্কিতার মুখে কোনো কথা নেই। তবু বললাম, গলা কিন্তু অসাধারণ আপনার। কোথায় শিখছেন!

বলতে গিয়েও বলতে পারল না অঙ্কিতা। ঠোঁটজোড়াই শুধু থরথর করে কেঁপে উঠল।

বোধহয় লক্ষ করে থাকবে তা আদিত্য। বুঝতে পেরেই সে প্রসঙ্গ বদলাল, চল্ একটু চা খেয়ে আসি না হয়। এখানে একটা চমৎকার রেস্তোরাঁ আছে—

দিন দুই পর। এক দুপুরে অফিসের কাজে মুখ ডুবিয়ে আছি এই সময়েই মোবাইলে আদিত্য।

হ্যাঁ বল্—

কাল অঙ্কিতা কিন্তু গানটা আমাকে পুরো শুনিয়েছে। অথচ সেদিন যে কেন... বুঝতে পারলি কিছু?

কীসের!

অঙ্কিতাকে দেখে—

একদিনে কী বোঝা যায়! তা ছাড়া আর একজনকে দেখি।

সে কী করে দেখবি। তোর সামনে কি আর তাকে নিয়ে বেরোবে কোনোদিন?

তোর সামনে বেরিয়েছিল?

ধুত্—তা কি বেরোয়!

আদিত্যর কথার ধরনে আমি হেসে ফেলি, একবারে ধুত্ বলে উড়িয়ে দিচ্ছিস! কিন্তু যে প্রেমিকা তার দুই প্রেমিককে নিয়ে ভালোবাসার খেলায় নেমেছে সে কি আর সাধারণ প্রেমিকা—

তাহলে!

আদিত্য যেন মুহূর্তেই হতাশ। আমি বোঝালাম, প্রমাণ কর্ তুই ওকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসিস—

সে প্রমাণে বোধহয় আমি উত্তীর্ণ।

কী করে বুঝলি?

অঙ্কিতা আমাকে বিয়ের কথা বলছে।

তবে আর কী। তবে তো হয়েই গেল। তাহলে আর এত ভাবছিস কেন?

ভাবছি কী আর এমনি, গলার কাঁটাটা তো রয়েই গেল—

শনিবার। অফিস থেকে বেরিয়ে সবে মেট্রো স্টেশনে ঢুকেছি, দেখি প্ল্যাটফর্মের প্রায় মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে অঙ্কিতা। একমনে মুখ নামিয়ে কী ভাবছে। অঙ্কিতার পরনে দামি শাদা শিফন। কানে ও গলায় টেরাকোটার অলংকার। কাঁধের ব্যাগটির রং-ও শাদা।

একী আপনি! একেবারে উজালা-ব্র্যান্ড নিয়েই বেরিয়েছেন দেখছি—

মুখ তুলে আমাকে দেখেই চমকে উঠল অঙ্কিতা। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার সামলে নিল। অঙ্কিতার ঠোঁট জুড়ে তখন ফেনায়িত হাসি।

এদিকে কোথায়!

কোথায় কী, আমার তো অফিস এদিকেই। শোভাবাজার ব্রাঞ্চ—

কোন ব্যাঙ্ক!

নামটা বলেই জিজ্ঞেস করলাম, আপনি! বাড়ি কি এদিকেই?

হ্যাঁ, বিডন স্ট্রিট। থাকি উত্তরে, যাব একেবারে সেই দক্ষিণে—

আদিত্যমুখী হতে?

ধ্যাত্।

লজ্জা কি পেল একটু অঙ্কিতা? সাহস পেয়েই এগোলাম, তবে আমার বন্ধুটি কিন্তু এরই মধ্যে অঙ্কিতায় অঙ্কিত হয়ে রয়েছে—

আচ্ছা, আপনি কি কবিতার চর্চায় আছেন?

অ্যাভারেজ বাঙালির মতো চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি।

ট্রেন এসে পড়েছিল। উঠে সরতে সরতে এক জায়গায় সিট পেয়ে বসতে বলেছি একসময় অঙ্কিতাকে। এবং তারপর নিজেও।

তারপর, আপনি তো কালীঘাট, নাকি...?

মুচকি হেসে তাকাতেই আবারও বলি, তারপর অটো ধরে 'দক্ষিণী'—

সবই তো জানেন দেখছি।

হেসেই মাথা নাড়লাম, তা জানি। তবে আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে আমার। অনুমতি দিলে বলি—

এম্মা! অনুমতির আবার কী। বলুন না?

চোখ নাচিয়ে হাতের ব্যাগটা একটু সরিয়েই মুখ ফেরাল অঙ্কিতা। আর ওই তখনই 'সেন্ট্রাল' পার হয়ে 'চাঁদনি'-র দিকে পা বাড়িয়েছে পাতালযানটি।

গানটা কিন্তু পুরো শোনালেন না সেদিন। এমন ইনভলভ হতে শুরু করেছিলাম—

অঙ্কিতার মুখ দেখি নিমেষেই কালো একরকম। একসময় হাসল, কাল বিকেলে কী করছেন! একবার আসুন না। একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান আছে আমাদের।

বলে ঠিকানা ও ডিরেকশান দিল মুখেমুখে। এবং পরেই ব্যাগ খুলে একটা ওয়েট মেজারের টিকিট। একটা পেন দিয়ে কোনোরকমে এরপর বাড়ির নাম্বারটা।

প্লিজ আসুন—

হাতে নিয়ে দেখি বাহান্ন কেজি। এবং 'সুন্দরী হইতে সাবধান।'

কী, আসছেন তো! ঠিক পাঁচটায়—

ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আদিত্য থাকবে?

কেন, আদিত্য না থাকলে আসবেন না?

না না, তা নয়—

তবে!

দরজা খুলে বন্ধ হওয়ার মুখেই আবার শব্দেরা হারিয়ে গেল। আর তারপরেই কখন যে একসময় কালীঘাট।

উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নামার মুখেই আবারও মনে করিয়ে দিল।

কাল বিকেল পাঁচটায়। তাহলে আসছেন কিন্তু—

তা খুঁজে খুঁজে পরের দিনই একসময় সেই ঠিকানায়। অঙ্কিতা দেখতে পেয়েই এগিয়ে এল, আসুন আসুন—

ভেতরে গেছি। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কাকে ডেকে আনল অঙ্কিতা।

এই যে সুপ্রিয়, এই সোমেন। সৌম্যব্রত। কাল যার কথা বলছিলাম—

আসুন আসুন। করজোড়ে পরিচয়ের পরেই ফরাস বিছানো একটি সুগন্ধি ঘর। এবং সেখানে জনা পঁচিশের একটি সমাগম। সামনে তানপুরা, হার্মোনিয়াম ও তবলা। তারই সামনে বৃহদাকার এক পেতলের ভাসে গুচ্ছ রজনীগন্ধা। হাওয়ায় ঘ্রাণ উড়ছে সমানে। এবং উড়তে উড়তে কখন যে বাতাসে 'আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসবে যদি শূন্য হাতে—'

সুপ্রিয়ই ধরেছে প্রথমে। কী ভরাট গলা, কী গভীর আবেগ। আর সে আবেগে নিঃস্ব হতে হতে হঠাৎই কখন 'বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে...'

তানপুরা ছেড়ে হার্মোনিয়ামে হাত রেখে এবারে গলা তুলেছে অঙ্কিতা। আর তানপুরাটা কোলে তুলে তারই তারে সুপ্রিয়র আঙুল। সুপ্রিয় কি চোখ বুজল? নাকি অঙ্কিতা! অঙ্কিতার কণ্ঠে কথা যেন জাদু হয়ে ঘরেরই বাতাসে ঘুরে মরছে। অবশেষে বুঝি মুক্তি পেয়েই উড়ল।

'কোথা হতে সমীরণ আনে নব জাগরণ,/পরাণের আবরণ মোচন করে॥' স্তব্ধ হয়েই বসেছিলাম, হঠাৎই এরপর 'কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে ...'। অঙ্কিতা কি চোখ খুলবে এবারে? খুললও যেন এই গানটিতে এসে।

কৌতূহলেই তাকিয়েছিলাম। আচমকা 'ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে'-র জায়গাটায় এসেই গলাটা কেমন আটকে গেল। ফলে 'সেই কথাটি তোমার যাব বলে' আর বলা হল না। এবং না-হতেই সুপ্রিয় অবাক। তবলচির তাল কাটল এবং থমকে গেল অনেকেই। শুধু আমিই যা চুপচাপ।

জল দেবো?

আমার ফ্লাস্কে কিন্তু গরম চা আছে—

কিন্তু চা বা জল না-নিয়েই হঠাৎ করেই উঠল অঙ্কিতা। তারপর প্রায় দৌড়ে সে পাশের ঘরে।

দিন গেল মাস কাটল।

একদিন অফিসে ব্যস্ত এই সময়েই এক ভদ্রলোক। পাশে অঙ্কিতা।

আরে, কী খবর! দেখতে পেয়ে মুখ তুলতেই অঙ্কিতা একটু হাসল।

আমার বাবা—

বলে বাবার দিকে তাকিয়ে 'এই যে সৌম্যব্রত' বলেই আবার আমার দিকে মুখ রেখেছে ততক্ষণে— বাবা একবার একটু কথা বলবে আপনার সঙ্গে। অফিসিয়াল ব্যাপার—

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বসুন না—

বসে প্রায় সমস্তটাই শুনে কাগজপত্র যা আছে সবই দিয়ে যেতে বললাম। বলেই জানালাম— ঠিক আছে অসুবিধে নেই। ডিসপিউটটা আমি ঠিক করে দেবো।

তা তো হল। অঙ্কিতার বাবার গলায় কৃতজ্ঞতা।— কাছেই তো আমার বাড়ি। একদিন আসুন না—

আসতে পারি কিন্তু একটা শর্তে। আমি গম্ভীর।

কী! অঙ্কিতা ও তার বাবার মুখে দেখি একটা চাপা অস্বস্তি।

বললাম, আমাকে 'আপনি' বলাটা ছাড়তে হবে—

ও এই কথা। আচ্ছা আচ্ছা নিশ্চয়ই।

বলতে গিয়ে একটু জোরের সঙ্গেই হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপরেই তিনি মেয়ের সঙ্গে।

রাতে বিছানায় কাত হয়ে মায়ের চিঠির উত্তর দিচ্ছি এই সময়েই মোবাইলটা বেজে উঠল। প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরিচয় দিতেই লজ্জা পেয়ে গেলাম। তখন সুপ্রিয় বলছে আমাকে, আপনার ব্যাপার কী বলুন তো! সেই যে গেলেন—

হ্যাঁ—মানে ওই... যাওয়া হচ্ছে না আর কি।

তা তো বুঝলাম। এদিকে আপনার সঙ্গে যে একটু দরকার আছে আমার—

তাহলে চলে আসুন।

কোথায় আসব!

যেখানে খুশি। অফিস কিংবা বাড়ি। বললে কোথাও দাঁড়াতেও পারি।

না না, রাস্তায় আপনাকে দাঁড় করাতে চাই না। তার চেয়ে যদি আপনার অফিসে চলে যাই। এই ধরুন বিকেলের দিকে—

ফাইন। আসুন না। অসুবিধের কী। ভালো চা হয়তো খাওয়াতে পারব না কিন্তু গরম সিঙারা তো আনাতে পারব। চলে আসুন।

এবং আসতেই প্রথমে সেদিনের কথাটা। তারপর একসময় অঙ্কিতার প্রসঙ্গ। বলতে বলতেই জানাল, জানেন, পরে একদিন অঙ্কিতা আমাকে ওই গানটা পুরো শোনাল। অথচ সেদিন যে কেন...

চমকে উঠেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আদিত্যর কথাটা। আদিত্যও যেন এমনই বলেছিল না অঙ্কিতার হয়ে!

বললাম, হতে পারে। হয়তো গলা কাজ করছিল না—

না না, সেসব কিছু নয় বুঝলেন—

তবে!

সেটাই তো ধরতে পারছি না। কিন্তু অঙ্কিতা খুব আক্ষেপ করছিল। গানটা আপনাকে পুরো শোনাতে পারল না। এর আগেও নাকি একদিন পারেনি শোনাতে?

সতর্ক হয়েই তাকিয়েছিলাম। একসময় সাবধানেই জিজ্ঞেস করলাম, একটা কথা খুবই জানতে ইচ্ছে করছে। জানি না জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে কিনা—

আরে না না। সুপ্রিয় হঠাৎই মাত্রাতিরিক্ত উদার, আপনি জানতে চাইছেন... বলুন না কী বলবেন?

আপনি অঙ্কিতাকে ভালোবাসেন, তাই না?

সুপ্রিয় চুপ। তারপর অল্প করে সে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

আর অঙ্কিতা?

আমরা দু-জন দু-জনকেই।

বলব না বলব না করেও বলে ফেললাম, তা বিয়েটা করছেন কবে?

সুপ্রিয় হাসল, প্রোপোজ তো করেছি—

ফাইন। তাহলে কবে ঘটছে ঘটনাটা। দেখবেন, শেষে আবার মিস না করি—

না মিস কেন করবেন। আপনি তো দু-তরফেই...

বলতে গিয়েই সুপ্রিয় হঠাৎই নিষ্প্রভ একসময়। একটু চুপ করে থেকে পরেই সে চোখ তুলেছে সামান্য।

তবে—

তবে? চোখ তুলতেই মনে আমার সন্দেহ। সুপ্রিয় কি কিছু বলতে চায়। বললাম, হ্যাঁ বলুন—

আচ্ছা, অঙ্কিতার জীবনে কি আর কেউ আছে?

মানে! আমি চমকে উঠলাম। ঠিক যেন আদিত্যরই কথার প্রতিরূপ। আদিত্য ঠিক এই কথাটাই না বলেছিল আমাকে! সন্তর্পণে আড়চোখে তাকাতে গিয়েই লক্ষ করি, সুপ্রিয়র ভেতরে একটা অস্থিরতা।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন এ-কথা হঠাৎ মনে হল কেন?

হল নয়। হচ্ছে ক-দিন ধরে। অঙ্কিতা বোধহয়...

মাথা নাড়লাম, কী জানি, এসব তো জানি না। জানার কথাও নয়। তবে কথাটা পরিষ্কার করে অঙ্কিতাকে জিজ্ঞেস করলেই হয়!

এ-কথা কি জিজ্ঞেস করা যায়?

যায় না—!

না না, অনুভবে বুঝতে হয়—

তা আপনি কি পারছেন?

মনে হচ্ছে। আর সে কারণেই আপনাকে জিজ্ঞেস করা। যদি জানেন—

কাজে থাকি। অফিস করি। করেই আবার কখনো কখনো এদিক-ওদিক। কখনো বা আবার বাড়িতে চিঠি লেখা। বাড়ির খবরাখবর নেওয়া। মা লিখেছে, এবারে গরম অত্যধিক। এত যে, ঘরের পাশে আত্রেয়ী নদীতেও জল নেই তেমন। লোকে হেঁটে পারাপার করছে। তা বাদে অন্য আর খবর সব একরকম। লিখতে লিখতে শেষে জানতে চেয়েছে, কবে যাচ্ছি আমি। যাচ্ছি জানিয়ে চিঠি লিখে আবারও সেই আগের মতো। এদিক-ওদিক। অফিস ও ঘর। ঘর ও অফিস। এবং তারই মাঝেমধ্যে আদিত্য ও সুপ্রিয়। সুপ্রিয় ও আদিত্য। আর এদেরই পাশাপাশি অঙ্কিতা ও অঙ্কিতার বাবা কখনো কখনো।

এক বিকেলে ফিরেছি, আদিত্য এল ঝড়ের মতো।

এখন আমি কনফার্মড। অঙ্কিতা অন্য একজনকে ভালোবাসে—

কী করে বুঝলি?

অঙ্কিতার চোখ দেখে।

তাহলে বলছিস না কেন?

ভালোবাসলে কি আর এসব বলা যায়? শুধু সন্দেহেই মন পোড়ে।

কিন্তু পুড়ছে তো। এখন কী করবি?

করব কী, তাই তো জানতে এলাম—

ওই যা। আমি কী করে বলব! আমি তো প্রেমেই পড়িনি।

মুখ শুকনো করে আদিত্য বেরিয়ে গেল। আর আদিত্য বেরোতেই এক দুপুরে আবার সুপ্রিয়।

এবারে শিয়োর হয়ে গেলাম। অঙ্কিতার জীবনে অন্য এক পুরুষ এসেছে—

কীভাবে বুঝলেন?

যেভাবে বোঝা যায়। চোখের গভীরে তাকিয়ে।

তাহলে বলছেন না কেন?

কাকে বলব! বললে তো ছোটো হতে হয়। প্রেমিক কী কখনো ছোটো হতে পারে? সে তো বিষণ্ণ রাজার মতো—

তাহলে? কী করবেন!

কী করি বলুন তো?

এই দ্যাখো, আমি কী করে বলি! আমি কী কাউকে ভালোবেসেছি?

সুপ্রিয় চুপ। মুখ কালো করে উঠল এরপর। আর উঠেই একসময় বেরিয়ে গেল।

এবং উঠতেই এই প্রথম অঙ্কিতা। সরাসরি এক সকালে আমার বাড়িতে।

একী আপনি?

কেন আসতে নেই! নাকি এসে অন্যায় করেছি?

কেন, অন্যায় কেন! আমি কী তাই বলেছি—!

অঙ্কিতা চুপ। ঘরে ঢুকে এপাশে-ওপাশে তাকাতে তাকাতে বইয়ের কাছে। যেন তাতে হাত রেখেই বলবে, ইস এত বই?

বলল অঙ্কিতা, এত বই পড়েন কখন!

সব বই কি একসঙ্গে পড়ে সবাই? পড়তে পড়তেই জমে যায়!

অঙ্কিতা বই টানে একটা। এরপর পাতা ওলটায়। এবং পাতার গভীরেই চোখ কখন।

বাহ্, কী সুন্দর কথা! 'হাওয়া যেখানে নেই সেখানে শব্দ হয় না, জ্বালালেও আগুন ধরে না, আলো যেখানে নেই, রূপ সেখানে থেকেও নেই, তেমনি মন যেখানে নেই কথা সেখানে থেকেও নেই'... এত ভালো ভালো কথা থাকতে মানুষ এত খারাপ হয়ে যায় কেন বলুন তো? কেন এত সন্দেহ করে!

ভালো কথাগুলোর সন্ধান পায় না বলে—

যাক গে, শুনুন। বাবা একবার যেতে বলেছে আপনাকে। আমরা বোলপুরে যাচ্ছি। ক-দিনের জন্য—

বোলপুর! মানে শান্তিনিকেতন? বাহ্, দারুণ তো—

দারুণ কেন?

বা রে, অমন আকাশ অমন বাতাস... দাঁড়ালেই তো মনে ওখানে বিশ্বাস আসে। বেঁচে থাকার ইচ্ছে জাগে—

তাহলে যাবেন?

তা যেতে পারি। কিন্তু আমি গেলেই তো আবার সঙ্গে আদিত্য। আমি গেলেই তো আবার সঙ্গে সুপ্রিয়।

অঙ্কিতা চুপ। মনে মনে কী ভয়ে কেঁপে উঠল?

কিন্তু কাঁপলেও বোঝা গেল না ঠিক। তখন আমি ধরেছি আদিত্যকে, তোর কথাই ঠিক। অঙ্কিতাকে আরো একজন ভালোবাসে—

কে সে! আদিত্য উত্তেজিত।

বলব পরে। তবে তার জন্য বাইরে যেতে হবে। বোলপুর—

বোলপুরে তো অঙ্কিতা যাচ্ছে।

তুইও যাবি।

এবং এরপরেই সুপ্রিয়। আপনার কথাই ঠিক। বলেছি আমি।

কী ঠিক? সুপ্রিয় অবাক।

অঙ্কিতার জীবনে আরো একজন অপেক্ষা করছে।

কে সে? সুপ্রিয় বিমর্ষ হঠাৎই!

জানালাম, পরে বলব। তবে আপাতত বোলপুরে যেতে হবে—

বোলপুরে তো অঙ্কিতারা...

আপনিও যাবেন।

অগত্যা এক দুপরে বোলপুর। কিন্তু আলাদা আলাদা। তিনজনেই তিনদিকে। আদিত্য, সুপ্রিয় ও আমি। এবং কথামতো ওখানে নেমেই ধরেছি দু-জনকে। আদিত্যকে বলেছি, আজ বিকেলে আসিস আদিত্য। উত্তরায়ণের সামনে। ওখানে এলেই দেখাব তোকে—

কী!

তোরই প্রতিদ্বন্দ্বীকে—

এবং জানালাম সুপ্রিয়কে, আজ বিকেলে আসবেন কিন্তু। ঠিক পাঁচটায়। খোয়াইয়ের সামনে। আর তারপর...

অগত্যা আদিত্য, আমি ও সুপ্রিয়। বলাবাহুল্য অঙ্কিতাও এসেছিল। আমিই আসতে বলেছিলাম। ফলে অঙ্কিতাকে দেখেই আদিত্য ছুটে গেল। সুপ্রিয়ও গিয়ে পাশে দাঁড়াল। আর ওই তখনই দু-জন দু-জনের মুখোমুখি।

আপনি?

সুপ্রিয় সেনগুপ্ত। আপনি?

আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু আপনি কি...

বলার আগেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে সুপ্রিয়, আচ্ছা আপনি বোধহয়...

এবং দ্বৈরথ শুরু হওয়ার আগেই বিকেল ঘন হল। তারপর যেন বেলা পড়ল ও আকাশে আলোর খেলা।

খেলা দেখতে দেখতেই হারিয়ে যাচ্ছিলাম। এই সময়েই অঙ্কিতা — আজ আমার যে কী গাইতে ইচ্ছে করছে—

আর আমার শুনতে। এই আকাশে এমন জাদু আছে।

অঙ্কিতা গান ধরল। 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে...'

আকাশের দিকে তাকাতেই হঠাৎই আবার গান পালটে গেল অঙ্কিতার। আর পালটাতেই আমি চমকে উঠি। সেই গানটা না? অঙ্কিতা গুনগুন করছে। আর গুনগুন করতে করতেই গলা খুলল এবারে — 'কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে...'

না না অঙ্কিতা, এ গান কেন! এ-গানটায় তোমার...

অঙ্কিতার কানে যায় না সে কথা। কী এক আবেশে সে গলা তুলেছে ততক্ষণে — 'যে কথাটি বলব তোমায় ব'লে / কাটল জীবন নীরব চোখের জলে...'

থাক। থাক অঙ্কিতা, এখানেই থাক না—

কিন্তু কে কার কথা শোনে। অঙ্কিতার গলায় যেন তখন সুরেরই হোমানল। কথায় ও সুরে যেন জীবন উঠল জ্বলে। ফলে কাঁপল না গলা, হারাল না সুর। এবং সেই সুরেরই মায়ায় যেন একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছিল অঙ্কিতা। তখন আকাশে চাঁদ। জ্যোৎস্না উঠল আকাশ আলো করে। এবং উঠতে না উঠতেই যেন নেমে এল খোয়াইয়ের বুকে।

অঙ্কিতা, সন্ধে হয়ে গেছে। চলো এবারে ফেরা যাক —

কিন্তু বলতে গিয়েও যেন পারি না বলতে। অঙ্কিতার গলায় তখন নতুন কথা ও নতুন সুর। গানে গানে যেন নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে।

আমি চুপ। শুনতে গিয়েও মাঝে মাঝে থমকে যাচ্ছি এক দ্বৈরথের শব্দে। দূরে খোয়াইয়ের বুকে কোথাও ততক্ষণে শুরু হয়েছে এক সম্মুখ সমর। এবং তাতে দুই রথী। বুঝি এই জ্যোৎস্না আর এমন আলোয় আগুনই জ্বলে উঠেছে তাদের বুকে। সুরের মায়া আর সেখানে পৌঁছোয়নি। পৌঁছোলে অন্তত কেউ না কেউ ছুটে আসত অঙ্কিতার কাছে। আর এলেই তার বুকের ভেতরের সেই গোপন পদ্মটি...

খসে পড়া পালকের মতো

চিত্ররথ দত্ত

প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে বাস থেকে নেমে কুমার লক্ষ করল ধুতির নীচের দিকে খানিকটা কাদা। রীতিমতো বিরক্ত বোধ করল। কী করে কোথায় লাগল! প্যান্টে একটু-আধটু কাদা লাগলে মোটেই তেমন চোখে লাগে না। সবসময় প্রায় প্যান্ট পরাটাই অভ্যেস। তবু মাঝে মাঝে কোনো উপলক্ষে মনে হয় ধুতিটাই বেশি যথাযথ ও মানানসই হবে। খুব যে জোরদার যুক্তি আছে তা নয়। তবে বেশভূষাও মাঝে মাঝে পরিবর্তন চায়। কিন্তু লাগল কী করে! কোনো কাদাজলে তো হাঁটেনি। আজ বেলার দিকে অবশ্য বৃষ্টি হয়েছিল খানিকটা। রাস্তার ভাঙাচোরায় এখানে-ওখানে কিছু কিছু কাদাজল জমে আছে এখনো। কলকাতার রাস্তায় ধুলোময়লা আর কাদা ছাড়া অদ্যাবধি আর কিছু দেখেনি কুমার। অল্প বয়েসের রোমান্টিকতায় শহরটার কোনো শ্রীহীনতাই নজরে আসত না। রোমান্টিক অনুভূতিময় এক বিচিত্র অন্ধত্ব! কুমারের মনে হল বাসেই সম্ভবত জলকাদা মাড়িয়ে আসা কোনো সহযাত্রী লাগিয়েছে এটা। রাস্তা পার হবার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কুমার এদিক-ওদিক তাকাল। কত বছর বাদে ঠিক হিসেব নেই। বিশ্ববিদ্যালয় আর কফি হাউসের পাট চুকোবার পর আর বিশেষ এমুখো হয়নি। প্রয়োজনও পড়ে না তেমন। বিশেষ কোনো উপলক্ষ ছাড়া এখানে আর কীসের শখ! চারপাশ আকণ্ঠ ডুবে আছে বইয়ের দোকান আর মানুষের ভিড়ে। ফুটপাথ কাকে বলে! রাস্তাটা পেরিয়ে এসে কুমার দেখল কফি হাউসের প্রবেশটা যেন খুঁজেই পাওয়া যায় না। কারা সকাল-বিকেল বসে এখন কফি হাউসে? কীরকম ভাষা আর ভঙ্গিতে আড্ডা দেয়? দেখলে হয় একদিন। অনেক আগের কয়েকটা দিনের কথা খুব সহজে মনে পড়ে গেল কুমারের। প্রেসিডেন্সির এই গেটের সামনেই বাস থেকে নামতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে ধুতিটা একটু ছিঁড়ে গিয়েছিল। ফুটপাথে উঠে ঝুঁকে পড়ে ধুতিটাকে ঠিক করতে করতে কুমারের মনে হয়েছিল, একবার পরে, খুলে রাখা ধুতি দ্বিতীয়বার আর কিছুতেই মনের মতো পরা যায় না। গত সপ্তাহে বিয়েবাড়ি থেকে ফিরে খুলে রাখা ধুতিটা মা-র আলনা থেকে খুঁজে এনে পরেছিল। সেদিন অবশ্য না পরলেও চলত। তবু মনে হয়েছিল একজন বিশিষ্ট কবির বাড়ি যাওয়ার পক্ষে সেটাই বোধহয় বেশি শোভন ও যথাযথ হবে। তখনো তো ধুতি বস্তুটা এরকম বিলীন হয়ে যায়নি। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় তার মর্যাদার ভাবনাটা মাঝে মাঝে মাথায় এসেই পড়ত। তখনকার মতো জরুরি ভাবনায় ছিল, দু-চার দিনের মধ্যে নামীদের লেখাগুলো অচিরে পাওয়ার প্রতিশ্রুতিটুকু অন্তত আদায় করতে না পারলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। উৎসাহ আর পরিকল্পনা দুটোই হয়তো মজেও যাবে অনেকটা। কেন যে হঠাৎ খেয়ালটা চাপল! পত্র-পত্রিকা প্রকাশের উদ্‌যোগ নিয়ে বসন্ত কেবিন আর কফি হাউসে বসে চেনা-অচেনা অন্যান্যদের কত সমালোচনা করেছে। এমনকী বেশি পরিচিতদের সামনাসামনি ঠাট্টা করতেও ছাড়েনি।

কুমার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পুরনো বইয়ের দোকান থেকে সরে-আসা মেয়েটিকে দেখেছিল। রাস্তা পার হবার জন্যে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। এরকমই হয়। রাস্তা পার হওয়ার জন্যে সব

সময়ই মানুষ দু-একজন সঙ্গী খোঁজে। দূরত্বের মধ্যেও এক ধরনের নীরব নির্ভরতা। দু-জনেই একা, তবু তো পাশাপাশি দু-জনে। উদ্ধত, অমনোযোগী দ্রুত ধাবমান গাড়ির পথের ধারে শঙ্কিত দাঁড়িয়ে পাশের জনকেই মনে হয় সব চেয়ে চেনা, কাছের।

কাছাকাছি, সহজ দাঁড়ানো মেয়েটিকে চেনা চেনা লেগেছিল। একটু ফাঁক পেয়ে কুমারের চেয়ে অনেক দ্রুত রাস্তা পেরোতে লাগল মেয়েটি। চোখে পড়ার মতো দীর্ঘ বেণী সুডৌল রমণীয় নিতম্বের ওপর দোল খাচ্ছে। কুমারের চট করে মনে পড়ে গেল সেদিন সুভদ্র ওর সদা-অনুসন্ধানী ও আত্মবিশ্বাসী ঝোঁকে উচ্ছ্বসিত হয়ে যে মেয়েদুটিকে দেখিয়েছিল এ তাদেরই একজন।

দেয়ালের ধারে একটা খালি টেবিলে বসে সেদিনের প্রুফগুলো দ্রুত দেখে নিচ্ছিল কুমার। কেউ আসার আগেই যতটা সম্ভব দেখে নিতে পারলে ভালো। হইচইয়ে প্রুফ দেখা যায় না। আর সুভদ্রকে দিয়ে এ-কাজটা হবার নয়। কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই প্রুফ দেখায় ইতি টানতে হয়েছিল কুমারের। আচমকা সুভদ্র এসে প্রবল এক চাপা উত্তেজনায় বলেছিল, শিগ্‌গির এদিকে আয়।

কুমার বলেছিল, এখানেই বোস্ না, পাখা আছে। চট করে প্রুফগুলো দেখে নিই।

সুভদ্র অর্থপূর্ণ হাসি মেশা তৎপরতায় প্রুফ দেখা চুলোয় দিয়ে কুমারকে উঠিয়ে নিয়েছিল। দু-একটা বই ও ঢাকা-দেওয়া কফির কাপে অধিকার বজায়-রাখা একটা খালি টেবিলে কুমারকে এনে বসিয়ে পাশের টেবিলে হাসি-গল্পে সজীব দু-টি মেয়েকে দেখিয়ে নিচু গলায় বলেছিল, কম্পোজিশনটা দ্যাখ্। আমি তো তখন থেকে এদের দেখেই কী দারুণ সময় কাটিয়ে দিচ্ছি।

এই কাণ্ডকারখানায় অবাক হয়ে কুমার বলেছিল, কখন এসেছিস তুই, দেখতে পেলাম না তো!

সুভদ্র ভুরু নাচিয়েছিল। — দেখবি কী করে, আমি তো অদৃশ্য হয়ে ছিলাম আনডিস্টার্বড এদের দেখব বলে। আজ 'কান্ট'-এর ওপর স্পেশাল ক্লাসটা তো করলামই না। 'কান্ট' বোঝা কি এদের থেকে জরুরি? সব অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা হয়ে গেছে, একেবারে নিখুঁত।

দুটি ঝকঝকে, সুবেশ শরীরী ভঙ্গি থেকে রমণীয় উষ্ণতা ঝরে পড়ছে। একজনকে সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে, অন্যজনকে খানিকটা পেছন থেকে। কথার চেয়ে হাসির উচ্ছলতার প্রকাশ বেশি। আত্মবিশ্বাসী কৌতুকের অনাবিল প্রকাশ। মুখোমুখি মেয়েটির হাসিতে দাঁতের সারি দামি পাথর-সেটিং গয়নার মতো ঝলমল করছে। বড়ো গলার ঘেরে শাদা ফ্রিল বসানো হালকা সবুজ জামার পাশ থেকে গোলাপি আভা ভরাট বুকের ঢেউ, হাসির উচ্ছলতায় ফুলে ফুলে উঠছে। হাসতে হাসতে মেয়েটি আঁচলটা গায়ে সাবধানে জড়িয়ে নিল। তারপর সামনে রাখা জলের গেলাসটা উঠিয়ে হাসির ফাঁকে ফাঁকে ছোটো ছোটো চুমুকে জল খেতে লাগল।

পেছনফেরা মেয়েটি সম্পূর্ণ সামনে ঝুঁকে রয়েছে। শরীরটাকে নিয়ে গেছে চেয়ারের একেবারে প্রান্তে। সামনের প্রান্তিক সেই চাপে চেয়ারের পেছনের পা-দুটো শূন্যে উঠে রয়েছে খানিকটা। একটা কনুইয়ে টেবিলে দৃঢ় ভর, অন্য হাতটা খেলা করছে বন্ধুর চুড়িতে। ছোটো জামা টানটান হয়ে আরো খানিকটা উঠে গিয়ে কোমর থেকে মাঝামাঝি পিঠ একেবারে মসৃণ ত্বক-সর্বস্ব হয়ে

খুলে আছে। আর মেদহীন কোমরের বাঁক থেকে নিতম্বের ঢেউ দু-পাশে ছড়িয়ে আছে অপূর্ব এক বঙ্কিম রেখায়। হাসি ভরা কথায় নিমগ্ন থেকে একটু একটু দোল খাচ্ছে মেয়েটি।

দৃশ্যটা দারুণ ভালো লাগলেও স্বস্তিও কম ছিল না কুমারের। অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিল এটা অনুমান করে যে, ওদের এই অতি-আগ্রহী অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে অসভ্যের মতো কাছে এসে বসাটা মেয়ে দুটির অগোচরে রয়ে গেছে। না হলে ওই উচ্ছল একাগ্র ভঙ্গিতে নিশ্চয়ই কিছুটা ছেদ পড়ত। কুমার একটু হতাশও হয়েছিল মুখোমুখি মেয়েটি একবারও চোখ তুলে না তাকানোয়। মেয়েরা এত না তাকিয়ে থাকতে পারে!

দ্রুত রাস্তা পার হয়ে যাওয়া সুদীর্ঘ বেণীর মেয়েটিকে দেখতে দেখতে ভেবেছিল আজও সেই পেছন থেকেই...! চটপট পাশে পাশে রাস্তা পার হলেই হত।

নীচের সিগারেটের দোকান থেকে একটা প্যাকেট কিনে অলস মন্থরে সিঁড়ি বেয়ে কফি হাউসে উঠে এল কুমার। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর স্তম্ভিত আবিষ্কার করল দরজার মুখে পার্টিশন-এর আড়ালে জনা চারেক মেয়ে পরিবৃত সুভদ্র হাসিগল্প আর সিগারেটের ধোঁয়ায় এক রহস্য আবেশে নিজেকে ভরিয়ে রেখেছে। সেদিনকার মৃদু চুমুকে জল-খাওয়া, উজ্জ্বল-দাঁতের-হাসি মেয়েটি তো আছেই, এমনকী এইমাত্র দোলানো বেণীর রাস্তা-পার-হওয়া মেয়েটিও এসে বসেছে।

বিস্মিত স্থাণুবৎ কুমার ভেবেছিল কী যাদুকাঠি লুকোনো থাকে সুভদ্রর পকেটে! ওর এই অদম্য সপ্রতিভতা অনবরত শঙ্কিত করে এসেছে কুমারকে। অথবা কে জানে, মেয়েরা হয়তো নিজেদের আড়াল ভাঙার জন্যে এরকম বিপজ্জনক সপ্রতিভতাকেই সব চেয়ে বেশি করে চায়।

প্রবল উৎসাহে সুভদ্র বলল, একটা চেয়ার নিয়ে আয়।

থতমত কুমার বলেছিল, যাবি না? সুভদ্র বলল, একটু বোস্, কফিটা খেয়ে নিই। তুইও তো একটা খাবি।

এত কাছ থেকে চারজন সুবেশা, বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল, ঝকঝক মেয়ে একজোটে পূর্ণ কৌতূহলে কুমারকে দেখেছে এই অসম্ভব অভিজ্ঞতা কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় অসহায়ভাবে কুমার তাই ভেবেছিল।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপর একটা চেয়ারে রাখা, যার যার ব্যাগ আর বইগুলো দ্রুত উঠিয়ে নিয়ে সবাই নড়েচড়ে বসে বলল, বসুন বসুন, চেয়ার আনতে হবে না।

কুমার সংকুচিত বসে পড়ে বিচিত্র অনুভূতিতে তাকিয়েছিল সেই পছন্দের চেনা দু-জনের মাঝখানে। বাঁ-পাশে আন্দোলিত বেণীর সুদেষ্ণা বলল, এক্ষুনি আপনি প্রেসিডেন্সির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন না?—ঝুঁকে পড়ে ধুতি ঠিক করছিলেন।

কুমার মাথা নাড়ল। — আর আপনি তো বোধহয় পুরনো বই দেখছিলেন?

ডানপাশ থেকে সেই সুন্দর-হাসির অলকানন্দা বলল, বাঃ, একেবারে গোয়েন্দাসুলভ সজাগ দৃষ্টি দু-জনের!

একটু অস্বস্তিতে হাসল কুমার। বলল— আপনাদের প্রায়ই কফি হাউসে দেখি, চেহারাগুলো চেনা তাই নজরে পড়ে যায়।

সুদেষ্ণা তেরছা তাকিয়ে বলল, কতটা চেনা লাগে?

আমতা আমতা করে কুমার বলেছিল, অনেকটাই বলতে পারেন। এবার তো আরো চিনব।

সুদেষ্ণা চোখ ঘুরিয়ে হেসেছিল,— যাক, বেশ আশ্বস্ত হলাম।

সুভদ্র হতাশ ভঙ্গি করে বলল, এমনই দুর্ভাগ্য, এখানে এত আসা-যাওয়া করি, কিন্তু কক্ষনো কারো নজরে পড়ি না। সুদেষ্ণার সঙ্গে কৌতুক-দৃষ্টি বিনিময় করে অলকানন্দা বলেছিল, আপনার এই হতাশা যে আদৌ ঠিক নয় বলব সেটা? সেদিন আপনারা আমাদের পাশের টেবিলে বসেছিলেন। প্রথমে একাই ছিলেন বেশ। পরে কুমারকে ধরে আনলেন অন্য টেবিল থেকে। দেখুন, কীরকম নজর করেছি।

অলকানন্দা আর সুদেষ্ণা প্রবল হাসতে লাগল। অন্য দু-জন, অতসী আর ছন্দা অবাক হয়ে বলল, এত হাসছিস কেন!

অসহায় সুভদ্র যতটা সম্ভব গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করে বলল, আমি বলছি কারণটা। সেদিন অনেকক্ষণ একা একা বসে বোর্ড হবার পর ওঁদের দেখে সময় কাটাব বলে পাশের টেবিলটায় গিয়ে বসেছিলাম। দু-জনকেই এমন দারুণ দেখতে লাগছিল যে লোভ সামলাতে পারিনি। মন-মেজাজ একেবারে ভালো হয়ে গেল।

অতসী মুখে রুমাল চাপা দিয়ে প্রবল হাসিকে সামাল দিতে দিতে বলল, আপনি যে কীরকমভাবে বলেন না!

জড়তা মেশানো গলায় কুমার বলল, কী করে বুঝলেন! একবারও তো তাকাননি। বরং কীসব মজার কথায় নিজেদের মধ্যে একেবারে মশগুল ছিলেন।

অলকানন্দা কফির কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে মুচকি হেসেছিল,— আপনারা যে আমাদের দেখার জন্যে একেবারে চুক্তি করে অন্য টেবিল থেকে উঠে এসে কাছে বসলেন, সুদেষ্ণার সঙ্গে সেটাই রসিয়ে আলোচনা করছিলাম।

চারজন মেয়ের প্রবল হাসির মধ্যে সুভদ্র ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। আর কুমারের মনে হল ধরণী দ্বিধা হও।

সুদেষ্ণা বলল, নন্দাকে দেখে সবাই মুগ্ধ হয়, সুতরাং ওতে ওর নিশ্চয়ই তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি দারুণ খুশি হয়েছিলাম।

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। অলকানন্দা একটা কফি বানিয়ে কুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, সেদিন আমি অবশ্যই ফ্ল্যাটার্ড হয়েছিলাম। আজ আরো বেশি খুশি হলাম আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

সেদিন বিশিষ্ট সেই কবির বাড়ি আর যাওয়া হয়নি। অতসী আর ছন্দা উঠে গিয়েছিল লাইব্রেরিতে বই বদল করতে। আর অতিরিক্ত চেয়ারগুলো সরিয়ে চারজনে ঘন হয়ে বসেছিল।

সুদেষ্ণা বলেছিল, সত্যি আজ আর আপনারা কবির বাড়ি যাবেন না? তাহলে আমরা আরো অনেকক্ষণ আড্ডা দেবো। নন্দা তুই কিন্তু উঠি উঠি করবি না।

কুমারের দিকে তাকিয়ে অলকানন্দা বলেছিল, আপনি কবিতা লেখেন?

অপ্রস্তুত কুমার বলেছিল, না তো!

অলকানন্দা অন্তরঙ্গ হেসেছিল। আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় আপনি কবিতা-টবিতা লেখেন। তা ছাড়া কবিতার কাগজ বের করছেন।

কুমার হেসে বলেছিল সেটা বোধহয় উচিত হয়নি। এই কাগজের পরিকল্পনা করে এখন মনে হচ্ছে বেশ ঝামেলাতেই পড়েছি। সব কাজ কি সবাইয়ের সাজে।

অলকানন্দা বলেছিল, আপনার তো সাজে বলেই মনে হয়।

কুমার বলেছিল, তা ঠিক নয়, কবিতা ভালোবাসি এইটুকুই যা...। আসলে কবিতা ভালোবাসাই সব চেয়ে সহজ, একেবারে আয়োজনহীন। নিঃশব্দ নিভৃতে একেবারে একা সময়-অসময়ে যার সঙ্গে সব থেকে বেশি অন্তরঙ্গতা করা যায়। আর কবির চেহারা বিষয়ে যা বলছেন সেটা একটা মিথ। আসলে কবিতা-চর্চা ব্যাপারটা স্বকীয় নিজস্বতায় সমৃদ্ধ এমনই এক মৃদু মনোযোগী অভ্যেস যে, যারা তার চর্চা করে তাদের একটা ঢং যেন তৈরি হয়েই যায়। যদি সেটা সত্যি বলে ধরেও নিই তবু পঞ্চাশের দশক পেরোতে পেরোতেই তা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে।

অলকানন্দা বলেছিল, তা হোক, কিন্তু সেই পুরনো চেনা ছবিটা তো কল্পনায় মরে যায়নি। আপনাকে দেখতে দেখতে আমার তা-ই মনে হচ্ছে।

সুদেষ্ণা বলেছিল, নন্দা এখন আপনার কথার ঘোরে পড়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলছে। আসলে কিন্তু কবি-কবি চেহারার লোক ওর দু-চক্ষের বিষ। আপনার কবি-চেহারায় এমন কিছু আছে যা ওর উন্নাসিক দৃষ্টিকেও ছাপিয়ে গেছে। আশ্চর্য বটে।

সুভদ্র বলল,কবিতা ভালো না বেসেও কবি-চেহারার লোককে ভালো লাগবে এটা ঠিক না হওয়াই স্বাভাবিক। বরং বিরাগই হওয়ার কথা।

অলকানন্দা বলেছিল, কবিতা ভালোবাসি না তা একেবারেই নয়। রবীন্দ্রনাথ রয়েছে কী করতে। তিরিশের দশকও রীতিমতো আপ্লুত করে। তারপর থেকে ভালোলাগাটা ক্রমশ নীরস নির্জীব হতে হতে আজকের এই আধুনিকতাকে অসহ্য মনে হয়।

কুমার বলেছিল, এরকম ঢালাও মতামতটা ঠিক নয়। অন্তত একটু ভালোবাসা নিয়ে প্রথমে মনোযোগী হতে হবে। অল্প-স্বল্প অনুশীলন ছাড়া কি কোনো শিল্পেরই রসগ্রহণ সম্ভব? আজকের কবিদের সেভাবেই মাঝে মাঝে পড়ুন না, হঠাৎ ভালোলাগার মতো কিছু কিছু নিশ্চয়ই পাবেন। আবিষ্কারের একটা আনন্দ আছে তো।

একটু থেমে আবার বলে, আমার কথাগুলো খুব বোকা বোকা বা অনাবশ্যক জ্ঞান জাহির বলে মনে হচ্ছে?

সুদেষ্ণা বলেছিল, একেবারেই না। বরং খুব সুন্দর শোনাচ্ছে। আমি সবরকম কবিতা পড়তেই ভালোবাসি।

অলকানন্দা বলল, একটা ঘটনা বলি। ইউনিভার্সিটিতে আমাদেরই ব্যাচমেট এক উঠতি কবি আমার কাছে স্বরচিত কবিতার বই বিক্রি করতে এসেছিল। বিরক্তি দেখিয়ে বলেছিলাম, বুঝি না। ছেলেটি উচ্ছ্বাসে বলল, আমি আপনাকে বোঝাব। ভাবলাম, কী অডাসিটি, আমাকে শেখাবে! বললাম, আমার অত বাজে সময় নেই। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ক্লাসে চলে গেলাম।

সুভদ্র সিগারেটে টান দিয়ে আওয়াজ করে হেসেছিল, — রাগলেও আপনাকে সুন্দর

দেখাবে বলেই আমার বিশ্বাস, তবু ন্যূনতম সৌজন্য বজায় রাখার পক্ষে আচরণটা কিছু অতিরিক্ত স্মার্ট ও ইগোসেন্ট্রিক হয়ে গিয়েছিল।

সুদেষ্ণা বলল, এতদিন ঘটনাটা নন্দার আত্মতৃপ্তির কারণ ছিল, আজ প্রথম গলায় গ্লানির রেশ পাচ্ছি।

অলকানন্দা স্বীকার করে নেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছিল। — আধুনিক কবিতা ভালোবেসে তার স্বপক্ষে এভাবে কথা বলতে এর আগে এত কাছ থেকে কাউকে দেখিনি। তাই কুমারের কথায় বিচলিত বোধ করছি।

সুভদ্র হেসেছিল,— বেশ, বোঝা গেল। কিন্তু কী পড়তে আপনার সব চেয়ে ভালোলাগে।

একটুও সময় না নিয়ে অলকানন্দা বলেছিল, চিঠি।

কুমার কপট এক স্বস্তির ভঙ্গি করেছিল। — যাক, ওই একটা জিনিসই আমি লিখতে পারি।

স্বভাবমতো সুভদ্র বলেছিল, এই তো বিপদ বাড়ালেন। মেয়েদের চিঠি লেখায় কুমারের জুড়ি নেই। রাজ্যের মেয়েদের কোটেশন কণ্টকিত কত চিঠি যে লেখে তার হিসেব নেই। একেবারে জেরবার অবস্থা।

কুমার রীতিমতো লজ্জা পেয়ে বলেছিল, বদ রসিকতা করিস না।

অলকানন্দা বড়ো চোখে তাকিয়েছিল, — সত্যি আপনার এমন অফুরান ভাণ্ডার আর প্রসারিত হৃদয়! তাহলে তার ছিটেফোঁটা আমাদেরও দেবেন, পাঠ করে তৃপ্ত হব।

অলকানন্দাকে উদ্দেশ্য করে সকৌতুকে সুদেষ্ণা বলেছিল, যাক, তোর আশ এবার মিটবে তাহলে। তোর বর তো তোকে বিশেষ চিঠিটিঠি লেখে না, অথচ চিঠি-চিঠি করে হেদিয়ে মরে যাস। এবার সে-দুঃখ অনেকটা ঘুচবে আশা করি।

চোখেমুখে প্রবল অস্বস্তিতে মাখামাখি অলকানন্দা বুকের আঁচলটা অনাবশ্যক ঠিক করতে করতে একটু সামলাল নিজেকে। তারপর বলল, বর না ছাই। আর কী যে চিঠির ছিরি!

কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল কুমার। সুভদ্র মুচকি হেসে বলেছিল, গ্রেট নিউজ!

সুদেষ্ণা মূলত কুমারের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ও বাগদত্তা। ছোটোবেলায় বড়ো রাস্তায় মুখোমুখি বাড়িতে, বারান্দায়, ছাদে, রাস্তার মোড়ে চোখে চোখে প্রেম হয়েছিল। তারপর পাড়ার সেই মুখচোরা প্রেমিক যুবক, বিলেত গিয়ে সাহসী হয়ে বিজয়ার কার্ড পাঠাল। ব্যাস, তারপর যা হয়, নববর্ষ, জন্মদিন ইত্যাদি যা যা আছে, শুরু হয়ে গেল শুভেচ্ছা জানাবার পারস্পরিক তৎপরতা। আর ক্রমে সেই পথ ধরে, গোপন প্রেমের চিঠি। সেই বার্তা একদিন পৌঁছে গেল গুরুজনদের কানে। দ্রুত সভা ডেকে তাঁরা ব্যাপারটা পাকা করে ফেললেন। তারপর দিন, মাস, বছর যেতে যেতে এখন বিষয়টা অলস চিঠির মজা-স্রোতে আটকে আছে। না এদিক, না ওদিক। সেই সাহেব হয়ে-ওঠা উদ্যোগী যুবক, কবে যে রাজকন্যাকে নিয়ে যাবে, সে-কথা কারুরই সঠিক জানা নেই।

অলকানন্দা নিজেকে একটু ঝাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন বলেছিল, সুদেষ্ণা ঠিকই বলেছে। কেন যে তখন মরতে বিয়ে করব বলে নেচেছিলাম। আর ভালো লাগছে না। কেমন একটা খাঁচায় পোরা অবস্থা।

সুভদ্র স্বভাবহাসি হেসে বলেছিল, তখন নেচেছিলেন বলেই এখনো নাচতে হবে তার অবশ্য কোনো মানে নেই।

প্রসঙ্গটা দ্রুত পালটে ফেলার জন্যে কুমারের দিকে তাকিয়ে অলকানন্দা হঠাৎ বলেছিল, আপনার ঝড় ভালো লাগে? দেখুন, বাইরে কী অপূর্ব কালো হয়ে গেছে, ঝড় উঠবে।

খুশিতে মাথা নেড়েছিল কুমার, — খু-ব। চলুন জানলার ধারে গিয়ে বসি।

চারজনে খোলা জানলার ধারে একটা খালি টেবিলে উঠে এসেছিল। আকাশ-ছাওয়া কালো মেঘে ভেতরটা অন্ধকার। টেবিলে টেবিলে শুধু জটবাঁধা ঘনিষ্ঠ ছায়ামূর্তি। বেয়ারা এসে একটা দুটো করে আলোগুলো জ্বালিয়ে দিতে লাগল।

সুদেষ্ণা হতাশ গলায় বলল, এরা এত বেরসিক ...।

হিন্দু স্কুলের, কার্নিশে এলোমেলো-পালক কয়েকটা কাক দাপুটে হাওয়ার সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করছে। কোথা থেকে বইয়ের কয়েকটা ছেঁড়া পাতা জানলার সামনে দিয়ে এলোমেলো উড়ে গেল। ভেতরে দেওয়ালে আধ-ছেঁড়া পোস্টার দাপাদাপি করছে।

অলকানন্দা বলল, ঝড় উঠলে আমি ছাদে উঠে যাই। কী ভালো যে লাগে! সুভদ্র সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল,গান করেন না?

অলকানন্দা মাথা নেড়েছিল, — হ্যাঁ, করি। সুভদ্র বলল, একটা করুন তো।

অলকানন্দা চমকে উঠেছিল, — এখানে!

সুদেষ্ণা সায় দিয়েছিল, — তাতে কী হয়েছে! কর্ না।

সবশেষে কুমার বলেছিল, আজ যদি একটা গান করেন, চিরকাল মনে রাখার মতো হবে দিনটা।

অলকানন্দা সরাসরি কুমারের চোখে স্থির দৃষ্টি দিয়েছিল, — আর গান না করলে?

কুমার অপ্রস্তুত হয়েছিল। বলেছিল, গন্ধের মতো সুরও যে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়। তাই চিরকাল মনে রাখার জন্য আরো এই অতিরিক্তটুকু চাইছি।

কুমারের দিকে আরো একটু স্থির তাকিয়ে থেকে অলকানন্দা টেবিলের ওপর বাঁ-বাহুর সম্পূর্ণ ভর রেখে ডানহাতের পাতাটা কানের পাশে রেখে নিচু গলায় শুরু করল,

মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার ক'রে আসে...

ঝমঝম বৃষ্টি। সুদেষ্ণা জানলায় ঝুঁকে বাইরে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর ভিজে পাতাটা গালে বুলিয়ে নিল।

আরো এক-আধদিন দেখা হওয়ার পর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অলকানন্দার চিঠি পেয়েছিল কুমার। দামি কাগজে নাম-ছাপানো নিজস্ব প্যাড। কুমারের পক্ষে ভাবাটা দুষ্কর ছিল। অবশ্য তৈরি-করা একটা অজুহাত ছিল। আগামী শুক্রবার যে কফি হাউসে দেখা হওয়ার কথা, সেটা হচ্ছে না, বাড়িতে একটা বিশেষ কাজ পড়ে গেছে। — 'রাগ কোরো না।' কিম্বা 'একেবারেই রাগ করবে না। অনেকের মধ্যে একের অভাববোধ নাও হতে পারে। তোমার বাড়িতে ফোন থাকলে বেশ ভালো হত। অবশ্য চিঠিই আমার সব চাইতে প্রিয়।

'আজ ঝড় উঠেছিল। ভীষণভাবে মনে পড়ছিল তোমার কথা। কোথায় ছিলে তখন? একবারও কি মনে পড়েছিল আমাকে? সেদিন গান গাইতে গাইতে মনে হচ্ছিল, যদি শুধু একা তোমাকেই শোনাতে পারতাম তবে সব চেয়ে খুশি হতাম। পরে কবে আবার আসবে বলো তো? অনেক লম্বা গল্প চাই সেদিন। ... চিঠিটা খুব বাজে লেখা হচ্ছে। তোমাকে লেখা আমার প্রথম চিঠি এত খারাপ হবে ভাবিনি। তাই থামলাম। তোমার সুন্দর উত্তর আমার এই দৈন্য ঘোচাবে নিশ্চয়ই। রাত অনেক হল...'

এখন ভাবলে বানানো গল্পের মতো মনে হয়। আভিজাত্য আর বৈভবের নিরেট দেওয়াল পেরিয়ে কত অবলীলায় অলকানন্দা ঢুকে পড়েছিল কুমারের জীবনে। তীব্র রোমান্টিকতায় মাখামাখি বিচারহীন, বোধহীন সেই আসা। মেয়েরা কত কী পারে! স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি নানা সময়ে গোপন অনুরাগে কত সহজে বদলে নিতে পারে নিজেকে!

গাড়ি, বই ঠাসা ভ্যানরিকশা আর লোকের ভিড় ঠেলে মহাবোধি সোসাইটি হল-এর সামনে এসে পড়ল কুমার। বাইরে ফুটপাথে উদ্যোক্তাদের প্রতীক্ষার ছোটো একটা জটলা। কয়েকজন কুমারকে সহজেই চিনল। সাদর আমন্ত্রণ জানাল। ভেতরটা মোটামুটি ভরাট হয়ে গেছে। এই ধরনের সাহিত্যের আলোচনা আর কবিতা-পাঠের আসরে, আসন ভরিয়ে তোলার জন্যে কিছু উৎসাহী নারী-পুরুষ জুটেই যায়।

অল্প পরেই সভা শুরু হয়ে গেল। নানা আলোচনা আর মাঝে মাঝে কবিতাপাঠ। সঙ্গে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে আবেদন-নিবেদন এবং নানাবিধ প্রশ্নও চলতে লাগল।

এক সময়ে কুমারের ডাক পড়ল। জীবনের বাস্তব আর সাহিত্যের বাস্তবের সূক্ষ্ম বিভেদরেখাটা কোথায়? জীবনের বাস্তবকে যথার্থ রূপান্তরিত করতে না পারলে সাহিত্যে তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। লেখকরা সাহিত্যে, জীবনের বাস্তবকে কাটাছেঁড়া করে উপযোগী রসের সূক্ষ্ম প্রলেপ দিয়ে উপভোগ্য করে তোলেন। সেটুকু না পারলে তা সাহিত্য হয় না, সহজ বিস্মৃতযোগ্য সাংবাদিকতা হয়। অধিকাংশ বাস্তবেরই স্মরণীয় উপভোগ্যতা থাকে না বলেই আমরা তাকে অবহেলায় ছেড়ে আসি। আর সেটাই সাহিত্য হলে আমাদের মধ্যে তাকে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস চলতেই থাকে।

সংক্ষেপেই শেষ করল কুমার। এসব নিয়ে আরো ভাবার আছে। কতটা ঠিকঠাক বোঝাতে পারল কে জানে। কিছু কিছু প্রশ্ন উড়ে এল। কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে সাধ্যমতো বোঝাবার চেষ্টা করল কুমার। তারপর সংযত হাততালির মধ্যে মঞ্চ থেকে নেমে এল। অনেক চেনা মুখ। হারিয়ে যাওয়া কলেজ জীবনের দু-একজন বন্ধুর দেখা পাওয়া গেল অকস্মাৎ। কিছু হাসি আর কথাবার্তা।

একসময় সভা ভাঙল। ভালোই যে খুব বেশি দীর্ঘায়ত হয়নি। এসব সভা লম্বা হলে চলেও না। লোকজন ভিড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে। চেনাজানাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুমারও রাস্তায় নামল। রাত সবে আটটা পেরিয়েছে। যেই পথে এসেছিল সেই পথেই পা বাড়াল।

হঠাৎ কাছাকাছি পেছন থেকে কেউ ডাকল, — 'শোনো'। ঘুরে তাকিয়ে বিস্মিত কুমার দেখল অলকানন্দা। কানের পাশে ঈষৎ অপরিপাটি চুলে আবছা শাদা। সেই একইরকম গায়ে আঁচল জড়ানো। মধ্যাহ্নের চাপা সৌন্দর্যে ভাস্বর। ধীরে ধীরে কুমার বলল, তুমি!

অলকানন্দা বলল, হ্যাঁ আমি। আজ কাগজে দেখলাম এখানে সাহিত্য-আসরে তুমি বক্তা, তাই এসেছি। তোমার সাহিত্যের বক্তৃতা শুনতে নয়, তোমার দেখা পেতে আর আলাদাভাবে কিছু শুনতে। ... চুলগুলো এত বেশি বিশ্রী পাকিয়ে ফেললে কী করে!

কুমার হাসল, — বিশ্রী? তাহলে বলছ কালো করতে, ভালো লাগবে?

অলকানন্দা হাসল না। বলল, আমি বলেছি ভালো লাগবে? কোনো কৃত্রিমতাই তোমাকে মানায় না। আমি দেখতে পারব না। ... পুরনো বাড়ি ছেড়ে যাবার পর আর তোমার খোঁজই পেলাম না। মাসিমা-মেসোমশাইয়ের চলে যাবার খবর পেয়েছিলাম অনেক পরে। কেন আমাকে একবার জানালে না।

কুমার বলল, তুমি বিদেশে ছিলে না? মানে বিলেত?

অলকানন্দা মৃদু হাসল। — হাওয়ার মধ্যে থেকে ধরে নেওয়া একটা আন্দাজ! কেন এমন অদ্ভুত মনে হল?

কুমার বলল, ওই যে তুমি যার বাগদত্তা ছিলে, বিলেতবাসী...?

অলকানন্দা স্থির চোখে কুমারের দিকে তাকাল। — সে বিয়ে আমি ভেঙে দিয়েছিলাম জানো না! কেন ভাঙতে চেয়েছিলাম তোমার তো তা অজানা থাকার কথা নয়।

কুমার বলল, তোমার বিয়ের কার্ড পেয়েছিলাম একটা? অবশ্য রিডাইরেক্ট হয়ে অনেক দেরিতে এসেছিল।

অলকানন্দা অন্যদিকে মুখ ফেরাল। — সে অন্য বিয়ে। করতেই হয়েছিল। ...আমার অনেক অক্ষমতা ছিল, বাধ্যবাধকতা ছিল, সে তো জানতেই। এসব তো মানুষের থাকেই। তাই বলে তুমিও অক্ষম, উদাসীন হয়ে রইলে। মানুষ মানুষকে এভাবে পেছনে ফেলে রেখে যায়! তুমি কী ভেবেছিলে শুধু গল্প আর কবিতায় আমাকে লিখে রাখলেই হবে! কল্পনায় আমাকে সুখী করতে পারলেই তোমার কর্তব্য শেষ!

কিছুটা সময় নিস্তব্ধ কেটে গেল। অলকানন্দা বলল, কিছু বলছ না?

অন্যমনস্কের মতো কুমার বলল, হ্যাঁ।

— কী হ্যাঁ!

— কিছু বলছি না।

— তোমার সাবধানী যুক্তিবাদী মন কিছু বলতে বাধা দিচ্ছে, না একেবারে ইচ্ছেই করছে না কিছু বলতে?

কুমার হাসল। — যুক্তিবাদী সাবধানী হয় সফল লোকেরা, যাদের হারাবার অনেক কিছু থাকে। আমার তো সে-বালাই কোনোকালেই ছিল না। আর বলতে ইচ্ছে করছে না একেবারেই ঠিক নয়। বরং অনেক বেশিই বলতে ইচ্ছে করছে। এতদিন বাদে এত কাছ থেকে তোমাকে দেখে কিছু বলতে ইচ্ছে করবে না তা কি হয়! এই বেশি বলতে ইচ্ছে করছে বলেই চুপ করে আছি। যে-বলা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে তা বলে আর লাভ কী?

কাছে সরে এসে অলকানন্দা তীব্র স্বরে বলল, না একটুও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতা হারায় মানুষেরই অমনোযোগে, অবহেলায়। এমনিতেই তো চারপাশের প্রিয় পৃথিবী প্রতিনিয়ত মরে মরে যায়, আমরা কেন চেষ্টা করি না তাকে বাঁচিয়ে রাখতে?...

একবারও কেন জানতে চেষ্টা করলে না আমি কেমন আছি? তুমি নিশ্চয়ই তোমার জীবনে ভরাট, তাই আমাকে মনে করার কথা মনে আসে না।... যাক গিয়ে এসব কথা। এসো, আমার বাড়ি চলো।

কুমার বলল, কেন?

অলকানন্দা হাসল, — তুমি না সাবধানী নও? ... এক কাপ চা খাবে। একটু গল্প করবে। বেশি আটকাব না। গাড়িতে পৌঁছে দেবো। তবু যদি মনে হয় দেরি হচ্ছে স্ত্রীকে না হয় ফোন করে দিয়ো। কোথায় এসেছ না বললেই হবে।

কুমার হাসল, — কোনো ফোনের দরকার নেই। আমি একাই থাকি।

অলকানন্দা ভুরু কোঁচকাল, — কেন তোমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে?

কুমার বলল, বিয়েটা করা হয়নি।

চোখ বড়ো করে অলকানন্দা বলল, সত্যি! তাহলে তোমাকে আমারই সম্পত্তি বলে মনে করতে পারি।

কুমার হেসে বলল, তুমি কি রাজলক্ষ্মী?

অলকানন্দা বলল, কী যে বলো, সেই প্রেম কী আমার মধ্যে আছে।

কুমারের বাহুমূল ধরে অলকানন্দা মৃদু আকর্ষণ করল। তারপর একটা ঝকঝকে বড়ো গাড়ির সামনে এসে দরজা খুলে বলল, এসো।

রবীন্দ্রনাথ অভিনীত অনুষ্ঠানের স্মারকপত্র : প্রসঙ্গকথা

পার্থ বসু

রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের বহুল ব্যবহার রয়েছে, কখনো-বা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাচ। স্বয়ং নাট্যকার 'ফাল্গুনী' এবং 'রাজা' নাটকে নৃত্যাভিনয় করেছেন।

কলকাতা শহরে জীবনের প্রান্তভাগে যে-সমস্ত নাট্যের নির্দেশনা দিয়েছেন, প্রত্যক্ষভাবে কখনো অংশ নিয়েছেন বা গীতিনাট্যে তাঁর আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্য যোগ হয়েছে — সে-প্রসঙ্গে কোনো কোনো তথ্য এখনো হয়তো কৌতূহলকর হতে পারে। প্রায় প্রতিটির প্রচ্ছদই নন্দলাল বসু-কৃত। দুটিতে দামের উল্লেখ রয়েছে, 'চারি আনা'। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পরিষদের পক্ষে অমল হোম প্রকাশিত 'নটীর পূজা' নাটকের প্রথম রজনী, সোমবার ১২ পৌষ ১৩৩৮, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩১ তারিখের স্মারকপত্রের দ্বিতীয় প্রচ্ছদে মুদ্রিত বয়ান হল, 'কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের প্রসিদ্ধ বস্ত্র-ব্যবসায়ী বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই এণ্ড কোং এই পুস্তিকা মুদ্রণের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।' অর্থাৎ তখনো স্পনসরশিপের বা সহায়ক-প্রথার চল ছিল। এই অনুষ্ঠানের উপলক্ষ ছিল রবীন্দ্রনাথের সত্তর বর্ষপূর্তি।

অনুষ্ঠানপত্রের কর্তিত দ্বিতীয় প্রচ্ছদে দেখা যায় নির্দেশ রয়েছে, 'অনুগ্রহপূর্ব্বক হাততালি দিবেন না।' বিদেশি দস্তুরমাফিক এ-ধরনের সপ্রশংস ধ্বনিতে রবীন্দ্রনাথের বরাবর প্রবল আপত্তি ছিল।

এখানে যে তিনটি স্মারকপত্রের প্রচ্ছদ দেওয়া হল, তার মধ্যে দুটি হল 'নটীর পূজা' নাট্যাভিনয়ের। একটির তারিখ ১২ পৌষ ১৩৩৮, প্রচ্ছদে নন্দলাল বসু অঙ্কিত নটীর ছবি-সহ লিখিত 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী/নাট্যাভিনয়'। দ্বিতীয়টি বিশ্বভারতী মোহরনামা অঙ্কিত ১৬ পৌষ ১৩৩৮ তারিখের।

১৩৩৩-এর ২৫ বৈশাখ শান্তিনিকেতনের 'কোনার্ক' বাড়িতে 'নটীর পূজা' প্রথম মঞ্চস্থ হয়। কবির সত্তর বছর জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতায় কিছু পরিবর্তন-সমেত 'নটীর পূজা'র পুনরাভিনয় হল। সে-সময়ে নাট্যের প্রথমেই ভিক্ষু উপালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেন, তাঁর কণ্ঠে গান ছিল, 'পূর্বগগনভাগে'।

তার একটি কারণ ছিল। তখনো নাটকে ভদ্রগৃহের কন্যারা মঞ্চে নৃত্যাভিনয়ে নামতেন না। সমাজে নিন্দার ভয় ছিল। এই নাটকে প্রথম ভদ্রসমাজের এক কন্যার নৃত্যাভিনয় হয়েছিল। সেই ঘটনা নিয়ে তখন যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি হল। নাটকে বারে বারে গানের বদল হয়েছে। 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু' বা 'পথে চলে যেতে যেতে' ইত্যাদি গান পরবর্তী মঞ্চাভিনয়ে বর্জিত হয়েছে।

তথ্য হিসাবে জানা যায় ১৩৩৫-এ জোড়াসাঁকোতে এগারোই মাঘের উপাসনাতে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা যোগ দিয়েছেন। তার একদিন পরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সেই দালানে প্রবেশমূল্য-সহ বসন্ত ঋতুর গান নিয়ে প্রতিমা দেবী ও দিনেন্দ্রনাথের নির্দেশনায় আশ্রমের সেই দলই 'সুন্দর' গীতাভিনয় করেন।

এ-প্রসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক আরো কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা যায়। ১৯৩১-এর প্রবল বন্যায় উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু অংশ বিধ্বস্ত হয়। সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ

এক সাহায্য-রজনীর পরিকল্পনা করেন। তাঁর প্রস্তাবিত অনুষ্ঠান ছিল 'শিশুতীর্থ'; সঙ্গে সময় কিছু দীর্ঘায়িত করার জন্য ঠিক হল 'বর্ষামঙ্গল' হবে। অথচ বাংলাদেশে তখন শরৎ এসে গেছে। সুতরাং সেই বিচিত্রধরনের গানের পসরা নিয়ে যে 'গীতোৎসব' অনুষ্ঠিত হল, তাঁর প্রথমে যুক্ত হল শরৎ ঋতুর গান, 'নির্মলকান্ত, নমো হে নমো।' এই নাট্যে রবীন্দ্রনাথ 'শিশু' গ্রন্থের একটি রচনায় সুরযোজনা করলেন, 'তোমার কটিতটের ধটি'। গানের মাঝে কবি স্বকণ্ঠে দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন; একটি হল 'দুঃসময়', অন্যটি 'ঝুলন'। শ্রীমতী ঠাকুর এই আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয় করেছিলেন এবং দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় আবৃত্তির নাম দেওয়া হয়েছিল 'দোল'। 'দশ মিনিটের অবকাশ' দিয়ে 'শিশুতীর্থ' নৃত্যগীতাভিনয় হয়েছিল।

নাটকে গান ও নাচ যুক্ত করেও রবীন্দ্রনাথ যেন কিছু দ্বন্দ্বদীর্ণ ছিলেন। সত্তর বছর বয়সে পৌঁছে কবি তার সমাধানের পথ পেলেন। নৃত্যনাট্যের যুগ এল। সূচনা-পর্বে দেখা দিল 'শাপমোচন'। 'রাজা' নাটকের রূপান্তর হল 'অরূপরতন', তার নৃত্যনাট্যরূপ হল 'শাপমোচন'। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই লিখেছেন, 'যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন ক'রে ''রাজা'' নাটক রচিত তারই আভাসে ''শাপ-মোচন'' কথিকাটি রচনা করা হল।'

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কলকাতার রবীন্দ্রজয়ন্তী ছাত্রছাত্রী উৎসব পরিষৎ-এর উদ্যোগে ১৫ পৌষ ১৩৩৮, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩১, শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের 'শাপমোচন' কলকাতায় মঞ্চস্থ হয়। তখন 'নটীর পূজা' নাটকও মঞ্চস্থ হল, তার তালিম নিয়ে কবি তখন ব্যস্ত। সুতরাং পূর্বরচিত গানগুলি নিয়ে কথিকা যোগ করে 'শাপমোচন' রচিত হল। সেই সময়ে দুটি কবিতাতেও সুরযোজনা করে রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্যনাট্যে যুক্ত করেন : 'ছবি' আর 'আনমনা'।

বছরখানেক পরে, ১৯৩৩-এ লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আমন্ত্রণে সেখানকার কাইজারবাগ বরদারিতে আবার 'শাপমোচন' অভিনীত হয়। নির্দেশক ছিলেন প্রতিমা দেবী। আশ্রমিকদের এই নৃত্যনাট্যের প্রধান উৎসাহী এবং উদ্যোগপতি ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। *

সেই বছর মার্চের শেষে পরিবর্তিত রূপে 'শাপমোচন' কলকাতার নিউ এম্পায়ারে অভিনীত হয়। পরে মাদ্রাজ বা চেন্নাই, ওয়ালটেয়ারে এবং সিংহলে বা শ্রীলঙ্কায় 'শাপমোচন' শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা মঞ্চস্থ করেন। এই উপলক্ষে 'শাপমোচন' নাটকের সংগীতাংশ বারবার বদল হয়েছে।

'শাপমোচন' শেষবার মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৩-এর পৌষমেলার সময়ে, শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে। তার কয়েকমাস পরেই কবির মৃত্যু। সেই মরণান্তিক অসুস্থ অবস্থাতে রবীন্দ্রনাথ 'উর্বশী' কবিতার প্রথমাংশে সুর দিয়ে নাটকে যুক্ত করলেন। অরুণেশ্বর ও কমলিকার সংলাপেও সুরযোজনা করলেন। এই 'শাপমোচন' দেখিয়ে দিল অদূরে যখন মৃত্যু অপেক্ষমান, তখনো কবি সৃষ্টিতে নিরলস।

---

* *লেখকের সংযোজন :* লখনউতে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের সাফল্যসংবাদ পেয়ে শান্তিনিকেতন থেকে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে যে-চিঠি লিখেছেন, প্রসঙ্গবোধে তার প্রতিলিপি দেওয়া হল।

'নটীর পূজা' নাট্যাভিনয়ের স্মারকপত্রের প্রচ্ছদ (১২ পৌষ, ১৩৩৮)
প্রচ্ছদ : নন্দলাল বসু

নটীর পূজা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'নটীর পূজা' নাট্যাভিনয়ের স্মারকপত্রের প্রচ্ছদ (১৬ পৌষ, ১৩৩৮)
প্রচ্ছদ : নন্দলাল বসু

শাপ-মোচন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-জয়ন্তী
ছাত্রছাত্রী উৎসব পরিষৎ
১৫ই পৌষ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

'শাপমোচন' গীতিনাট্যের স্মারকপত্রের প্রচ্ছদ (১৫ পৌষ, ১৩৩৮)
প্রচ্ছদ : নন্দলাল বসু

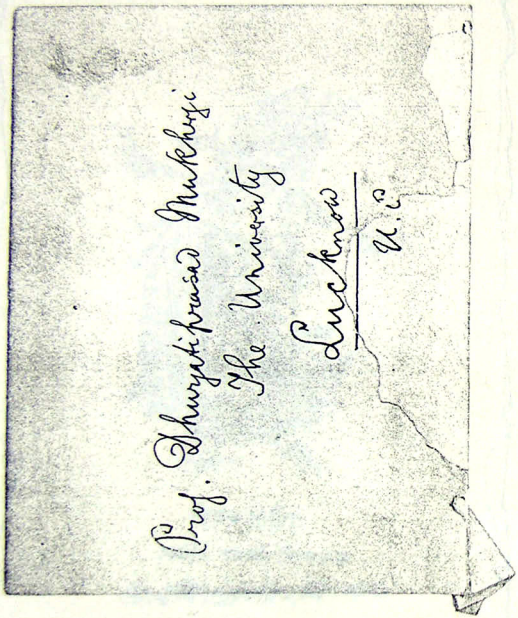

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির খাম।
ঠিকানা রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত।

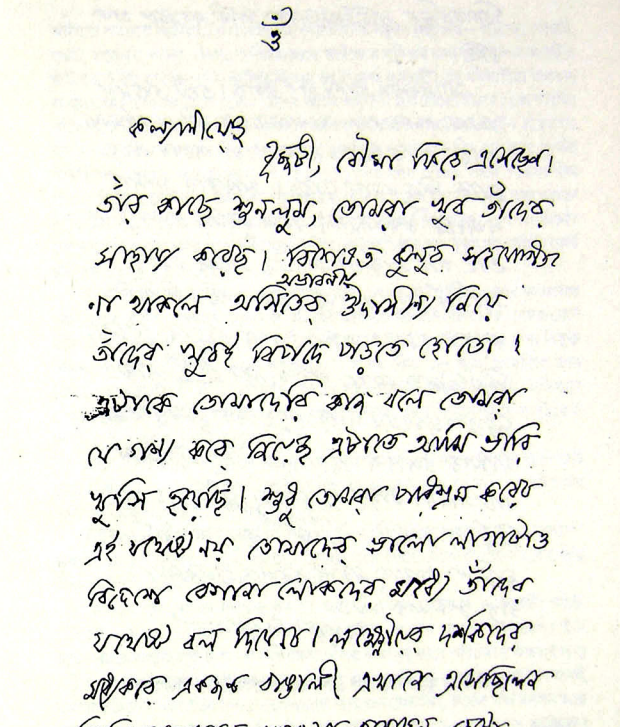

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বৃদ্ধটী, বৌমা ফিরে এসেছেন। তাঁর কাছে শুনলুম, তোমরা খুব তাঁদের সাহায্য করেছ। বিলাতে কুশল সংবাদটি না থাকলে প্রবাসীকে ঔদাসীন্য নিয়ে তাঁদের সুদূর বিষাদে পড়তে হোতো। এটাকে তোমাদেরি কীর্তি বলে তোমরা যে গর্ব্ব করে নিয়েছ এটাতে আমি ভারি খুসি হয়েছি। শুধু তোমরা পরিশ্রম করেই এই যথেষ্ট নয় তোমাদের ভালো লাগাটাও বিদেশে বেমানান লোকদের মধ্যে তাঁদের যথেষ্ট বল দিয়েছে। লাক্ষ্ণৌর দর্শকদের মধ্যেকার একজন সম্পাদক এখানে এসেছিলেন তিনি সব খুলে প্রশংসা করেছেন, সেটা

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির প্রথম দিক।

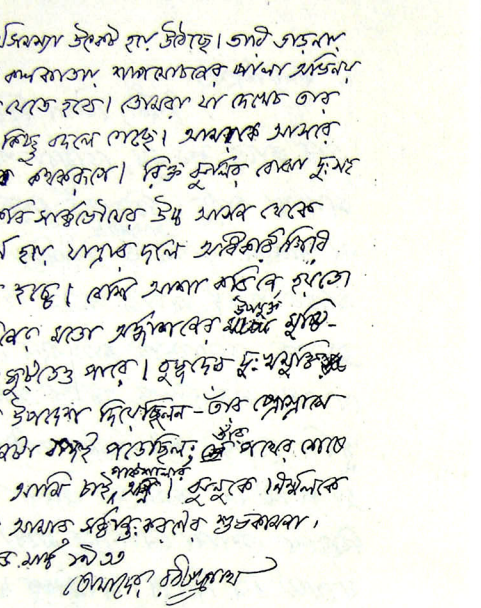

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির দ্বিতীয় দিক।

পরিচয়

বৌমা : প্রতিমা দেবী।

ঝুনু : চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের স্ত্রী।

অসিত : অসিতকুমার হালদার। লখনউ সরকারি শিল্প মহাবিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ।

নির্ম্মল : লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

পুরোনো কলকাতার কোর্ট-কাছারি

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতা-সহ ভারতবর্ষের নানান জায়গায়—মাদ্রাজ, বোম্বাই, সুরাট, বালেশ্বর, পাটনা, মালদা, কাশিমবাজারে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কুঠি স্থাপন করেছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কুঠিতে ছিলেন বহু ইংরেজ কর্মচারী। এই কর্মচারীরা অপরাধ করলে তার বিচার করবে কে? কোন দেশের আইন অনুযায়ী হবে তাদের বিচার? কোম্পানির পরিচালকেরা চেয়েছিলেন এদেশে কর্মরত ইংরেজদের বিচারে ইংল্যান্ডের আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানির পরিচালকেরা বিলেতের পার্লামেন্টে তিন বার সনদ প্রার্থনা করেছিলেন। তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। ১৬৬১, ১৬৮৩ আর ১৬৮৬ সালে পাওয়া তিন সনদের ভিত্তিতে স্থাপিত হয় আদালত। কলকাতায় গড়ে ওঠে মেয়র-কোর্ট, কোর্ট অফ আয়ার অ্যান্ড টারমিনার, কোর্ট অফ রিকোয়েস্টস ইত্যাদি নানা নামের বিচারালয়। ১৭৭৩ সালের শেষভাগে পাওয়া সনদের বলে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। সুপ্রিম কোর্ট চালু হয় ১৭৭৪-এর ডিসেম্বর।

কলকাতায় ইংরেজদের প্রথম ন্যায়ালয় মেয়র-কোর্ট। ১৭২৭ সালে স্থাপিত। এখন কলকাতায় মহাকরণের পূর্বদিকে যে সেন্ট অ্যানড্রুজ চার্চ, সেই জায়গায় ছিল এই বিচারালয়। মেয়র-কোর্ট ভবনটি ছিল দোতলা। দ্বিতলের হলঘরে চলত বিচারের কাজ। বিচার করবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন একজন মেয়র আর ন-জন অল্ডারম্যান। সুপ্রিম কোর্ট চালু হলে প্রথমদিকে তার বিচারও চলেছে মেয়র কোর্টের বাড়িতে। ১৭৯২ সালে বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়। ইতিমধ্যে কোর্টের কাজকর্ম স্থানান্তরিত হয়েছে এসপ্ল্যানেডের পশ্চিমে, এখন যেখানে পুরোনো হাইকোর্ট ভবন, সেই জায়গায় একটি দোতলা বাড়িতে।

আরো একটি আদালত ছিল সে-সময়। সদর দেওয়ানি আদালত বা কোম্পানির অ্যাপিলেট কোর্ট। ১৪মে ১৮৬২ এইসব কোর্ট উঠে গিয়ে চালু হয় হাইকোর্ট। ১৮৭২ সালে বেলজিয়মের 'ক্লথ হল'-এর আদলে তৈরি হয় হাইকোর্ট ভবন।

কিন্তু সে-আমলের কোর্ট-কাছারির গল্প তো আর সাল তারিখে জানা যাবে না। আদালত ভবনের চেহারা দেখেও না। এ-ব্যাপারে জানতে হলে ফিরে যেতে হয় সে-সময়ের কিছু বিচারের গল্পে, আইনজীবীদের জীবনযাত্রায়।

ভারতের শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করবার জন্য ১৭৭৩-এ ব্রিটিশরা 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করে। এই অনুযায়ী ওয়ারেন হেস্টিংস হলেন বাংলার গভর্নর জেনারেল। তাঁর বেতন বছরে আড়াই লক্ষ টাকা। গভর্নর জেনারেলের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্য গঠিত হল চার-সদস্যের কাউন্সিল। চার সদস্যের একজন রিচার্ড বারওয়েল আগে থেকেই বঙ্গদেশে ছিলেন। অন্য তিন সদস্য—জেনারেল স্যার জন ক্লেভারিং, কর্নেল জর্জ মনসন আর স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে এসে নামলেন ১৭৭৪-এর ১৯ অক্টোবর। একুশটি তোপধ্বনি করে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর কথা। কিন্তু সে-জায়গায় তোপধ্বনি হল সতেরোটি। এ-নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয় সে-সময়। কেউ কেউ বলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস — ওয়ারেন হেস্টিংস ঝগড়ার সেই শুরু।

কাউন্সিলের সদস্যরা কলকাতায় আসবার কিছু পরেই চালু হয় সুপ্রিম কোর্ট। যার উদ্দেশ্য —'To protect natives from oppression and to give India benefits of English law.' সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস বা প্রধান বিচারপতি হিসাবে যোগ দেন স্যার এলিজা ইম্পে। পিউনি (Puisne) জজ বা সহযোগী বিচারক রইলেন তিন জন—স্টিফেন সিজার লিমেস্টার, জন হাইড আর স্যার রবার্ট চেম্বারস্।

সুপ্রিম কোর্ট চালু হবার পর, ওই আদালতেই, শুনানি চলে বিখ্যাত 'রাজা বনাম নন্দকুমার' মামলার। বিচারে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম হয়। এ-ঘটনা সবার জানা। কিন্তু কল্পনা করা যাক সেই ঐতিহাসিক বিচারের দৃশ্য। জুন মাসের প্রবল গরমে কলকাতায় সদ্যস্থাপিত সুপ্রিম কোর্টে নন্দকুমারের বিচারসভা। সুপ্রিম কোর্ট বসেছে মেয়র কোর্টের দোতলা বাড়িতে। বিচারকেরা সব লাল আলখাল্লা, ভারী পরচুলা পরে, গম্ভীর মুখে বিচারালয়ে বসে আছেন। তখন বিদ্যুত নেই, রেড়ির তেলের আলো জ্বলছে। ইলেকট্রিক পাখার হাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। প্রধান বিচারপতির পেছনে দাঁড়িয়ে একজন ময়ূর-পালকের পাখা নেড়ে চলেছে। জুন মাসের ভ্যাপসা গরম সহ্য করা দায়! দিনে তিন চারবার পোশাক পালটাতে হয় বিচারকদের। তৃষ্ণার্ত বোধ করলে একটিই উপায়—কোর্টের দক্ষিণ-পশ্চিমে লালদিঘির জলপান। প্রসঙ্গত, লালদিঘির জল সেকালেও বিপজ্জনক ছিল। মাঝে মধ্যেই কটু গন্ধ ছাড়ত এই জলাশয়।

অজানা গ্রীষ্মের মতোই এদেশের ভাষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধিকাংশ বিচারকই অজ্ঞ। দোভাষীর সাহায্যে বারে বারে জেরা করে সাক্ষীদের বক্তব্য বিন্দু বিন্দু করে মাথায় প্রবেশ করাতে হচ্ছে। প্রমাণ হিসাবে আদালতে যেসব নথিপত্র পেশ করা হয়েছে তাও ফারসি, হিন্দি ইত্যাদি নানা অপরিচিত ভাষায়। সেগুলিও অনুবাদ করিয়ে অনুধাবন করতে হচ্ছে। কোর্ট শুরু হয় সকাল আটটায়। শেষ হয় গভীর রাতে। কোর্ট স্থগিত রাখার নিয়ম নেই। অতএব, বিচার চলল একটানা। রবিবারেও ছুটি নেই। এমন অবস্থায় মাথা ঠিক রাখাই তো শক্ত!

বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন ১৭৭৫, রাত প্রায় বারোটার সময় নন্দকুমারের উকিল (অ্যাডভোকেট) ফারার তাঁর সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করা শেষ করলেন। তারপরে নন্দকুমার বিবৃতি দিলেন। নিশ্চয়ই আরো আধঘণ্টা, চল্লিশ মিনিট চলেছিল বিচারসভা। ১৬ জুন ভোরবেলায় প্রধান বিচারপতি রায় দিলেন—নন্দকুমারকে জালিয়াতির দণ্ডভোগ করতে হবে। তখনকার ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জের আইন অনুযায়ী, জালিয়াতির শাস্তি প্রাণদণ্ড।

আঠারো শতকের ইংরেজদের বিচারব্যবস্থা বেশ মজার। যাকে বলা হয় যুক্তিহীন আইনের বিশৃঙ্খলা, তাই চলছে তখন। চুরি জালিয়াতি করলে বা কারুর নাক কেটে দিলে অভিযুক্তের প্রাণদণ্ড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মানুষ-খুনের অপরাধে অভিযুক্তকে দেওয়া হচ্ছে তুলনামূলকভাবে লঘু দণ্ড। মাত্র কয়েকমাস কিংবা কয়েকবছরের কারাবাস! আবার ফাঁসি হলে তা দিতে হবে প্রকাশ্যে, জনবহুল রাস্তার মোড়ে যাতে সবাই দেখতে পায়। ১৮০৭ সালের ১০ জুন সুপ্রিম কোর্ট ছুরি মারার অপরাধে অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে ফাঁসির হুকুম দেয় — 'to be executed on Saturday, the 13th, at the four roads which meet at the head of Lall Bazar Street.' *ক্যালকাটা গেজেট, ইন্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা ক্রনিকল, ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল* এইসব পত্রিকায় পাওয়া যায় সে-সময়ের এমন বিচিত্র দণ্ডদানের বিবরণী।

দেখা যায়, ১৭৯৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের বিচার অনুযায়ী একটি মামলায় ডাকাতিতে অভিযুক্ত কয়েকজনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে কিন্তু অন্য এক মামলায় 'হত্যার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণের অভিযোগে' গঙ্গারাম মিত্র এবং তার সহযোগী কাঙালির হয়েছে এক বছরের কারাবাস। ১৮০০ সালে, এক গৃহস্থের বাড়িতে পঁচিশ টাকা দামের জিনিসপত্র চুরির অপরাধে ব্রজমোহন দত্তকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ১৮০২ সালে চুরির অপরাধে বৈজু মশালচিকেও দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। আবার এরই পাশাপাশি ১৮০৪ সালে নরহত্যার অপরাধে জন ম্যাকল্‌চিন-কে শাস্তি দেওয়া হয়েছে 'এক মাস কারাদণ্ড ও এক টাকা জরিমানা'। একইরকম অপরাধী মহম্মদ টিন্ডালকেও দেওয়া হয়েছে 'এক মাস জেল ও এক টাকা জরিমানা'। ১৮১২ সালে খুনের অপরাধী বৃন্দাবন দুবে-র ওপর দণ্ডাজ্ঞা হয়—হাত পুড়িয়ে দেওয়া এবং এক বছরের কারাবাস। রাহাজানির অপরাধে, ১৮১৩ সালে, দু-জন গোরা—ব্যারি এবং বয়েলকে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড।

অবশ্য জালিয়াতির জন্য সব সময়েই যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তা নয়। ব্যতিক্রম আছে কিছু। যেমন কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আর রামকানাই ঘোষ। এদের অপরাধ জালিয়াতি। তামার প্লেট বানিয়ে আড়াই হাজার টাকার ট্রেজারি-বিল জাল করেছিল এই দুই ব্যক্তি। প্লেট বানিয়ে নোট জাল বা বিল জাল কলকাতায় এই প্রথম। কিন্তু এদের শাস্তি হয় দু-বছরের কারাবাস আর একদিন তুরুমের ব্যবস্থা। তুরুম ঠুকে দেবার ব্যবস্থায় অপরাধীর মাথাটা একটি কাঠের খাঁচার (pillory) মধ্যে ঢুকিয়ে হাতদুটি বেঁধে তাকে ওই অবস্থায় সর্বসাধারণের সামনে ঘণ্টা দু-এক দাঁড় করিয়ে রাখা হত। ১৮১৬ সালে আইন করে তুলে দেওয়া হয় এই ব্যবস্থা।

১৭৮০ থেকে ১৮০০ সালের *ক্যালকাটা গেজেট*-এ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিগুলি থেকে জানা যায় সে-সময়ের কলকাতায় গোলাম-ক্রীতদাস কেনা-বেচার প্রথা চালু ছিল। ক্রীতদাস পালিয়ে যাবার পর তার গায়ের পোড়া দাগ দেখে ধরে দিতে পারলে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেবার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তার 'মালিক'। জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে খুঁচিয়ে এক ক্রীতদাসীকে হত্যা করেছেন 'অভিজাত' বংশের ফরখউন্নিসা বেগম। এই অপরাধ অনুষ্ঠানে তার সহযোগী তিন ভৃত্য। ১৮২৮ সালে ২১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে উঠেছে মামলা। দণ্ডাজ্ঞা হল—পরের দিন বেলা বারোটা অবধি বেগমকে কয়েদ থাকতে হবে। তারপরে খালাস। বেগমসাহেবা জজদের কাছে দরখাস্ত করলেন,—এর চেয়ে আমার অন্য দণ্ড হওয়া ভালো ছিল। এতে আমার সম্মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবে। আমি বিলাতে আপিল করবার অনুমতি চাই। ইংল্যান্ডের রাজা আমায় মার্জনা করতে পারেন। বিচারকেরা বেগম সাহেবার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। জানালেন, বেগমকে এই মর্মে মুচলেকা আর জামিননামা দিতে হবে যে, ১৮২৯ সালে বিলেত থেকে রাজার হুকুম এলে তিনি তা গ্রহণ করবার জন্য আবার আদালতে আসবেন। পরে কী হয়েছিল জানা যায় না কিন্তু ক্রীতদাসী হত্যার পর তখনকার মতো বেগমের একদিনের কারাদণ্ডও মাপ হয়ে গেল!

সে-কালের বিচার-ফাঁসির বিবরণও পাওয়া যায় সংবাদপত্রে, ভ্রমণকাহিনীতে। ৫ আগস্ট ১৭৭৫ কুলিবাজারে (খিদিরপুর) প্রকাশ্য রাস্তায় অস্থায়ী মঞ্চ বানিয়ে নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণের ফাঁসি দেখে অনেকেই নাকি পাপক্ষালনের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ নাকি এরপর কলকাতা ছেড়ে গঙ্গার পশ্চিমে হাওড়ায় বসবাস শুরু করেন। নন্দকুমারের ফাঁসি নিয়ে অনেক বই আছে। কিন্তু যে ফাঁসির বিবরণী সচরাচর পাওয়া যায়

না, তা এক অনামা পেটুকের ফাঁসি। কেরি সাহেব তাঁর *গুড ওল্ড ডেজ অফ অনারেবল জন কোম্পানি*' (ল্যাঙস্ ওয়াভারিংস) গ্রন্থে লিখে গেছেন এই ফাঁসির বিবরণ।

কলকাতার জেল থেকে কিছু দূরে মাঠের মধ্যে ফাঁসির মঞ্চ। অভিযুক্ত থালায় ভাত খাচ্ছে। এক সিপাই খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। একজন বাঙালি কেরানি কাগজ-কলম নিয়ে প্রস্তুত। ফাঁসির ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ লিখে রিপোর্ট পাঠাতে হবে তাকে। কেরানির পাশে দাঁড়িয়ে জেলার। এক সাহেব অ্যাসিস্ট্যান্ট-ম্যাজিস্ট্রেটও রয়েছেন সেখানে।

জেলারকে জিজ্ঞেস করলেন সাহেব, কী, সব তৈরি তো?

জেলার বললেন, হ্যাঁ জনাব। তবে লোকটার এখনো খাওয়া হয়নি।

আসামী তখন ফাঁসির খাওয়া খাচ্ছে।

জেলারের কথা শুনতে পেয়ে লোকটি বলল, আর এক মিনিট অপেক্ষা করুন সাহেব। এই ক-টা তো ভাত, আমি এখুনি খেয়ে নিচ্ছি।

ভাত শেষ করবার পর লোকটি টিনের গেলাসে চুমুক দিল। গেলাসে দুধ ছিল।

লোকটির দুধ খাওয়া শেষ হলে সাহেব বললেন, অপরাধী, তোমার কিছু বলবার আছে?

লোকটি সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে একটানা ভাষণ দিয়ে গেল কিছুক্ষণ। কেরানি লিখে নিলেন। এরপরে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আঙুলের সংকেতে জানিয়ে দিলেন, লটকে দাও। আদেশ পাওয়ামাত্র আসামীকে বধ্যমঞ্চে উঠিয়ে ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হল।

কলকাতার কোর্ট-কাছারির আদিযুগ থেকেই উকিল-ব্যারিস্টার তথা আইনজীবীরা প্রভূত উপার্জন করেছে। *হার্টলি হাউস* গ্রন্থে পাওয়া যাবে সেকালের ব্যারিস্টারদের লক্ষ্মীলাভের কাহিনী। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর *কলিকাতা সেকালের ও একালের* বইতে উদ্ধৃত করেছেন এই বইয়ের বিবরণী—'এদেশ হইতে যাহারা ব্যারিস্টারি করিয়া বিলাতে ফিরিয়া যায়, তাহারা যে অতুল ধনেশ্বর হইবে, তাহা বেশী কিছু আশ্চর্যের নহে। ব্যারিস্টারদের ফি বড়ই বেশী। যদি তুমি তাঁহাদের একটি প্রশ্ন করিতে চাও, তখনই একটি সোনার মোহর দিতে হইবে। যদি তিনি তোমার জন্য তিন লাইন একখানি চিঠি লিখিয়া দেন, তাহা হইলে তখনই আটাশ টাকা গুনিয়া দিতে হইবে। যদি কখনও কোন ব্যারিস্টারের পাল্লায় আমায় পড়িতে হয়, এই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইয়া উঠি। একখানি উইল করিতে হইলে তাহার দীর্ঘতা (দৈর্ঘ্য) অনুসারে ব্যারিস্টারের ফি পাঁচ সোনার মোহর হইতে আরও বেশী। বিবাহ-সম্বন্ধে চুক্তিনামার দরও এইরূপ। আর যাহারা মোকদ্দমার জন্য তাহাদের হাতে গিয়া পড়ে, তাহাদের হাতসর্বস্ব হওয়া অনিবার্য। যদি কোন ব্যারিস্টার সাতটি বৎসর ধরিয়া একমনে রোজগার করেন, আর জুয়া খেলায় মত্ত না হন, তাহা হইলে তিনি লক্ষপতি হইয়া বিলাতে ফিরিতে পারেন।'

জুয়া খেলায় মত্ত হয়েছিলেন বলেই নন্দকুমারের অ্যাডভোকেট ফারার লক্ষপতি হতে পারেননি, সহস্রপতি হয়েই বিলেত ফিরে যেতে হয়েছে তাঁকে। ফারার ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রথম অ্যাডভোকেট। ভারতে এসেছিলেন অক্টোবর ১৭৭৪। কাউন্সিলের দুই সদস্য— জেনারেল ক্লেভারিং আর কর্নেল মনসনের সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে ওঁর পসার বেড়েছিল ভালোই। মাত্র চার বছর রোজগার করে এবং জুয়ায় নিয়মিত হারবার পরেও ওঁর সঞ্চয় হয়েছিল ষাট হাজার পাউন্ড।

কোর্ট-কাছারির কাজকর্ম এসপ্ল্যানেড-পশ্চিমে, হাইকোর্ট বাড়িতে চলে আসবার পরে ক্রমশ আরো বেড়ে গেছে আইনজীবীদের দাপট। মহাবিদ্রোহের পরে উত্তর ভারতের বহু ছিন্নমূল পরিবার কলকাতায় এসে শুরু করেছে ক্ষতিপূরণের মামলা। আইনজীবীদের দম ফেলার সময় নেই প্রায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায় শুরু হয়ে গেছে নানান কর্মকাণ্ড। বাণিজ্যের বিকাশ হয়েছে। উত্থান ঘটেছে ব্যবসায়ীদের। বণিকসভার সদস্য হওয়া এখন যথেষ্ট সম্মানের ব্যাপার। এরই পাশাপাশি, সমাজে বেড়েছে অপরাধের জটিলতা। অতএব কোর্ট-কাছারির ছুটি নেই।

হাইকোর্ট সংলগ্ন রাস্তাটি—ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট (সে-সময়ের উকিলদের ভাষায় আলিবাবা লেন)—ক্রমশ ভরে উঠেছে আইনজীবীদের আবাস এবং অফিসে। এসপ্ল্যানেড-পশ্চিমের হাইকোর্ট ভবনের দক্ষিণ প্রান্ত ধরে, গভর্নমেন্ট হাউস বা লাট-ভবনের দক্ষিণ-দরজা বেষ্টন করে, এসপ্ল্যানেড-পূর্ব পর্যন্ত চলে গেছে এক অগভীর জলের নালা! ভিস্তিওয়ালারা এই নালা থেকে জল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জল সরবরাহ করে এবং লাট-ভবনের সামনে বিকেলবেলায় জল ছেটায়। ধুলোর ওড়াউড়ি বন্ধ করতে এই ব্যবস্থা!

আলিবাবা লেন তথা ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট উত্তরে যেখানে মিশেছে হেস্টিংস স্ট্রিটের (এখনকার কিরণশঙ্কর রায় রোড) সঙ্গে, সেই সংযোগের মুখে এক দোতলা বাড়ি। বাড়ির মালিক ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। এই বাড়ি কিনে নেন এস. জে. লেসলি। অফিস হয়—এস. জে. লেসলি অ্যান্ড সন্স। এস. জে. লেসলি প্রথমে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের সলিসিটর এবং পরে, সুপ্রিম কোর্ট উঠে গেলে, হাইকোর্টের সিনিয়র অ্যাটর্নি। এস. জে. লেসলি-র আইনজীবী ছেলে কেনেথ লেসলি বঙ্গদেশের দুই বিচারালয়—সুপ্রিম কোর্ট আর হাইকোর্টের এক অনবদ্য স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর *দ্য রেড জজ অ্যান্ড আদার অ্যানেকডোটস* বইটিতে।

কেনেথ লেসলি জানিয়েছেন, সে-সময় আইনজীবীরা পেশার চাপে এতটাই ব্যস্ত যে তারা দাড়ি কামাতে কামাতে অথবা জামাকাপড় পরবার সময়েও মক্কেলকে মোকদ্দমার পরামর্শ দিত। এবং তাদের ফি?—'the standard for Counsel's fees in ordinary civil causes on the Original side was, for senior counsel, five goldmohurs for hearing and three for consultation, and for his junior, three and two. The Barrester's gold mohur was rated at Rs. 17 and the Solicitor's at 16.'

সে-সময়ের এক ব্যস্ত আইনজীবী ইয়ার্ডলে নর্টন। প্রতিটি মিনিট তাঁর কাছে মূল্যবান। তাঁর চেম্বারের উলটোদিকেই হাইকোর্টের বার লাইব্রেরি। নর্টন সাহেব চেম্বারের সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতেন, ছুটে রাস্তা পেরিয়ে, দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতেন বার লাইব্রেরিতে। সিঁড়ি নামা-ওঠায় সময় নষ্ট হচ্ছে বলে আক্ষেপ করতেন তিনি। অনেকবার ভেবেছেন নিজের খরচে বানিয়ে নেবেন একটা ওভারব্রিজ, যা তাঁর চেম্বারকে বার লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত করবে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। লোকে বলে, উনি আবেদন করলেও ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যালিটি করতে দিত না শেষপর্যন্ত। কারণ, নর্টনের পসারের দাপটে যে ক-জন ব্যারিস্টারের রোজগারপাতি মার খেয়েছিল তাদের দু-একজন ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর। ইয়ার্ডলে নর্টনকে একবার হাইকোর্টের বিচারকের আসনে বসবার প্রস্তাব দিলে, উনি তা সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়ে

দেন। প্রস্তাবদাতাকে উনি নাকি বলেছিলেন, বাপু হে! প্রতিদিন ছোটা হাজারির (প্রাতঃরাশ) আগেই আমি যা রোজগার করি, তোমাদের জজসাহেব সারা মাসে তা করেন না।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বড়ো বড়ো ইউরোপিয় বাণিজ্যিক সংস্থা কলকাতায় তাদের কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটায়। গিলানডার্স আরবাথনট, গ্ল্যাডস্টোন উইলি, টার্নার মরিসন, জার্ডিন স্কিনার, গ্রাহাম, ফিনলে ম্যুর, অ্যানড্রু ইউল, হিলজার্স, কিলবার্ন ইত্যাদি বিদেশি সংস্থা ক্লাইভ স্ট্রিট জুড়ে একের পর এক অফিস খুলেছে।

বড়ো ঢেউয়ের পাশাপাশি ছোটো ছোটো ঢেউয়ের মতো এই সময়েই কলকাতায় জেগে উঠল মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীরা। এরা প্রধানত বড়োবাজার অঞ্চলে থাকে। ওই অঞ্চলের কোনো সংকীর্ণ গলিতে এক-কামরার অফিস খুলেছে তারা। ব্যবসার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সবাই। সকালে রাস্তার কলে স্নান সেরে, বেশ পরিবর্তন করে এরা জড়ো হয় স্থানীয় কোনো মিষ্টির দোকানে। সেখানে প্রাতঃরাশের পর হাতে লাল হিসাবখাতা নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ে ক্লাইভ স্ট্রিটের উদ্দেশে। ইউরোপিয় মার্কেনটাইল সংস্থাগুলির সঙ্গে চট কিংবা কেরোসিন তেল সরবরাহ সংক্রান্ত মোটা টাকার চুক্তি করবার পর নির্বিকারমুখে এরা ফিরে যায় নিজেদের ডেরায়। বড়োবাজারের কোনো বাড়ির একটি বড়ো ঘরে হয়তো সবাই থাকে। সেই ঘরের কেন্দ্রস্থলে রাখা হবে লাল হিসাবের খাতাগুলি। অ্যাকাউন্টস বইকে মাথার বালিশ করে ঘরের মেঝেতে গা এলিয়ে দেবে ওরা। পরের সকাল থেকে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এই পরিশ্রমী মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরাই, কিছু বিলিতি সংস্থার সাহায্যে, ক্রমে স্থাপন করে একাধিক মারোয়াড়ি মার্কেনটাইল সংস্থা।

বাণিজ্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় মামলা-মোকদ্দমাও বেড়ে গেল বহুগুণ। হয় চুক্তিভঙ্গের জন্য মামলা, নয় চুক্তি-বলবৎ করবার জন্য মামলা। মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী বনাম ব্রিটিশ। তখন হাইকোর্ট গম-গম করত মূলত বাণিজ্যিক মামলা মোকদ্দমায়।

কোর্টের আকর্ষণ সাঙ্ঘাতিক। সে-সময়ের অনেক বাণিজ্যিক-পরিবারের ছেলে যোগ দিয়েছে হাইকোর্টে। অ্যাপকার অ্যান্ড কোম্পানির সাতজন অ্যাপকার যোগ দিয়েছেন আইন ব্যবসায়। এদেরই একজন, টমি অ্যাপকার, সে-যুগের কিংবদন্তি। টমি তাঁর তীক্ষ্ণ কালো চোখ সাক্ষী বা অভিযুক্তের চোখে রেখে যখন জেরা শুরু করতেন, নাটকীয় মাত্রায় চড়ে যেত সেই কথোপকথন! টমির অদ্ভুত ক্ষমতা। এমন এমন প্রশ্ন করে বসতেন সাক্ষীকে, যা হয়তো ব্রিফে নেই। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর থেকেই ধরা পড়ে যেত অপরাধী। অবাক অ্যাটর্নি টমিকে জিজ্ঞেস করতেন, একথা তো আমাদের লেখায় ছিল না, আপনি জানলেন কী করে? টমি বলতেন, আমিও ঠিক জানি না, আপনার ব্রিফেও তো নেই। বোধহয় বদমায়েসটার চোখ দেখে বুঝেছি ব্যাপারটা।

বিমা-সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের মামলায় ক্লাইভ স্ট্রিটের এক ধনকুবের ব্যবসায়ীকে জেরা করছিলেন টমি। ব্যবসায়ীটি বিমার শর্ত অনুসারে দেয় টাকার দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করছিল। টমি হঠাৎ তাকে বললেন, আপনার কোটের পকেটে যে-দলিলটি আছে তাড়াতাড়ি বের করুন।

ধনকুবেরটি বিবর্ণ এবং হতভম্ব। সে তার কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি ভাঁজ করা দলিল বের করে আনল। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে সেই দলিল তুলে দিল টমির হাতে। দেখা গেল, অন্য এক সাক্ষীর সঙ্গে মোটা টাকার চুক্তি করেছে ধনকুবের ব্যবসায়ীটি এবং চুক্তির

মোদ্দা ব্যাপারটা হল, ওই সাক্ষী যদি এই ব্যবসায়ীকে বিমার পলিসির শর্ত এড়াবার জন্য যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করে দেয়, তাকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হবে।

এর পরেও টমি বললেন, আমি জানতামই না। কেউ বলেওনি আমাকে। কিন্তু জেরা করবার সময় হঠাৎই মনে হল এমন একটা দলিল নিশ্চয়ই আছে। এবং তা আছে লোকটির কোটের পকেটে!

শুধু বিমা কোম্পানি নয়, অপরাধীরা হানা দিয়েছিল ব্যাঙ্কেও। অপরাধ ঠেকাতে কলকাতার ব্যাঙ্কগুলিও ক্রমশ প্রবর্তন করে নতুন নিয়ম-নীতি।

কলকাতার আগ্রা ব্যাঙ্কের চেক ভাঙানোর পদ্ধতি খুবই সহজ। সকালে ব্যাঙ্কের দরজা খোলার পর ব্যবসায়ী, পিওন, বাণিজ্যিক সংস্থার কর্মচারী সবাই ব্যাঙ্কের এক নির্দিষ্ট কাউন্টারে চেক জমা দেয়। সব চেক সংগ্রহ করে কাউন্টারের কেরানিবাবু কোষাধ্যক্ষের থেকে সেই পরিমাণ টাকা নিয়ে অপেক্ষমাণ জনতার উদ্দেশে হাঁক পাড়ে। ডাক শুনে বেঞ্চে বসা রামবাবু, শ্যামবাবু, যদুবাবু টাকা নিয়ে যান।

এক সকালে লালচাঁদ কানাইরাম কোম্পানির সরকার হন্তদন্ত হয়ে লেসলির অফিসে প্রবেশ করল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা হয়েছে মারোয়ারি কোম্পানির সরকারের। আগ্রা ব্যাঙ্কে চল্লিশ হাজার টাকার চেক জমা দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তারপর, ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে টাকা চাইতে কাউন্টারের কেরানি জানিয়ে দিয়েছে যে ওঁকে টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। সরকার যত বলেন যে উনি টাকা পাননি, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ শুনবে না। ওদের বক্তব্য, টাকা তো দেওয়া হয়ে গেছে।

সরকারকে নিয়ে লেসলি সাহেব ছুটলেন ব্যাঙ্কে। প্রতিটি কর্মচারীর সঙ্গে কথা বললেন। জানা গেল, যে-সময় মারোয়াড়ি কোম্পানির সরকার জুতো পালিশ করাতে বাইরে গিয়েছিল, তখন এক ঠগ তা লক্ষ্য করে এবং সে-ই নাম ভাঁড়িয়ে, চল্লিশ হাজার টাকা হাতিয়ে পালিয়ে গেছে।

লালচাঁদ কানাইরাম আগ্রা ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে মামলা করল। বিচারক জন ফ্রিম্যান নরিস। দু-পক্ষই আটঘাট বেঁধে লড়তে নেমেছে। আগ্রা ব্যাঙ্কের কাছে এই কোর্টের লড়াই যত না টাকার তার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদার। লালচাঁদ কানাইরামের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এস. জে. লেসলি। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে যা জেনেছেন, তার ভিত্তিতে লেসলি প্রমাণ করলেন লালচাঁদ কানাইরাম এই চেকের টাকা পায়নি, পেয়েছে অন্য লোক। বিচারক নরিস রায় দিলেন— আই ইমপ্লিসিটলি বিলিভ মি. লেসলি। ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এক মারোয়াড়ি সংস্থার জয়, সেদিনের বিচারে, এক অসাধারণ ঘটনা। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করেছিল। কিন্তু সেখানেও হেরে যায় তারা।

সেই থেকে কলকাতার আগ্রা ব্যাঙ্ক চালু করল অভিনব টোকেন-পদ্ধতি। চেক জমা দিলেই দেওয়া হবে একটি ধাতব টোকেন। তারপর ক্যাশ কাউন্টার থেকে টাকা নেবার সময় জমা দিতে হবে সেই টোকেন।

বাণিজ্যিক অপরাধ জাস্টিস নরিস-এর এজলাসে এক চাঞ্চল্যকর হত্যার মামলারও বিচার হয়। সে-সময় দমদমে ছিল সৈন্যবাহিনীর ছাউনি। সেখানকার তিন সৈনিক—ওহারা, গোল্ডসবরো আর বেলনো—এক চাঁদনি রাতে, রাইফেল হাতে হানা দেয় অদূরবর্তী গ্রামে। রাতের অন্ধকারে খেজুর গাছে ঝোলানো রসভরতি কলসিগুলি গুলি করে আর মনের আনন্দে তাড়ি পান করতে থাকে। এক গ্রামবাসী প্রতিবাদ করতে তাকে ধাক্কা দিয়ে ডোবার মধ্যে

ফেলে দেয় ওরা। এবং তারপরে ওই কোমরজলে ডোবা লোকটিকে গুলি করে হত্যা করে ওহারা।

মামলা শুরু হয়। বেলনো, হত্যার দায় থেকে অব্যাহতি পায়। গোল্ডসবরো রাজসাক্ষী হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। ওহারার বিরুদ্ধে মামলা চলে। কিন্তু আইনের মারপ্যাঁচে শেষপর্যন্ত মুক্তি পেয়ে যায় ওহারা। খেজুর রস (তাড়ি) চুরি ঠেকাতে গ্রামবাসীরা কোনো একটি কলসিতে ধুতুরা মিশিয়ে রাখে। এ চালু প্রথা। কেউ কেউ অনুমান করেন, ওই ধুতুরা মেশানো তাড়ি খেয়ে সাময়িকভাবে বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছিল ওহারার। সেই অবস্থাতেই নাকি ও গুলি চালায়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *বেঙ্গলি* পত্রিকায় বিচারক নরিসকে 'the greatest disgrace to the English ermine' বলে উল্লেখ করে আদালত অবমাননার দায়ে পড়েন। বিচারে সুরেন্দ্রনাথের ছ-মাসের জেল হয়। সুরেন্দ্রনাথের সমর্থনে কোর্টে এত ভিড় হয় সেদিন, তাঁকে পিছনের দরজা দিয়ে কোনো রকমে বের করে আলিপুর জেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল। জনসাধারণের গালি, টিটকিরি নির্বিবাদে হজম করে পাইপ মুখে সেদিন হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলেন জন ফ্রিম্যান নরিস!

সে-যুগের হাইকোর্টে, আইনি লেখালিখির ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি। ডব্লু. সি. ব্যানার্জি নামে যিনি পরিচিত। ওঁর স্মৃতিশক্তি, আইন এবং তথ্য অনুধাবন করবার ক্ষমতা প্রায় অলৌকিক পর্যায়ের। মক্কেলের দেওয়া বান্ডিল-বান্ডিল তথ্য উনি একবার মন দিয়ে পড়ে নিয়েই ফুলস্ক্যাপ কাগজে দশ-বারো পাতার হলফনামা একটানা লিখে যেতেন। মক্কেলের দেওয়া ওই মোটা খাতা আর দ্বিতীয়বার দেখার প্রয়োজন হত না।

ডব্লু. সি. ব্যানার্জির ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। জেরা করবার সময় সাক্ষীকে অনর্থক ভয় দেখিয়ে, ঘোরালো প্রশ্নে বিব্রত করতেন না কিন্তু তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে সাক্ষী সংকুচিত হয়ে যেত। তবে এক প্রৌঢ় বাঙালি উমেশচন্দ্রকে বেকায়দায় ফেলেছিলেন। ভদ্রলোক কাজ করতেন এস. জে. লেসলির অফিসে। উমেশচন্দ্র তাঁকে জেরা করছেন। জেরা শেষ। ভদ্রলোক কাঠগড়া থেকে নামবার মুখে। হঠাৎ ডব্লু. সি. ব্যানার্জি বললেন, আপনাকে কখনো কলকাতা ছেড়ে পালাতে হয়েছিল? কেরানি ভদ্রলোক জবাব দিলেন, হ্যাঁ, একবার হয়েছিল। খুব সমস্যায় ছিলাম তখন। আমার অ্যাটর্নি শহর ছেড়ে পালাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি সেইমতো কলকাতা ছেড়ে পালাই।

ব্যানার্জি নিরাসক্ত গলায় জানতে চাইলেন, আপনার অ্যাটর্নির নাম? ভদ্রলোক ডব্লু. সি. ব্যানার্জির চোখের দিকে তাকালেন। তারপর একটু থেমে উত্তর দিলেন, আপনার পিতৃদেব।

লেসলির কেরানি ভদ্রলোকের নাম লালবিহারী দে। ইনি কিন্তু সে-যুগের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ রেভারেন্ড লালবিহারী দে নন। হাইকোর্টের সিনিয়র ব্যারিস্টার পিট কেনেডি কেরানি ভদ্রলোককে রেভারেন্ড লালবিহারী ভেবে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, আই থিংক ইয়ু আর আ ক্লার্ক ইন হোলি অর্ডারস।

কেরানি লালবিহারী উত্তর দিয়েছিলেন, আয়াম নট। আয়াম আ ক্লার্ক ইন মিস্টার লেসলি-স অফিস অ্যান্ড আ রেস্পেকটেবল ম্যান।

কেনেথ লেসলির মতে হাইকোর্টের আইনজীবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ড. রাসবিহারী ঘোষ। ভারতবাসী হলেও ড. ঘোষের ইংরেজির ওপর দখল প্রশ্নাতীত। কোনো মামলা নেবার বা পরামর্শ দেবার আগে উনি পুরো বিষয়টি জানতে চাইতেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করবার সময় ছিল কোর্টের পরে, থিয়েটার রোডের বাড়িতে। দোতলার বিশাল হলঘরে সোফায় শরীর এলিয়ে রাসবিহারী মক্কেলের 'ব্রিফ' পড়তেন। পড়তে পড়তেই একটি কাগজে দ্রুত নোট নিতেন। মক্কেল তিন গজ দূরে চুপচাপ বসে থাকত। নোট নেবার পরেই রাসবিহারী কাগজটি ধরিয়ে দিতেন তাঁর কেরানিকে। সে তখন দৌড়ে একতলায় গিয়ে চিরকুটের তালিকা মিলিয়ে নিয়ে আসত চামড়া বাঁধানো আইনের বই। রাসবিহারী একটি করে বই খুলে নির্দিষ্ট জায়গা পড়তেন। পড়া হলেই অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খোলা বইটিকে মেঝেতে আছড়ে ফেলে দিতেন। সমস্ত বই পড়ার শেষে, মক্কেলের দিকে তাকিয়ে, বাছা বাছা শব্দে, ধীর উচ্চারণে বলে যেতেন তাঁর অভিমত। তাঁর মতামত নিয়ে প্রশ্ন করলে অমায়িক গলায় উত্তর দিতেন ঠিকই কিন্তু এটাও বুঝিয়ে দিতেন, প্রশ্ন করা উনি পছন্দ করেন না। বিদায় জানাবার সময়, রাসবিহারী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন, চার কদম এগিয়ে যাবেন মক্কেলের দিকে, তারপর হাত মেলাবেন। গাউন পরিবৃত দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ চেহারার রাসবিহারী যখন তাঁর সহকারীদের নিয়ে বিকেলবেলায় হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়ে নামতেন, মনে হত কোনো অভিজাত রোমান রাজকর্মচারী হেঁটে যাচ্ছেন।

প্রবল আত্মবিশ্বাস ছিল রাসবিহারীর। কখনো তিনি মেজাজ খারাপ করেননি। কিন্তু মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে ধরাশায়ী করেছেন বিচারপতিকে। অ্যাপিলেট বেঞ্চের বিচারককে রাসবিহারী একবার বলেছিলেন, 'I can give your lordship the law but not the intelligence to apply the law.'

লেসলিদের এক বাঙালি মক্কেল ছিল টি. পালিত। পালিতবাবু একাধিক পারিবারিক মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। কোনো মামলা চলছে হাইকোর্টে, কোনো মামলা আলিপুরের জেলা কোর্টে। পালিতবাবু মন দিয়ে আইনের খুঁটিনাটি বুঝতে চেষ্টা করতেন। তাঁর উৎসাহ প্রচুর। সারাদিন ওই পারিবারিক মামলার বিষয় নিয়েই পড়ে থাকতেন। একে একে সব মামলায় জিতে গেলেন পালিত। একটা সময় এল যখন আর কোনো মামলা নেই। এরপর যে কোনো মানুষের আনন্দে থাকার কথা। কিন্তু পালিতবাবুর ক্ষেত্রে তা হল না। জীবন সম্পর্কে ওঁর সব উৎসাহ চলে গেল। খিটখিটে, দুর্বল হয়ে পড়লেন পালিত।

সিনিয়র লেসলি ধরেছিলেন রোগটা। বলেছিলেন, মামলা ছাড়া বাঁচতে পারবে না তুমি। বছরের পর বছর আইনের দাবা খেলায় মেতে ছিলেন যখন, পালিতবাবুর স্বাস্থ্য ভালো ছিল। যখন নিজের কোনো মামলা নেই, পালিতের উচিত অন্য লোকের মামলার বিষয়ে মাথা ঘামানো, পরামর্শ দেওয়া। বলেছিলেন লেসলি। তারপরে লেসলি-ই পালিতবাবুকে দিয়েছিলেন প্রথম মামলার কাজ। সে-সময় বাঙালিদের প্রাচীন একান্নবর্তী সংসার ভেঙে যাচ্ছে। শুরু হয়েছে সারি সারি পারিবারিক মামলা—পার্টিশন স্যুট। পালিত পার্টিশন স্যুটের বিশেষজ্ঞ। তাঁর পসার জমে উঠল অচিরেই। এইভাবে মামলা পরিচালনা, পড়াশুনা করে টি. পালিত ক্রমে হয়ে উঠলেন হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিস্টার!

পুরোনো কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এবং আইনজীবীদের সম্পর্কেও বেশ কিছু আকর্ষক তথ্য জানা যায় লেসলির স্মৃতিকথায়।

বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের এক ভাইপো ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের ডাকসাইটে আইনজীবী। তাঁর নাম থিয়োডর ডিকেন্স। অকৃতদার এই মানুষটি থাকতেন, এখন যার নাম টেম্পল চেম্বার্স, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের দক্ষিণপ্রান্তের সেই বাড়ির তিনতলায়। সাংঘাতিক বদমেজাজি ডিকেন্সের বক্তৃতার ভয়ে বিচারকরাও তটস্থ থাকতেন সব সময়।

এক রাতে রাস্তার পাহারাওয়ালার হাঁকে ঘুম ভেঙে গেল ডিকেন্সের। পাহারাওয়ালা অন্যায় কিছু করেনি। তখন কলকাতার পাহারাদারদের কাজই ছিল রাতের বেলায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাঁক পেড়ে প্রহর ঘোষণা। নিজেদের অস্তিত্ব জানবার জন্যই ওরা অবধারিতভাবে কোনো বাড়ির শয়নকক্ষের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সুর ছাড়ত। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের রাত-পাহারাদার সম্ভবত তেমনই করেছিল। হাঁকডাকে ঘুম ভেঙে যায় ডিকেন্সের। কাঁচা ঘুম ভেঙেই মাথা গরম। রাত-পোশাকে তিনি তরতর করে নেমে গেলেন রাস্তায়। তারপর বেদম ঠেঙালেন পাহারাওয়ালাকে। পরে, মাথা ঠাণ্ডা হলে ডিকেন্স ভাবলেন কাজটা তো ঠিক হয়নি। 'পাবলিক সারভেন্ট'কে মারা আইনত দণ্ডনীয়। তিনি নিজের টেবিলে বসলেন। চিফ ম্যাজিস্ট্রেটকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন ঘটনার বিবরণ এবং এইরকম অপরাধের জন্য যত ফাইন লাগে, তাও দিয়ে দিলেন বিবরণীর সঙ্গে। পরে অবশ্য তাঁকে কোর্টে দাঁড়িয়ে ক্ষমাও চাইতে হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারকেরা থাকতেন শহর থেকে দূরে। কাশীপুর-চিৎপুর অঞ্চলের নির্জনতা পছন্দ ছিল তাঁদের। সামাজিক মেলামেশা এড়িয়ে, নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করবার জন্যই এঁরা হয়ে উঠেছিলেন সমাজ-উদাসীন, অনমনীয় রুক্ষ স্বভাবের মানুষ। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অনমনীয়তার বেশ কিছু উদাহরণ আছে। এ-বিষয়ে সুন্দরবনের কাছে 'থান্ডার' জাহাজের ডুবে যাওয়া এবং পরবর্তী ঘটনাবলী খুবই আকর্ষক।

সুন্দরবন ব্রিটিশদের খুবই পছন্দের জায়গা। অনেক ইংরেজ জমিদার, প্ল্যান্টার, নীলকর এখানে তালুক কিনেছে, কুঠি বানিয়েছে আবার বিলেতে ফেরত যাবার সময় বিক্রি করে চলে গেছে। সুন্দরবনে ভূ-সম্পত্তি রাখা তখন ইংরেজদের কাছে বেশ গর্বের ব্যাপার। সুন্দরবনে নাকি গুপ্তধন পাওয়া যায়। কলকাতার এক বাঙালি পরিবার সুন্দরবনে পর্তুগিজ প্রাসাদ কিনে সেখান থেকে প্রচুর হিরে জহরত উদ্ধার করেছে। সুন্দরবনের জলপথে চালু হয়েছে সাপ্তাহিক স্টিমার পরিবহন। কলকাতা-বেনারস-এলাহাবাদ ভাড়া লাগে দুশো টাকা (মদ-সুরা ছাড়া)। স্টিমারে নাম জেনারেল ম্যাকলিয়ড। পরিচালক ক্যাপ্টেন কেলার।

৫ অক্টোবর ১৮৬৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে সুন্দরবন তথা সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের ওপর। সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যায় সুন্দরবনের বহু গ্রাম। ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটে যায় ওই অঞ্চলে।

হুগলি নদী, কলকাতার ওপরেও এর ধাক্কা পড়েছিল। চিৎপুরের দোতলা বাগানবাড়িতে সোজা গোত্তা মেরে ঢুকে পড়েছিল আস্ত একটা জাহাজ! পরে বন্যার জল কমলে গভীর নালা কেটে সে-জাহাজ নদীতে নিয়ে যেতে হয়। বাগানবাড়ির মালিক জাহাজের মালিকের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করে।

কলকাতার বাণিজ্যিক সংস্থা অ্যাপকার অ্যান্ডকোম্পানির কর্তৃপক্ষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন 'থান্ডার' নামক জাহাজের আগমনের জন্য। প্রায় তিরিশ লক্ষ স্টার্লিং মূল্যের সোনা চীনদেশ থেকে বহন করে আনবার কথা এই জাহাজের। পাঠাচ্ছেন চীনের সম্রাট।

অবশেষে খবর এল, প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবনের কাছেই 'থান্ডার' জাহাজ ডুবে গেছে। কলকাতার নামী, ধার্মিক ইংরেজ পরিবারের এক উড়নচণ্ডী ছেলে আনল এই খবর। ছেলেটি রোমাঞ্চকর অভিযানে যেতে ভালোবাসে। তরবারি চালনায় দক্ষ। অ্যাপকার অ্যান্ড কোম্পানিকে সে জানায়, জাহাজটি যেখানে ডুবে গেছে, জায়গাটি তার চেনা। উপযুক্ত পুরস্কার-পারিশ্রমিক পেলে সে একটি দল বানিয়ে জাহাজের উদ্ধারকাজে লাগতে পারে। অ্যাপকার অ্যান্ড কোম্পানির বিমর্ষ কর্তারা তার এই শর্তে রাজি।

ইংরেজ যুবকটি কিছু অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় শিখ ছেলে জোগাড় করে দ্রুত দল বানিয়ে ফেলে। অ্যাপকার অ্যান্ডকোম্পানি তাদের সমস্ত খরচ বহন করবে। উদ্ধারকাজে যাবার জন্য দ্রুতগামী জলযানের ব্যবস্থা করা হয়। যুবকটি তার সঙ্গীদের নিয়ে হুগলি নদীতে নোঙর করা নৌকায় উঠতে যাবার মুখে তাদের গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। জানা যায়, এই দলটি নাকি সুন্দরবন অঞ্চলে একাধিক ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত।

মামলা ওঠে সুপ্রিম কোর্টে। অ্যাপকার অ্যান্ড কোম্পানির পক্ষে দাঁড়ান নামকরা সব আইনজীবী। উদ্ধারকাজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে, মোটা জামিনের বিনিময়ে, শুধু নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য যুবকটি এবং তার সহযোগীদের ছেড়ে দেবার আরজি পেশ করেন তাঁরা। না হলে, তাঁরা জানান, প্রতিদিন জাহাজটি একটু একটু করে জলের তলায় চোরাবালিতে ডুবে যাবে। এরপরে আর উদ্ধার করা যাবে না এত সম্পদ। সোনার প্রেরক চীন সাম্রাজ্য। এর গুরুত্ব অপরিসীম।

কোনো যুক্তিই গ্রাহ্য করেননি সেদিনের সুপ্রিম কোর্টের বিচারকেরা। শুধু আইনের দাঁড়িপাল্লায় তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সমাজের অন্য কোথায় কী হচ্ছে বা হতে পারে তাতে কিছু এসে যায় না!

ইংরেজ যুবক এবং তার সহযোগীদের বিচার চলে নিজের নিয়মে। তাদের কারাদণ্ড হয়। মাস যায়, বছর যায়। কারাবাসের শেষে যুবকটি তার সঙ্গীদের নিয়ে অ্যাপকার অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় জলপথে সুন্দরবন পাড়ি দেয়।

অদ্ভুত ছেলেটির ক্ষমতা! জাহাজ ডুবির জায়গাটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় সে। কিন্তু রত্নবোঝাই জাহাজ তখন অতল জলের তলায়। জাহাজের নৌকোর একটি ভাঙা টুকরো শুধু উদ্ধার করে তারা। নৌকার সেই ভাঙা টুকরোয় বিবর্ণ রঙে লেখা—থান্ডার।

দাহন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেটার বয়স হবে বছর আটেক, ইটভাঁটায় মানুষ। ছেলেটা মানে বল্টু। ইটভাঁটায় মানুষ না হয়ে তার উপায়ও ছিল না, কেননা তার মা ছিল এক বিধবা কামিন, সেই কামিন ইটভাঁটায় কাজ করতে এসে পেটে বাচ্চা বাধায়। খবরে জানা যায় তার বাবা স্থানীয় প্রোমোটার জগদীশ সিং। জগদীশ সিং একটার পর একটা বহুতল তৈরি করে কয়েক বছরের মধ্যে প্রচুর টাকার মালিক। প্রত্যেকটি বহুতলই আগেরটার চেয়ে কয়েক তলা উঁচু। এখন তার লক্ষ্য আরো আরো উঁচু বাড়ি তৈরি করা। তার আরো একটা পরিচয় সে কিছু সমাজসেবাও করে যাতে তার নাম ছড়িয়ে যায় দিগ্‌বিদিকে। অঘোষিতভাবেই তার আর এক নাম লিডার।

ইদানীং জগদীশ সিং নতুন একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে যাতে এ-শহরের সব চেয়ে উঁচু বাড়ি তৈরি করার কৃতিত্ব তার নামেই বর্তায়। বাড়িটার উচ্চতা হবে স্বাধীনতার সমবয়সী। উনষাট তলা বাড়ি এর আগে করার কথা কখনো ভাবেনি এ-শহরের মানুষ। তার বাড়ির উচ্চতা যত বাড়ছে, তার হাতে টাকাও ঘোরাফেরা করছে তত।

এত টাকা কী করবে ভেবে না-পেয়ে তার প্রতি রাতেই প্রয়োজন হয় মেয়েমানুষের। সেই মেয়েমানুষদের একটা অংশ স্থানীয় ইটভাঁটার কামিনরা। ইটভাঁটার নতুন নতুন ইট যেমন জগদীশপ্রসাদের নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাটবাড়িতে প্রতিদিন আসে, সেই সঙ্গে আসে নতুন মেয়েমানুষও। এরকম আসাআসির দিনে কোনো কোনো কামিন গর্ভবতী হয়, তাদের খালাস করার জন্য স্থানীয় নার্সিং হোমের ডাক্তারবাবু প্রবোধ মহান্তি সদা মোতায়েন। কিন্তু কোনো কারণে এই কামিনটির গর্ভপাত করানো সম্ভব হয়নি, তাই পৃথিবীতে বল্টু নামের ছেলেটির আবির্ভাব।

বল্টু একটু বড়ো হতে তার মা তাকে ইটভাঁটায় জিম্মা দিয়ে চলে যায় অন্য ইটভাঁটায় কাজ করতে। তা ইটভাঁটায় এরকম দু-চারটে বল্টু জন্মে থাকে, তাদের কেউ জন্মের পর-পরই মারা যায়, কেউ বড়ো হয় কালের নিয়মে। যারা ইটভাঁটার লক্ষ ঝড়ঝাপটা সয়ে কোনোরকমে বেঁচে যায়, তারা ক্রমে শিশুশ্রমিক হয়। ইটভাঁটার মালিকের তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে সারাদিনের জন্য বিনিপয়সার মজুর।

এ হেন একটি বল্টু জি.এম.ব্রিকফিল্ডের ঝুপড়িতে বেঁচেবর্তে আছে মালিকের বদান্যতায়। তার জীবনে সারাদিন শুধু ইট, ইট আর ইট। কখনো কাঁচা কখনো পাকা ইট মাথায় তুলে যেমন সারাদিন বইতে হয়, তেমনই পালন করতে হয় মালিকের হাজারো ফাইফরমাশ।

সেদিন ছিল বৃষ্টিবাদলায় হেজেমজে যাওয়া দিন। ইটভাঁটায় বৃষ্টির ফোঁটা বাঁচিয়ে কাজ চলছে সরগরম। মালিক পইপই করে তড়পাচ্ছে, 'খুব সাবধান, একটা ইটও যেন জলদাগি না হয়।' বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে না পড়তে তেরপল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে সারবন্দি পড়ে থাকা কাঁচা ইট। বৃষ্টি একটু ধরতেই আবার তেরপল তুলে কাঁচা ইট মাথায় তুলে লেবাররা নিয়ে যাচ্ছে পাঁজায় সাজাতে। অন্যদের কারো মাথায় বারো, কারো মাথায় দশ। বল্টুর মাথায় আট।

সেই ইটের বোঝা মাথায় নিয়ে ভাঁটার সিঁড়ি বেয়ে নামতেই হঠাৎ টলে যায় বল্টুর পা দুটো। মাথায় বিড়ের উপর এতগুলো রোদ-শুকনো ইট, প্রায় আধখানা পাহাড়, তার উপর পায়ের সামনে দিয়ে সরসর করে ভাঁটার ভেতর নেমে গেল একটা সাপ। নেহাত মেটে সাপ নয়, মাথায় খড়মছাপ, গায়ে চক্কোর-বক্কোর। দেখে তার বুকের ভেতরটা কোলাব্যাঙের মতো লাফায়, পায়ে এক বল্‌গা কাঁপন। ইট মাথায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ফের উপরে চলে আসে। যে-লোকটা রোদ্দুরে পাতানো ইট তুলে গাদিতে সাজিয়ে রাখছিল, তাকে এসে বলে, জীবনদা, সাপ।

— সাপ? জীবন যেমন ইট তুলছিল, তেমনই তুলতে থাকে, সাপ কুনখেনে?

— উই যে, ভাঁটার ভেতর। দ্যাখলাম স্বচক্ষি।

— উটা ঢ্যামনা হবে। যা তো, ভাঁটার ইট ক-খানা সাজায়ে ফ্যাল। তারপর উপাশে আরু শ-দুই আছে। উটা না তুললি মালিক তরে রোজ দেবে না। জীবন দ্রুত হাতে ইট সাজাতেই থাকে।

আরো শ'দুই ইট মানে কম করে পঁচিশ খেপ। বল্টুর মাথা টনটন করে ওঠে। বেলা দুপুর, আকাশের খাঁজে খাঁজে মেঘ জমে থাকলেও ঠা ঠা করছে আষাঢ়ে রোদ্দুর। এত বড়ো ইটখোলা, অন্যদিন বাইশজন লেবার সারা দিনমান খাটুনি দ্যায়, আজ তারা মাত্র দু-জন। বাইশজনের আঠারোজন গেছে তাদের দেশের বাড়িতে, সেই ঝাড়গ্রামে, তাদের পরবে যোগ দিতে। নকুলদা গেছে মালিক গণপতি মাইকাপের বাড়ি, কী সব ফাইফরমাস সেখানে। আর লবঙ্গদির বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ, প্রায় চার-পাঁচদিন কাজে আসছে না। ফলে ক-দিন ধরে যত ইট কাটা হয়েছে, তা ভাঁটায় সাজাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে বল্টু আর জীবন। আষাঢ়ের আকাশে কখন মেঘের হাত-পা গজাবে তার ঠিক নেই, এই বৃষ্টি থামল তো পরক্ষণে ঝেঁপে বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটা একটু লাগলেই জলদাগি হয়ে যাবে ইটগুলো। আর তাহলেই মালিকের মুখ-খারাপ শুনতে শুনতে জান নাকাল। লোকটার মুখ দিয়ে অষ্টক্ষণ ছুঁচো আর আরশুলা বেরোচ্ছে। কেউ কামাই করলে রোজ তো কাটা যাবেই, এক-আধঘণ্টা লেট করলেও অমনি রোজ থেকে কাটান। মুখ ভেংচিয়ে বলেন, সব বাবু হয়েছে, বাবুদের ঘুম ভাঙতে দেরি হয়। তা আমার কী, কম কম কাজ, কম কম মাইনে।

সাপের কথা শুনে জীবনদা যে কান দেবে না তা জানত বল্টু। ইটভাঁটা মানেই সাপের বাথান। কোনোদিন কেউটে বেরোয় তো কোনোদিন গোখরো। ঢোঁড়া বা চিতিও কম নয়। সাপের দেখা মিললেই খোঁজ পড়ে জীবনের। খপ করে ধরে ফেলে সাপের লেজটা। তারপর সাপটার কী হেনস্থা জীবনদার হাতে! তার লেজ ধরে বনবন করে ঘোরাবে, আর মুখে অদ্ভুত শব্দ করে কী সব বলবে তার নিজের ভাষায় তা বুঝতেই পারে না বল্টু।

তাই বল্টুর এখন দু-দিকে গেরো, ভাঁটার ভেতরে সাপ, আবার ভাঁটার ইট না সাজালে রোজ কাটান। লবঙ্গদি থাকলে তাকে ঠিক বাঁচাত। বলত, 'তুই ভাঁটার মুখ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে আয়, আমি ভাঁটার ভেতরপানে সাজিয়ে ফেলি।' আর জীবনদাকে মুখ ঝামটা দিয়ে বলত, 'তুমি আর কচি বাচ্চাটাকে খাটিয়ে মেরো না তো বাপু, ও কি পারে? আমাকে বললেই হত।' লবঙ্গদির কথা শুনলে বল্টুর গা জুড়িয়ে যায়। এই হাজারো ঝড়ঝাপটা থেকে ওকে সব

সময় আগলে আগলে রাখে, কুটোটি গায়ে লাগতে দেয় না। আজ লবঙ্গদি নেই বলেই তার এই বিপত্তি। মুখটা কালো করে সে ফের ইঁট মাথায় ফিরে যায় ভাঁটার মধ্যে।

ইটভাঁটায় যে ঝুপড়িটার খাটিয়াতে বসে সারাদিন গণপতিবাবু খবরদারি করেন, সেটাই বল্টু আর জীবনের রাতের আস্তানা। রাত নেমে এলে এই সারা ইটখোলা শুনশান, কাঠের উনুনে ফুঁ দিতে দিতে চোখ লাল হয়ে যায় বল্টুর। উনুন জ্বলে উঠলে হাঁড়িতে চাল আর ক-টা আলু ফেলে দেয় জীবন। রাত একটু বেড়ে গেলে দুটো সানকিতে ভাত বেড়ে নেয় ওরা। ঝিঁঝির ডাক শুনতে শুনতে আলুভাতের সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজের সোয়াদ আস্তে আস্তে চারিয়ে যায় ভেতরে।

২

জীবন এই ইটভাঁটায় টিকে রয়েছে কতকাল। কাঠের ফ্রেমে ইটের পর ইট গড়ে চলেছে, প্রতিটি ইটে ইংরেজিতে লেখা থাকে 'গণ', সেই ইট পাঁজায় পোড় খেয়ে চলে যায় কোনো অট্টালিকার দেওয়াল কিংবা পার্টিশন হতে। এ-শহরের উঁচু উঁচু বাড়ি দেখতে দেখতে বিড়বিড় করে কখনো বল্টুকে বলে ওঠে, বুঝলি ছামড়া, ইসব বাড়ির হাড়ে-মজ্জায় মিশে আছে আমাদের ঘাম-রক্ত।

বল্টুও জীবনের আঙুল অনুসরণ করে দেখতে থাকে অট্টালিকাগুলির বিশাল চেহারা, বোঝার চেষ্টা করে জীবনদার কথার মর্ম। উঁচু-উঁচু বাড়িগুলোর মগডালে দেখতে দেখতে কখনো বলে, তাইলে একদিন উঠতি দেবে বাড়িটার হুই উঁচু ছাদে?

—তা দেবে না, জীবন খিকখিক করে হাসে। জগতের নিয়মই এরকম যে, তোর ঘাম-রক্ত সব শুষে নেবে বড়ো মানুষরা, কিন্তু সেই ঘাম-রক্তে আর তখন তোর অধিকার নেই, সেই ঘাম-রক্ত সব তখন বড়ো মানুষদের।

জীবনদার এরকম অনেক অনেক কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না বল্টু। তার মাথায় চাপড়ে দিয়ে জীবন বলে, বড়ো হলে সব বুঝবি। এখন নে, শুয়ে পড়্ বেছানায়।

জীবনেরও তখন ঘুম ভরে আসছে চোখে, সারা দিনমান হাড়খাটুনির পর তা আসারই কথা, কিন্তু রাতে খাওয়ার পর তার তখন ইচ্ছে জাগে তার প্রিয় আড়বাঁশিতে সুর তুলতে। ভাটিয়ালি সুর তার বাঁশিতে দারুণ খোলে। চারপাশের ঝিঁঝির ডাক চাপা পড়ে যায়। ফাঁকা প্রান্তরের ভিতর দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে বয়ে যায় হাওয়া, তার সঙ্গে মিশে যায় বাঁশির সুর। শুনতে শুনতে বল্টুর মগজে নেমে আসে গভীর ঘুম। কত রাত পর্যন্ত জীবনদা বাঁশি বাজায় কে জানে। পরদিন লবঙ্গদি এসে মুখ ঝামটা দেয়, কী মানুষ গো তুমি, অত রেতে বাঁশি বাজাতে লাগলে কি বেছানায় ঘুম আসে, না ঘুমোনো যায়? তারপর একটু থেমে বলে, ছেলের মায়েরা রেতে আড়বাঁশি শুনলে আর ভাত খেতি পারে না, তা জানো?

এসব জীবন জানে না। সে শুধু জানে তার বাঁশির সুর নিশুতি মাঠ পেরিয়ে শোভনপুর গাঁ-তক পৌঁছোয়, যেখানে লবঙ্গ তার বাপের বাড়িতে থাকে। সে লবঙ্গর দিকে তাকিয়ে হাসে, তার তাকানো আর হাসির ধরন দেখে লবঙ্গ আবার মুখ ঝামটায়, আ মরণ, হাসি যে আর থামে না।

যাওয়ার আগে সরস্বতী নামের মেয়েটা লবঙ্গদির গায়ে ঢলে পড়ে বলে, দেখিস লবঙ্গ, আমরা ভাঁটায় নেই, তার মধ্যে তোর মানুষটাকে নিয়ে পালিয়ে যাস নে যেন!

মুখ ঝামটা দেয় বটে লবঙ্গদি, কিন্তু লাল হয়ে ওঠে তার মুখটা।

৩

বৃষ্টি একটু ধরতেই বিশাল মোটরবাইকটা প্রবল ভটভটিয়ে জি.এম. ব্রিকফিল্ডের সীমানায় ঢুকে সশব্দে ব্রেক কষে জগদীশ সিং। তার মাথায় ঢাউস লালরঙা হেলমেটটা বাঁ হাতে খুলে ডান হাত দিয়ে মস্ত গোঁফটা একবার পাকিয়ে নেয় দ্রুত। তারপর তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হুঙ্কার দিয়ে বলে, কই, গণপতি—

মালিক গণপতি মাইকাপ একটু দূরে, ছোট্ট ইটের ঘরটিতে গদির উপর বসে একচোখ ঝিমুনি নিয়েও সারাক্ষণ দেখতে থাকেন ইটভাঁটার কাজ। তার চোখের সামনে রাশিরাশি 'গণ' তৈরি হচ্ছে সারাদিন। একটানা ধপাস ধপ শব্দ হয় মেশিনের মতো। যখন একসঙ্গে অনেক ইট তৈরি হতে থাকে লেবারদের হাতের দ্রুতচালে, তখন এই অদ্ভুত শব্দটা গণপতিবাবুর কানে ভারি আরাম দেয়। কোথাও একটু বেচাল দেখলে তার চোখ খুলে যাবে অমনি। চোখের পাতা টানটান করে বলে উঠবেন, কী বেপার? হাত চলতিছে না নিকি? তাঁর সজাগ কান ঠিকই ধরে ফেলে কোনো লেবার হাত থামিয়ে হয়তো মুছছে কপাল থেকে ঝরে পড়া ঘাম, কিংবা কেউ একটা রগড় করেছে, তার ফলে লেবাররা মুখ টিপে হেসে নিচ্ছে এক ফুরসতে।

হঠাৎ তার ঝিমুনির ফুরসতে গণপতি ডাক শুনে চোখ মেলেন গণপতিবাবু। এই ডাকটা ভালোই চেনেন তিনি। জগদীশ সিং তার চেয়ে বয়সে বেশ ছোটো হলেও তাঁর নাম ধরে ডাকে, কেননা তাঁর ইটভাঁটার পাঁজার আগুন নিবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নম্বর, দু-নম্বর থেকে শুরু করে আমা-ঝামা সবই ট্রাকে ট্রাকে চালান হয়ে যায় জগদীশ সিং-এর ধাঁ ধাঁ করে উঁচুতে উঠতে থাকা অট্টালিকাগুলিতে। অনেক সময় পাঁজার আগুন নেবার আগে থেকেই জগদীশ সিং-এর তাগাদা পৌঁছোয়, কই গণপতি, আর কত দেরি? আমার আকাশ ছোঁয়া যে থমকে রয়েছে তোমার ইটের অভাবে।

এই আকাশ ছুঁতে গিয়ে লিডার জগদীশ সিং যে-কাণ্ড করেছে তা নিয়ে ঢের লেখালিখি হয়েছিল কাগজে। শোভাবাগানের মোড়ে দীর্ঘকাল ধরে যে-বস্তিটা লালিত হচ্ছিল বহুকাল, হঠাৎই কীভাবে যেন তাতে আগুন লেগে যায় বছরখানেক আগে। সেই আগুন নেবাতে সাত-সাতটি দমকলের ইঞ্জিন সাত ঘণ্টা ধরে জল ছিটিয়ে তবে আয়ত্তে আনে সেই আগুন। তাতে একশো পঁচিশটি ঝুপড়ি পুড়ে ছাই। তিনটি শিশু সহ সাতজন মারা গিয়েছিল আগুনে পুড়ে। জনান্তিকে জানা গিয়েছিল কেউ বা কারা আগুন লাগিয়েছিল লিডারের প্ররোচনাতেই। কারণ তার দু-মাসের মধ্যেই শুরু হয়েছিল আকাশ ছোঁয়ার পরিকল্পনা। কিন্তু কেউ লিডারের নখাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি।

জি. এম. ব্রিকফিল্ডে লিডারের সদা অবারিত দ্বার। তার মোটরবাইকের শব্দ থামতেই, গণপতিবাবুর বিগলিত গলা শোনা যায়, কী সৌভাগ্য আমার। হঠাৎ লিডার এদিকে কী মনে করে?

এই, দেখতে এসেছি নতুন পাঁজায় আগুন লাগল কি না?

ঠিক এই কারণে জি. এম. ব্রিকফিল্ডে জগদীশ সিং-এর আগমন নয় তা গণপতিবাবুর চেয়ে কে ভালো জানে! বললেন, না, এখনো লাগেনি। তবে লাগব-লাগব করছে।

—তা বৃষ্টিবাদলায় জনগণ এরকম কেয়ার অফ ভগবান পড়ে আছে? ভিজে যাবে যে!

প্রতিটি ইটের উপর 'গণ' লেখা থাকায় জগদীশ সিং একটু রসিয়ে রাশি রাশি ইটের নাম দিয়েছে জনগণ। গণপতিবাবু বললেন, না, ভিজবে না। তেরপল আছে কী করতে?

কথা বলতে বলতে জগদীশ সিং-এর চোখ ঘুরছে ইটভাঁটার এ-কোণ ও-কোণ। কিছুক্ষণ নিরিখ করার পর বলল, কই, আপনার নন্দনকাননের হুরিপরিরা সব গেল কই?

গণপতি মাইকাপ জানেন তাঁর ইটভাঁটার ইট দরকার হলে জগদীশ সিং-এর চ্যালাচামুন্ডারাই আসে ট্রাক নিয়ে। কিন্তু জগদীশ সিং-এর আসার আসল উদ্দেশ্য তাঁর ইটভাঁটার কামিনরা। হঠাৎ হঠাৎ এক-একদিন এসে কোনো কামিন পছন্দ হলে তাকে দেখিয়ে বলে যায়, গণপতি, ওইটে তো বেশ ডাগর। আজ রাতে পাঠিয়ে দিয়ো তো।

আজ ইটভাঁটা শুনশান দেখে বলল, কী ব্যাপার, এমন ঘুঘু চরছে কেন তোমার ব্রিকফিল্ডে?

ইটভাঁটায় যখন বাইশজন লেবার একসঙ্গে কাজ করে, তখন গমগম করতে থাকে সারা তল্লাট। হইহই করে মাটির তাল দলাইমলাই করে একদল, অন্য ক-জন দু-হাত বেলচার মতো করে খামচে নিয়ে আসে মাপ-করা মাটি, ফ্রেমের মধ্যে ফেলে কাঁকুই দিয়ে তুলে নেয় বাড়তি মাটিটুকু, তারপর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ফ্রেম উলটে দিতেই সার সার শুয়ে পড়ে কাঁচা থলথলে গণ-মার্কা ইট। লিডারের ভাষায় জনগণ। আজ লিডারের মুখে এই ঘুঘু-চরা শব্দটি তেমন ভালো লাগল না গণপতিবাবুর। বললেন, সব পরবে গেছে ফুর্তি করতে।

— তাই নাকি? জগদীশ সিং-এর মুখে হিজিবিজি দাগ। মাগিরা ফুর্তি মারার আর সময় পেল না? তা কবে আসবে?

— এই তো পরব শেষ হলেই।

— তা তো জানি পরব শেষ হলেই আসবে। তা পরব শেষ হচ্ছেটা কবে?

— কী জানি। এই হপ্তাখানেকের মধ্যে এসে পড়বে আর কী।

— তা নতুন মাল কিছু আমদানি করতে পারলে?

— না, নতুন আর কোথায়?

— তাইলে ওই বিধবা মাগিটারে পাঠায়ে দিয়ো।

জগদীশ সিং যে লবঙ্গর কথা বলছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না গণপতিবাবুর। ঘাড় নেড়ে বললেন, উটিরে পাঠানো যাবে না। খুব বেয়াড়া মেয়েছেলে।

— হবে না মানে। টাকার পাহাড় ঢাললে অমনি হবে।

— না, হবে না। অন্য বেপার আছে।

— যাস্ শালা —

পরক্ষণে জগদীশ সিং আবার ভটভটিয়ে চলে গেল অন্য কোথাও। হয়তো নতুন কামিনের খোঁজে অন্য কোনো ইটভাঁটায়। তার মুখে শালা শব্দটা কার উদ্দেশে ধাবিত হল তা ভেবে

কিছুক্ষণ গণপতি মাইকাপ আনমনা। কিন্তু ভাবনাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না তার মনে। তার চলে যাওয়ার একটু পরেই আকাশে মেঘের দৌরাত্ম্য। হঠাৎ প্রবলভাবে চিল্লিয়ে উঠলেন, বিষ্টি এল বলে কিন্তু। সাবধান। জনগণ যদি ভেজে...

সারা ইটখোলা জুড়ে অসংখ্য জনগণ চোখ উলটে পড়ে থাকে গোটা দিনমান। সারা বছর তবু হাতের ইঞ্জিনগুলো এক তালে চলে, কিন্তু সমিস্যে যত বর্ষার দিনগুলোতে। আকাশে মেঘের হুল্লোড় দেখলেই গণপতিবাবুর মুখ থেকে ছিটকোতে থাকে তড়পানি। বলেন, শিগগির কাছে রাখ্ তেরপলগুলো। মেঘব্যাটাদের বিশ্বেস নেই। কখন এসে পেচ্ছাব করে ভিজিয়ে দে যাবে তার ঠিক কী! একটা ইটও যেন জলদাগি না হয়।

ইট তৈরির ধপাধপ শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝরে পড়ে গণপতিবাবুর মুখ-খারাপ। ইটের ঘরখানার গদিতে বসে সারাক্ষণ বাজখাঁই গলার আওয়াজ ওঠে, হেই রামচাঁদ, তোর লোকজনদের গায়ে তো বাত ধরে গেল, অত জিরেন নিলে কি চলে? একলব্য, অ্যাই একলব্য, মাথায় চারখান করে ইট নিচ্ছিস যে বড়ো। আদ্দেক ইট নিলে আদ্দেক রোজ কিন্তু। জীবন, তুই আর রগড়ের কথা বলে ইটভাঁটার পচন ধরাস নে। এমনিতেই কাজ করতে গেলে সব বাঘ দ্যাখে। ওরে সর্‌সতী, ঢলানি মাগিদের মতো আর হাসিস নে, মাথা থেকে কাঁচা ইটগুলো পড়লে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। তাতে জনগণ ব্যথা পাবে যে!

এতসব মুখ-খারাপের মধ্যেও লেবারদের হাসাহাসি, কানাকানি, মশকরা চলতেই থাকে। সব যে তার কান এড়িয়ে যায় তা নয়। কিন্তু ধপাস ধপ শব্দের ব্যত্যয় না-হওয়া পর্যন্ত তিনি ঝিমোতে থাকেন। কাজের খামতি না-দিয়ে কেউ যদি মশকরা করে তো করুক না।

হঠাৎ আবার কোনো বেখাপ্পা শব্দ পেলে তাঁর বোঁজা চোখ আবার উদ্ভাসিত, ক্যা রে?

ইটভাঁটার দফাদারদের চোখ এড়িয়ে এক-একদিন ইট গড়তে চেষ্টা করে বল্টু। ফ্রেমের মধ্যে মাটির তাল ফেলে পটাস করে কাঁকুই দিয়ে কেঁকে নেয় বাড়তি মাটিটুকু। মাথায় ইট বওয়ার চেয়ে গড়ার কাজ ঢের সহজ। কিন্তু একটা ইট ফ্রেম থেকে মাটিতে উপুড় করে দিতে-না-দিতেই কোত্থেকে হাঁ হাঁ করে ওঠেন গণপতিবাবু, অ্যাই, ছ্যামড়া, রাখ্ রাখ্, তুই পারবি নে। নষ্ট করে ফেলবি। ইট বওয়া ছেড়ে এখন ইট গড়তে লেগেছে। অ্যাঁ।

গণপতিবাবুর মুখ থেকে তখনো বেরোচ্ছে খিস্তির পাহাড়, ছ্যামড়ার ইদিক নেই উদিক আছে। মাথায় ইট বইতে গেলে পা টলে, তার আবার..., বলে আর একটা খিস্তি, পরক্ষণে, যা বেটা, বাকি ইটগুলো বয়ে ফ্যাল্।

৪

মালিকের ধমকানিতে ফ্রেমটা ফেলে দিয়ে বল্টু তাড়াতাড়ি গিয়ে লুকোয় লবঙ্গদির কাছে। বলে, মালিক বকছে কেন লবঙ্গদি? আমি পারি নে?

লবঙ্গদি বলে, পারছিস একটু একটু। তবে আর একটু বড়ো হ। তখুন ভালো করে পারবি। এখুনো তো কচি আছিস। গাল টিপলে দুধ বেরোয় যে। যা, বাকি আছে ক-টা ইট, বইতে থাক্। দেখছিস নে, ভাঁটায় লেবার নেই বলে মালিকের মাথা খারাপ!

পরবের দিনগুলোতে ইটভাঁটার কাজের একটু খামতি চলে, অন্য ইটভাঁটার মতো তখন জি. এম. ইটভাঁটায়ও লেবারের আকাল। মালিক মাঝেমধ্যে ফুঁসে উঠছে লেবাররা এখনো পরবের ফুর্তি ছেড়ে ভাঁটার কাজে আসছে না বলে। লেবাররা পরবে চলে গেলে ফিরে আসতে প্রায় দু-হপ্তা, কিন্তু ইটভাঁটায় তাই বলে কাজের জিরেন হোক তা একটুও চান না মালিক গণপতি মাইকাপ। যে-চারজন লেবার ভাঁটায় কাজ করছে তাদের ওভারটাইম দিয়ে কাজ করাতে চাইছেন গণপতি মাইকাপ। কাউকে একঘণ্টাও চোখের আড়াল করতে দেন না।

ঝমরু নামের ছেলেটা প্রায় বল্টুর বয়সী, সে এইসব কানাকানি শুনতে শুনতে একদিন বল্টুকে বলে, জানিস্ তো, জীবনদার সঙ্গে লবঙ্গদির আশনাই হয়েছে।

আশনাই ব্যাপারটা মগজে ঢোকে না বল্টুর, তবে যতটা রগড়ের সঙ্গে ঝমরু কথাটা বলল, ততটা রগড়ের মনে হয় না তার। কোথায় একটা মন খারাপ করার গন্ধ আছে। লবঙ্গদি বিধবা। দু-বছর আগে তার স্বামী এই ইটভাঁটার কাজ করত, হঠাৎ তার গা-হাত-পা ফুলতে শুরু করে, আর তার ক-দিনের মধ্যে মারা যায়। তখন লবঙ্গদির কচি বয়স, কত আর হবে, সতেরো-আঠারো। সেই থেকে বাপের বাড়িতে থাকে লবঙ্গদি। মালিক গণপতিবাবুকে এসে ধরতে ইটভাঁটায় বহাল হয়ে যায় একদিন। সেই থেকে বল্টুর একটুখানি সুদিন। লবঙ্গদি কত্ত ভালোবাসে তাকে।

আশনাই কথাটা শোনা ইস্তক সারাক্ষণ এলোমেলো ভাবনা আনমনা করে বল্টুকে। কখনো ভুল হয়ে যায় মাথায় ইট তুলতে। পিছনে তখন বহরু কিংবা আকুলদা দাঁড়িয়ে। বল্টুকে থামতে দেখে তাড়া লাগায়, কী রে বল্টু ধ্যান করতিছিস নাকি? ধ্যান করলি রোজ কাটান যাবে যে।

আবার মাথায় ইট তুলতে থাকে বল্টু। মাথায় পাহাড়ের বোঝা তুলে নিয়ে সাজাতে থাকে ইটভাঁটায়। এক-একটা ইটভাঁটা ভরে তুলতে হিমশিম খেতে হয়। একটা শেষ হলে আবার আর একটা, সেটা শেষ হলে ফের আর একটা। একটা করে ভাঁটা সাজানো হলে তাতে হই হই করে আগুন লাগানো হয়।

একদিন এক ঝিরঝিরে বৃষ্টির দিনে বল্টু লক্ষ করে জীবনদা আর লবঙ্গদির কথা-চালাচালির মধ্যে কেমন একটা রং! একজন আর একজনের দিকে কেমন অন্যভাবে তাকায়, লবঙ্গদি হঠাৎ ফিক করে হেসে ওঠে, অকারণে হা হা করে হাসতে থাকে জীবনদা। কখনো দু-জনে কাজের ফাঁকে খুনসুটি করতে থাকে, লবঙ্গদি কাজের শেষে বাড়ি চলে গেলে কিছুক্ষণ থম হয়ে বসে থাকে জীবনদা, তারপর গভীর রাত পর্যন্ত আড়বাঁশিতে চমৎকার সুর তুলে ছড়িয়ে দেয় বহুদূরে, হয়তো শোভনপুরের দিকেই।

ঝুপড়ির মধ্যে একা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে বল্টু। টনটন করতে থাকে তার ঘাড়, হাত-পা। হঠাৎ এক-একদিন অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম আসে না। মাঝেমধ্যে মনে হয় তার নিজের বলতে কেউ নেই এই পৃথিবীতে। ইটভাঁটার অন্য লেবাররা কখনো তাকে নিয়ে মশকরা করে। বিশাল একটা মোটরবাইকে চড়ে যখন কালো মোচঅলা লোকটা ইটভাঁটার মালিকের কাছে আসে, নকুলদা কিংবা বহরু তাকে লক্ষ করে বলে ওঠে, ওরে, বল্টু তোর বাবা এয়েচে তো। যা না, বাবাকে গিয়ে বল্, তোকে ইস্কুলে ভরতি করে পড়াতে।

মোচঅলা লোকটার চেহারা দেখলে তার কেমন ডাকাত-ডাকাত মনে হয়, তার কাছে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। যাকে দেখলে গায়ে শিরশিরানি জাগে, তার কাছে কী যাওয়া যায়!

কিন্তু এই মোচঅলা লোকটাই যে তার বাবা তা এর ওর কাছে শুনেছে, কিন্তু তার বিশ্বাস হয় না। তার কোনোকালে কেউ নেই বলেই ওরা মশকরা করে এমনতর। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে এই ইটভাঁটায়। সারাদিন ইট বওয়ার বিনিময়ে তার দু-বেলা দুটো খাওয়া, আর এই ঝুপড়ির বিছানায় রাতের ঠেক। তবু এইটুকু জোগাড় করতেই বল্টুর শরীর খানখান।

সেদিন বিকেলে বাপের শরীর খারাপ বলে ছুটি নিয়ে চলে গেল লবঙ্গদি। জীবন আর বল্টু ছাড়া সবাই একে একে ভাঁটার কাজ ছেড়ে চলে গেছে বিকেল হতে-না-হতে। একটু পরে জীবনদা বলল, বাকি ইট ক-খান সাজায়ে রাখ তো বল্টু, আমি পুকুরঘাট থিকে হাত-মুখটা ধুয়ে আসি।

ইটভাঁটা থেকে ক-রশি দূরে বিশাল পুকুর, নারকেলগাছের গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো ঘাট, পুকুরের চারপাশে ঝোপঝাড় থাকায় বেশ নির্জন আর শান্ত। জীবনদা চলে যেতে সে দ্রুত হাতে ইট সাজিয়ে ফ্যালে।

কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল, জীবনদা না ফিরতে একটু ভাবনায় পড়ে বল্টু। হাত-মুখ ধুতে তো এত দেরি হবার কথা নয়। পায়ে পায়ে ঘাটের দিকে এগোয়, বিশাল শিরীষগাছটার দিকে নজর পড়ে, অন্ধকার হিম হয়ে বসছে তার ডালপালায়। আকাশে একটা মাত্তর তারা জ্বলজ্বল করছে। জীবনদা তাকে বলে, ওটা সন্ধেতারা। তারাটার দিকে নজর রেখে সে হাঁটছিল, হঠাৎ শিরীষগাছের নীচে চোখ পড়তে সে চমকে ওঠে। অন্ধকারে চোখদুটো আর একটু সেঁধিয়ে দিতে আরো হিম হয়ে যায় বল্টুর হাত-পা। পাশাপাশি শুয়ে আছে জীবনদা আর লবঙ্গদি। গল্পা শুনতে পায় লবঙ্গদির, তুমি আমারে এক্ষুনি এক্ষুনি কোথাও নে চলো।

জীবনদার গলা শোনে পরক্ষণে, কুনখানে যাব বলদিকিনি?

— সে আমি জানিনে কুনখানে। উই ডাকাত লোকটার আমার দিকে লজর পড়িছে।

— ঠিক আছে, দেখি কী করি।

পরক্ষণে দুটো শরীর একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে। ঠিক সাপের যেমন শঙ্খ লাগে, তেমনি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে যায় দুটো শরীর। ভয়ে, আতঙ্কে জিব শুকিয়ে আসে বল্টুর। সে নিঃশব্দে দৌড় লাগায় তাদের ভাঁটার দিকে। দাওয়ায় বসে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে হাঁপাতে থাকে।

কতক্ষণ পরে জানে না, জীবনদা ফিরে এসে বলল, কীরে, কী হয়িছে তোর?

নিঃশব্দে মাথা নাড়ে বল্টু। বলে, না, কিছু তো হয়নি।

বলল বটে, কিন্তু তাকাতে পারে না জীবনদার মুখের দিকে। এদিক-ওদিক তাকিয়েও দেখতে পায় না লবঙ্গদিকে। তবে যে লবঙ্গদি তখন বলল বাড়ি যাবে, কিন্তু যায়নি কেন? একটু আগের দেখা দৃশ্যটা ওর চোখমুখ শরীর উষ্ণ করে তুলছিল। ঘাড় নেড়ে বলল, না কিছু হয়নি।

জীবনদা তেমন গা করে না। বালে, তাইলে? অমন করছিস কেন? শরীর খারাপ নিকি?

৫

কয়েকদিন পরে এক সকালে উঠে বল্টু আবিষ্কার করে, বিছানায় জীবনদা নেই। অথচ এমন তো হয় না, রোজ ভোর থাকতে জীবনদা তাকে ডেকে তোলে, অ্যাই বল্টু, ওঠ্, রোদ যে চনমন করে উঠল।

আর আজ চারপাশে রোদ সত্যিই চনমন করে উঠেছে। বেলা একটু বাড়লে বুঝতে পারে, তাকে না বলে কোথাও গেছে জীবনদা, হয়তো মালিকের বাড়ি, কোনো ফাইফরমাশ আছে।

বেলা আরো বাড়লে এসে পড়ে নকুলদা। ধপাস ধপ শব্দ শুরু হয়ে যায়, কিন্তু জীবনদার দেখা নেই। সেদিন লবঙ্গদিও কাজে আসেনি। নকুলদা হঠাৎ বলল, ওরা পেলিয়ে গেছে।

বল্টুর বুক ছাঁত করে ওঠে, কারা পেলিয়ে গেছে?

কারা আবার? নকুলদা খিকখিক করে ওঠে, তোর স্যাঙাত আর স্যাঙাতনি।

শুনে হাঁ হয়ে যায় বল্টু, সেদিন পুকুরঘাটে দেখা দৃশ্যটা চলকে ওঠে মনের মধ্যে, শিরশির করে ওঠে তার সারা শরীর, পরক্ষণেই বুকের ভেতরটায় একগলা আকাশ। তাহলে সে একা-একা ইটভাঁটায় থাকবে কী করে?

মালিক গণপতিবাবুর চিৎকার কানে যায়, অ্যাই বল্টু, ইট মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়ো। যা, যা, দাঁড়িয়ে থাকলে খোরাকি জুটবে?

বল্টু আবার রোদ-শুকনো ইট মাথায় নিয়ে হাঁটে। কিন্তু তার মাথা থেকে ভাবনা ছাড়ে না, রাতের বেলা খাবে কী! সে ফুঁ দিয়ে উনুনে আগুন জ্বালাতে পারে, কিন্তু হাঁড়িতে চাল ছড়িয়ে কখন ফুট-আসে তা তো জানে না। আর না-খাওয়া হলে পরদিন সকালে তো লবঙ্গদি এসে বলবে না, এই নে বল্টু, রুটি আর গুড়। কাল রেতে তো খাসনি কিছু।

বল্টুর চোখ ফেটে প্রায় জল আসে। মালিক গণপতিবাবুর কানে কথাটা যেতেই খেঁকিয়ে উঠে বলেন, কেন যেমন থাকতিস তেমনি থাকবি। অ্যাদ্দিন থাকলি, দুটো চাল-ডাল ফুটিয়ে নিতে শিখিসনি? আর ব্যাটা জীবনেরও আক্কেল তেমনি, আমাকে যাবার সময়ে ডুবিয়ে দে গেল! নেমকহারাম, নেমকহারাম।

—তাহলে নকুল থাকুক। গণপতিবাবু কোনো উপায় না দেখে শেষমেশ বললেন।

নকুলের ঘরে বউ-বাচ্চা আছে, তবু সে নিমরাজি হয়ে গেল কী ভেবে, কিন্তু তাতে কোনো সুরাহা হল না বল্টুর। নেহাত ভালোমানুষ নকুলদা যে সন্ধের পর আর মানুষ থাকে না সেটা ক-দিনেই বুঝে গেল বল্টু। সন্ধের পর ইটভাঁটা গুনশান হয়ে যেতে নকুলদা ভাঁড় উপুড় করে ঢালতে থাকে তার গলায়, তারপর কখনো হি হি করে হাসে, কখনো বুঁদ হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকে বিছানায়। কখনো সন্ধেবেলা বলে, আমি বাড়ি যেতিছি বল্টু, ভোর-ভোর ফিরে আসব। খবরদার, মালিককে যেন বলিসনি।

বল্টুর আর উনুন জ্বালানো হয় না, ভাত রাঁধা হয় না। রাতের পর রাত উপোস চলতে থাকে। কখনো দুটো-একটা শুকনো রুটি জোগাড় করে তাই খেয়ে তার উদরপূর্তি। নকুলদা বলে, নতুন রাস্তার মোড়ে কাশীর দোকান থিকে পাউরুটি কিনে এনে রাখবি। খিদে পেলেই খেয়ে নিবি।

কিন্তু পাউরুটির পয়সা চাইতে গেলে মালিক তাকে এই মারে তো সেই মারে। বলে ওঠে, বাবুর আবার পাউরুটি খাওয়ার শখ হয়েছে। যা ভাগ।

সেই একা, নিঃসঙ্গ রাত্রিগুলো বল্টুর বড়ো দীর্ঘ মনে হয়। প্রায়ই ঘুম আসে না তার চোখে। চারপাশে একটানা ঝিঁঝির শব্দে, তার সঙ্গে ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া শোঁ শোঁ আওয়াজ মিশে এক অদ্ভুত ছমছমে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বল্টুর গা শিরশির করতে থাকে। তার মনে হয় একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে তার নিঃশ্বাস।

জীবনদার উপর খুব রাগ হয়ে যায় তার, ক্ষোভ জমে ওঠে লবঙ্গদির উপরও। তাকে এই শুনশান মাঠের মধ্যে ফেলে দু-জনে কী নিষ্ঠুরের মতো পালিয়ে গেল হঠাৎ। একবারও ভাবল না বল্টুর কথা! বল্টু যে কীভাবে এই গা-ছমছমে ঝুপড়ির ভেতর রাত কাটাবে তা একটুও চিন্তা করল না! বল্টুকেও তো ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারত!

দিনমানে বল্টুর কোনো অসুবিধে হয় না, কিন্তু রাতের বেলা তেমনই শুনসান। ক-দিন দু-এক পশলা করে বৃষ্টি হয়ে যেতে গণপতিবাবু একেবারে তেরিয়া হয়ে উঠলেন তাদের উপর। হাত লাগা, হাত লাগা। সব ইটগুলো যে জলদাগি হয়ে গেল। এবারে ডাহা লোকসান।

নকুল অনেকদিনের দফাদার। মালিককে বলল, খুব ফুর্তিতে ছিল তো সবাই। হাত তো একটু কম চলবেই। আর ক-টা দিন গেলেই ভাঁটায় আগুন লাগিয়ে দেবো।

পাঁচ-পাঁচখানা ভাঁটা, তা হাঁ খুব কম নয়? সবাই মিলে চেষ্টা করেও তিনখানা ভাঁটা প্রায় ভরো-ভরো হয়ে উঠল। আরো দু-খানায় ভরতে অন্তত পাঁচ-সাতদিন। ওদিকে লিডার মাঝেমধ্যে এত্তেলা পাঠায়, কই গণপতি, তোমার জনগণ তৈরি হল? আমার আকাশ ছোঁয়া যে আটকে আছে জনগণের অভাবে।

গণপতিবাবু চেঁচিয়ে তাড়া দিতে থাকেন, কইরে, হাত চালা। জনগণের সমর্থন ছাড়া কি লিডার আকাশ ছুঁতে পারে?

সারা ইটভাঁটায় গণ-মার্কা ইট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে রাশি রাশি। অতগুলো হাতেও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না অতবড়ো ভাঁটা। সবাই মিলে গাছিতে সাজিয়ে ফেলতে থাকে ইটের পাহাড়। নকুল বলে, মালিক, চেষ্টা তো করতিছি, কিন্তু হাত আর চলতিছে না। জীবনটা এরকম ডোবাবে তা কী জানতাম?

টানা রোদ্দুর চলছে ক'দিন ধরে, তবু গণপতিবাবুর মুখের বিরাম নেই। শালারা পরব মারাচ্ছে। শালারা বোধহয় মরেছে সব।

পরক্ষণে নকুলের দিকে তাকান। বলেন, ওরা নেই তাতে কী হয়েছে। তুই বল্টুকে নিয়ে ভাঁটার ভেতর ইটগুলান সাজাতি লাগ। সারাদিনে চার-পাঁচশো ইট সাজিয়ে ফেললেও কম কী! তোদের রোজ তাহলে কাটান যায় না।

নকুল আর বল্টু মালিকের হুকুমমতো ইট সাজায়, যত না নকুল বইল, তার চেয়ে বল্টু ঢের বেশি। বইতে বইতে প্রায় সন্ধে। গণপতিবাবু ঘরে ফিরে যাওয়ার পর হঠাৎ কোত্থেকে মেঘের ঝিলিক। বল্টু আর নকুল তখন ঝুপড়িতে এসে একটু জিরোচ্ছে। ঝিলিক দেখে বাইরে বেরোয়, দ্যাখে, আকাশে মেঘ পাথর হয়ে জমে আছে। বিজলির চমক ফালাফালা করে দিচ্ছে

ইটভাঁটার শরীর। নকুল বলল, বিষ্টি নামবে, বল্টু। তেরপল বার কর্। নইলে সব ইট জলদাগি হয়ে যাবে।

বলতে বলতে ছপ্পর ফুঁড়ে বৃষ্টি। একেবারে মুষলধারে। ত্রিপল বার করে গাছি দিয়ে সাজানো ইটভিজে একশা। যেমনি ইটগুলো, তেমনি বল্টু আর নকুল। কাল গণপতিবাবু এসে এই ভিজে ইট দেখলে কী করবেন কে জানে! ভয়ে, হিম-হাওয়ায় বল্টুর সমস্ত শরীর জুড়ে শীত নামল। সারারাত গায়ে চট জড়িয়েও তার শীত কমে না। তার তখন সমস্ত শরীর জুড়ে জ্বর। ওদিকে নকুলদা ভাঁড় উপুড় করে ঢকঢক করে গলা ভিজোচ্ছে তার শীত কমাতে। কিছুক্ষণ পরে সে আর মানুষ থাকল না।

গণপতিবাবু পরদিন ইটভাঁটায় এসে নকুলকে এই মারেন তো সেই মারেন। তিনদিনের রোজ তো কাটান গেলই, আরো তিনদিনের রোজ কেটে নেবেন বলে শাসালেন।

বল্টু এসব কিছুই জানতে পারল না, সে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে ঝুপড়ির তক্তপোশে। দিনের কাজের পর সন্ধের ঝোঁকে নকুল যে কোথায় উধাও হয়ে যায় তা কে জানে। মাঝে মাঝে লাল চোখ মেলে বল্টু রাতের বেলা চারপাশে কিছু যেন খোঁজে, কিন্তু না পেয়ে আবার চোখ বোজে। দিনের বেলা আবার ধপাস ধপ শব্দ শোনে। দু-তিনদিন তার খাবার জন্য একটা রুটিও জোটেনি।

ক-দিন পরে জ্বর কমতে সে উঠে বসতে যায়, কিন্তু বুঝতে পারে ভীষণ দুব্‌লা হয়ে গেছে তার পা-দুটো। ঠকঠক করে কাঁপছে শরীর।

পরবের দিন শেষ হলে একদিন হইহই করে বাকি লেবাররা ভাঁটার কাজে যোগ দিতেই দিনমানটা আবার সরগরম। সারাদিন একসঙ্গে অনেকগুলো ফ্রেমে তৈরি হতে থাকে গণ-মার্কা ইট্, তারা জনগণ হয়ে চোখ মেলে শুয়ে থাকে সার সার। তাদের রোদ খাওয়ানোর চেষ্টা চলে বৃষ্টির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

আস্তে আস্তে ভরে উঠছে ভাঁটার মুখ। বল্টুকে টলমল পায়ে ইটভাঁটায় দেখে গণপতিবাবু খেঁকিয়ে ওঠেন, এই যে, রাজপুত্তুরের জ্বর থামল। তা নে, কাজে হাত লাগা। কাজ না করলি খাবি কি? তোর বাপ তো তোকে জন্ম দিয়েই খালাস। আর খবর নেয় না!

মাথায় ইট তুলতে গিয়ে বল্টু দেখল তার চারপাশে অন্ধকার। এক-দুই করে চারখানা ইট মাথায় তুলে এলোমেলো পায়ে ভাঁটায় গিয়ে ইট সাজাতে থাকে। ভাঁটার এখন গলা অবদি ইট, তবু ভাঁটার হাঁ-খানা এত বড়ো যে তার খিদে মেটে না। তারা দু-জনে যন্ত্রের মতো সেই খিদে মেটাবার জন্য প্রাণপণে খাটতে থাকে। কখন আবার বৃষ্টি নেমে পড়ে তার ঠিক কী! বল্টুর পেছনে দাঁড়িয়ে কে একজন বলল, আটখানা ইট তোল, বল্টু। নইলে মালিক লিখে রাখছে। তোর রোজ আদ্দেক হয়ে যাবে।

আটখানা ইট মাথায় তুলে বল্টুর মনে হল সে আর ভাঁটা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারবে না। হাঁটতে গিয়ে মনে হয় তার সামনে একটা বিশাল মাঠ, সেই মাঠ বরাবর হেঁটে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, পথ আর ফুরোচ্ছেই না। এক-পা, এক-পা করে কতক্ষণ সে হেঁটে যায়। তারপর সে হঠাৎ মাথায় আটখানা ইটসমেত হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

বল্টুর পেছনেই ছিল নকুল, মাথায় ইট নিয়ে সে তুলতে গেল বল্টুকে, কিন্তু পারে না। বল্টুর শরীর কেমন নিস্পন্দ, নিথর। সে চেঁচিয়ে ডাকল, বল্টু, বল্টু, এই বল্টু...

বল্টুর চোখদুটো বোজা। তার শরীরের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে কাঁচা গণগুলো। সেই জনগণ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে দেখছে বল্টুর নিস্পন্দ শরীরটার দিকে। তার শ্বাসটাও পড়ছে না।

নকুল বলল, বল্টু মরে গেল যে মালিক?

গণপতিবাবু কিছুক্ষণ নিচু হয়ে দেখলেন বল্টুর শরীরটা। তারপর বললেন, গেছে, ভালো হয়েছে। ওর বাপটা তো আর টাকা দিত না? এমন অপোগণ্ডটারে নে আমিই বা কী করতাম? কিন্তু কী অলক্ষুণে ছেলে রে বাবা। কাল ভাঁটায় আগুন লাগানো হবে, আর অমনি অমনি ব্যাটাচ্ছেলে মরে গেল। মরবার আর জায়গাও পেলি নে, একেবারে ভাঁটার মুখে। বেলাশেষে এ কী বিটকেল কাণ্ড!

বাকি সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, এখন ওকে কে আবার শ্মশানে পোড়াতে যাবে!

গণপতিবাবু বিড়বিড় করতে থাকেন, এ কী অনাছিষ্টি কাণ্ড রে বাপু। পুলিশে-টুলিশে খবর পেলে আবার কী হাঙ্গামা হবে কে জানে? এখন এই উৎপাত নিয়ে কী করি আমি!

এমন একটি অস্বাভাবিক ঘটনায় ভাঁটার কাজ বন্ধ। সবাই জটলা করছে এককোণে দাঁড়িয়ে। ভাঁটার ইট সাজানো প্রায় শেষ। লেপা-পোঁছা করে এখন আগুন লাগালেই হয়, কিন্তু কোনো কাজই করা যাচ্ছে না বল্টুর সমস্যার সমাধান না-হওয়া পর্যন্ত।

শেষে জট ছাড়ালেন গণপতিবাবুই, তাইলে এক কাজ করা যাক! দাহ যখন করতেই হবে তবে ভাঁটার ভেতর ওকে শুইয়ে দিই। তারপর তোরা আগুন লাগিয়ে দে।

বলে নিজেই বল্টুর একটা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ভাঁটার উপরে। দু-চারটে ইট সরিয়ে বল্টুর দেহটা রাখেন, তারপর দ্রুত হাতে ইট চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, এবার লেপা-পোঁছা করে ফ্যাল্। তারপর আগুন লাগা, দাহটা হয়ে যাক।

পরক্ষণে বললেন, লিডার এরকম কত মানুষ পুড়িয়ে তবে আকাশ ছুঁতে চাইছে।

দেবী

রবিশংকর বল

মানিনীর কথা। তবে এইভাবে শুরু হোক।

বৃষ্টি ও তুষারপাতময় এক কাহিনীর বাক্যগুলির মধ্যকার শূন্যতার ভিতরে। তারপর কথাগুলি মুছে যাবে। মুছে যাওয়াই তার নিয়তি। মুছে যাওয়ার ভিতরেই জেগে থাকে মানিনী। কেননা সে রাত্রির দেবী। বিস্মৃতিরও। বিস্মৃতিই তো শেষপর্যন্ত জেগে থাকে।

কঠিন হয়ে যাওয়া মানিনীর মৃতদেহ তখন মেঝেতে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। থানার অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বুঝতে পারেননি?'

'কী?'

'সুইসাইডের মোটিভ?'

'না।'

'হাজব্যান্ড হিসাবে কিছু বুঝতে পারেননি?'

'আমি মানিনীর স্বামী নই।'

'তাহলে?'

'মানিনী আমার বন্ধু।'

'হোয়াট ডু ইউ মীন?'

'ইংরেজি বলছেন কেন?'

'মানে?'

'যা জানতে চান, তা তো বাংলাতেই বলা যায়।'

'আপনি বাংলাভাষাপ্রেমী?' অফিসার হাসেন।

'মানে?'

'বাংলাভাষা ভালোবাসেন?'

'আপনি?'

'আমিও ভালোবাসি। তবে কিনা—'

'আমি ভালোবাসি না।'

'বুঝলাম না।'

'বাংলাভাষা আমার নিয়তি? ভালোবাসা, ঘৃণার কথা অবাস্তব।'

'ভাষা আপনার নিয়তি?'

'আপনি ভুল করছেন।' রঞ্জন হাসে। 'আপনি একজন মহিলার জীবনের নিয়তি তদন্ত করতে এসেছেন। ভাষা কার নিয়তি, তা নিয়ে আপনি কী করবেন?'

'না, আমি অবাক হচ্ছি, আপনার বাড়িতে এইরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল— ডেডবডি এখনো মেঝেতে পড়ে আছে—আপনি বাংলাভাষা নিয়ে—'

'আমি ওভাবে পড়ে থাকলে মানিনী রূপসী বাংলা থেকে কবিতা পড়ত।'

'কী?'

'রূপসী বাংলা। নাম শোনেননি?'

'পুলিশদের কি আপনি অশিক্ষিত ভাবেন?'

'আমি কিছুই ভাবি না। এই সুইসাইডের ব্যাপারে আপনার যা জানার আছে জিজ্ঞাসা করুন।'

'আপনি ওনার হাজব্যান্ড নন?'

'না।'

'পাড়ার লোক তো বলছে।'

'পাড়ার লোককে বিশ্বাস করবেন, না আমাকে, তা আপনার ব্যাপার।'

'তাহলে উনি এ বাড়িতে থাকতেন কেন?'

'বললাম তো, আমার বন্ধু।'

'একটু অস্বাভাবিক না?'

'কী?'

'একজন মহিলা—আপনার বন্ধু— আপনার বাড়িতে থাকতেন—এসব তো ঠিক—'

'মেনে নিতে পারছেন না?'

'মানিনীদেবী তো প্রায় দু-বছর আপনার বাড়িতে থাকতেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'দু-বছর ধরে শুধু বন্ধুত্ব?' অফিসার সিগারেট ধরাতে ধরাতে হাসেন।

'আপনি যা চাইছেন, তা আছে।'

এইসময় দু-জন পুলিশ এসে ঘরে ঢোকে। মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে নিয়ে যাওয়ার জন্য অফিসার তাদের নির্দেশ দেন।

'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন—।' অফিসার হঠাৎ গলা খাঁকারি দেন।

'মানিনীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক।'

'বলুন।'

'আপনি যা জানতে চাইছেন, সেটাই বলি। শারীরিক সম্পর্ক ছিল আমাদের। বিছানাতেও গিয়েছি বেশ কয়েকবার।'

অফিসার হেসে ওঠেন।

'তারপরেও আপনারা শুধু বন্ধু?'

'আপনার আপত্তি আছে?'

'স্বামী ছাড়া কেউ একজন মহিলার সঙ্গে বিছানায় যেতে পারে?'

'কেন, খদ্দেররা পারে না?'

'আপনি তো খদ্দের নন। বলছেন বন্ধু।'

'হ্যাঁ।'

'বন্ধুর সঙ্গে বিছানায়?

'অফিসার—'

'বলুন।'

'আপনি কল্পনা করতে পারেন, দু-জন নারী-পুরুষ পরস্পরকে ছুঁয়ে শুধু ঘুমিয়ে পড়তে পারে?'

'মানে?'

'আমরা সেভাবেই ঘুমিয়ে পড়তাম।'

'বাদ দিন। এসব শুনে তো আমার কোনও লাভ নেই। মানিনীদেবী কেন আত্মহত্যা করলেন বলে মনে হয় আপনার? অবশ্য আত্মহত্যা কী না, সে সম্পর্কে তো আমরা এখনও সিওর নই। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না আসা অবদি—'

'মানিনীকে খুন করা হয়েছে বলে আপনি সন্দেহ করছেন?'

'আমি কিছুই ভাবছি না। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকেই সব জানা যাবে। যদি আত্মহত্যা হয় — আপনি জানেন সুইসাইডের কারণ?'

'না।'

'কিছু বুঝতে পারেননি?'

রঞ্জনের আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তার মাঝেই মানিনীকে স্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে গিয়েছে কয়েকজন।

সেদিন রাতে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছিল, যে সকালে মানিনীর ঝুলন্ত শরীর আবিষ্কার করা হয়। তার মনে আছে। রাত্রির দেবী, বিস্মৃতির দেবী পূর্ণিমার দিন এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

মানিনীর কথা ভাবতে গেলে মাথার ভিতরে প্রাচীন ভাষার মর্মর শোনা যায়। যেন এক লুপ্ত পূজাবিধির ভাষা — সেই ভাষায় বলতে হবে মানিনীর কথা। না হলে মানিনীকে ছোঁয়া যাবে না। সে তো রাত্রির দেবী, বিস্মৃতিরও।

বহু দূরে, লিসবনে চলিয়া গিয়াছিলে তুমি। বিংশতি বছরের ওপারে দাঁড়াইয়া তোমার কথা আর মনেও পড়িত না মানিনী। আমি তো পৃথিবীর কোথাও যাই নাই, শহর ছাড়িয়া রাজ্যের ভিতরেও দূরে কোথাও যাওয়া হয় নাই, তুমি জানিতে মানিনী, নিজের তৈরি গোলকধাঁধার ভিতর বসিয়া থাকিতেই আমি আনন্দ পাই। আমার যাহা কিছু জানা হইয়াছে, সবই গ্রন্থ হইতে। তুমি চলিয়া যাইবার পর মানচিত্রে ফের লিসবনকে খুঁজিয়া দেখিয়াছিলাম।

মানচিত্রে লিসবন তো উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলের একটি বিন্দু। তুমি যে লিসবনে গিয়াছ, তাহার রহস্য তো ওই বিন্দুর ভিতরে নাই। তুমি চলিয়া যাইবার পর, কেন যে লিসবনের কথাই ভাবিতাম আমি, আর মনে পড়িত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রক্তসন্ধ্যা' কাহিনীটির কথা। অনেকদিন পরে একটি উপন্যাসে তাহাকে দেখিতে পাইলাম, যে লিসবনকে আমি খুঁজিতেছিলাম। সেই উপন্যাস শুরু হইতেছে এইরূপে — এইখানে সমুদ্র শেষ হইল আর পৃথিবীর শুরু। বর্ণহীন শহরটির উপর বৃষ্টি পড়িতেছিল। হাইল্যান্ড ব্রিগেড নামে একটি জাহাজ আসিয়া পৌঁছিল লিসবনে। চারিটি নামে ডাকা হয় লিসবনকে — লিসবোয়া, লিসবন, লিসবনে,লিসাবন; আর উচ্চারণের দোষে আরো বিকৃত নাম তো আছেই। ষোলো বছর পর দেশে ফিরিলেন রিকার্ডো রিস। লিসবনে পুরোনো সঙ্গীকেই ফিরিয়া পাইলেন তিনি, কবি ফার্নান্দো পেসোয়া, সাতদিন পূর্বে যাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে। মৃত পেসোয়া রিকার্ডো

রিস-এর সঙ্গে ছায়ার মতো চলিতে লাগিলেন। আদতে তাঁহারা দুইজনেই তো এক। রিকার্ডো রিস নামেও কবিতা লিখিতেন পেসোয়া। আমি বুঝিতে পারিলাম, কোন রহস্যময় নগরীতে তুমি চলিয়া গিয়াছ, সেইখানে একজন মানুষ নানা নামে, নানারূপে বাঁচিয়া থাকে।

কুড়ি বছরের বিস্মৃতির কুয়াশার ভিতর দিয়া তুমি আসিয়াছিলে বতিচেল্লির সেই ছবির মতো; ভেনাস যথায় সমুদ্রের অন্তস্তল হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। তুমিও তো আসিয়াছিলে সমুদ্র অতিক্রম করিয়াই, হে আমার রাত্রির দেবী।

সেদিন প্রাতঃকালে গৃহের সম্মুখের ক্ষুদ্র উদ্যানটিতে বসিয়া পুষ্পবৃক্ষগুলির মূলদেশে মৃত্তিকা আলগা করিতে করিতে জলসিঞ্চন করিতেছিলাম, তখনই মরিচাগ্রস্ত লৌহনির্মিত সদর দরজা খুলিবার শব্দ শুনিলাম। পরে একদিন তুমি বলিয়াছিলে, 'ভারি আশ্চর্য শব্দ তো গেটটির। যেন কেহ বেহালায় চকিত ছড় টানিতেছে।'

আমি মুখ তুলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছিলাম, যেমন মানুষ আপন হন্তারককে দেখিলে শিলীভূত হয়।

মনে আছে কোনও কথা বলিতে পারি নাই, দ্রুত তোমার সম্মুখে গিয়া তোমার দুই কর আমার করদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছিলাম। ভিতরে কেহ কহিতেছিল, কথা কহিয়ো না পুরুষ, কথা কহিয়ো না। তোমার দুই চক্ষুর দিকে তাকাইয়া আমার শুধু নৌকাগাত্রে সিন্দুরে অঙ্কিত চক্ষুর কথা মনে পড়িয়া গেল, অনন্তপ্রবাহিনী গঙ্গার ঢেউ যে চক্ষুর উপর আসিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।

মানিনী, তোমার কি স্মরণে আছে, কুড়ি বছরের ওই পারে একটি সন্ধ্যার কথা? সেই সাতের দশকের অন্তিমদিকে, তখনও সন্ধ্যাগুলি আসিত প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অখিলবন্ধু ঘোষের কণ্ঠ বাহিয়া। একদিন তুমি আমাদের গৃহের বারান্দায় দাঁড়াইয়া গাহিতেছিলে, 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তুমি ছুটি দেখিয়াছ?'

তুমি বলিলে, 'এই গানে মৃত্যু যে কত সৌন্দর্যের বিষয় হইয়াছে।'

'মৃত্যুকে তুমি কীরূপে দ্যাখো?'

সেই সন্ধ্যায় তোমার কী যে হইয়াছিল, জিহ্বা দিয়া আমার দুইটি চক্ষু লেহন করিতেছিলে, আমি অন্ধকার ও লালায় জর্জরিত হইয়া তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম, আর তুমি ফিসফিস করিয়া বলিয়াছিলে, 'অক্ষিদ্বয় যদি আমি গিলিয়া ফেলি?'

'কী হইবে?'

'আমার জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া তাহারা যদি সন্তানরূপে বড়ো হয়? একদিন তাহাদের আমি প্রসব করিব।'

'তুমি উন্মাদ।'

'চক্ষুর গভীরেই তো মন লুকাইয়া থাকে। সেই মন হইতে সন্তান জন্মিতে পারে না?'

সেই সন্ধ্যায় আমরা প্রথম জানিয়াছিলাম, শরীর কীরূপে রণক্ষেত্র হইয়া উঠে। প্রতিটি যুদ্ধের পরবর্তীতেই শান্তিপর্ব আসে। বেশ কিছুদিন তোমার দেখা নাই। তাহার পর তোমার পত্র

পাইলাম। ততদিনে তুমি ড বিজয় রায়ের স্ত্রী হইয়া লিসবনে চলিয়া গিয়াছ। আমি কিছুই ভাবি নাই। তুমি তো জানো মানিনী, আমি বিশ্বাস করি, জীবনে যাহা যাহা ঘটিবে, তাহার প্রত্নলেখ কোথাও রহিয়া গিয়াছে। আমি জানি, আমরা কেহই সেই আদিলিখনের বাহিরে যাইতে পারিব না। নক্ষত্রের সংকেত আমাদের মানিয়া চলিতে হইবে। তাই তোমার দেশান্তরের খবর পাইয়া আমি মানচিত্র খুলিয়া আরও একবার দেখিয়া লইয়াছিলাম, লিসবন শহরটির অবস্থান কোথায়? ইহার অতিরিক্ত কিছু জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না।

আশ্চর্য হইলাম, যখন একদিন তুমি বলিলে, 'এখন হইতে তোমার সহিত আমি থাকি।'

'কেন?'

'আমি ভালো থাকিতে চাই।'

'আমার সহিত থাকিলে ভালো থাকিবে?'

'হুঁ। তোমার আপত্তি নাই তো?'

'আপত্তি কেন থাকবে?'

'চারিপাশে লোকজন তো...'

'জনমতে আমার কখনো কি তেমন বিশ্বাস ছিল মানিনী?'

'আমরা কিন্তু বিবাহ করিব না।'

'আমি তাহা চাহি না।'

'কেন?'

আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, 'এই বয়সে বিবাহ করিবার মজা পাইব না। পাইলে করিতাম।'

'কীরকম মজা?'

'গাত্রহরিদ্রা, অব্যূঢ়ান্ন, শোলার মুকুট, সাতপাকে ঘোরা — ইহাতে বিস্তর আনন্দ হয়। সেই আনন্দ গ্রহণ করিবার মতো মন তো আর নাই।'

'এইসব রীতিনীতি তোমার ভালো লাগে?'

'কেন লাগিবে না? ইহার ভিতর আমার দেশের কথাই তো লেখা আছে। এইসব লোকাচার আমাদের কত জন্মের স্মৃতিকে ধারণ করিয়া আছে।'

তুমি আমার হাতের উপর হাত রাখিয়াছিলে। বলিয়াছিলে, 'তোমার সঙ্গে থাকিলে আমি এইরূপ আনন্দে বাঁচিয়া থাকিতে পারিব।'

মানিনী, তোমার সহিত আমার নতুন দৈনন্দিন জীবন শুরু হইল। ছেলে দীপনকেও তুমি লইয়া আসিয়াছিলে। আমাদিগের তিনজনের বন্ধনহীন সংসারজীবন শুরু হইল। বহুদিন পর এ-বাড়িতে নারীর হাতের ছোঁয়া লাগিল। মা বাঁচিয়া থাকিলে বলিতেন, 'অন্তু, এইবার তোর জীবনে লক্ষ্মীশ্রী আসিল।'

তুমি নতুন করিয়া বাড়িটিকে সাজাইলে। আমি দেখিলাম, সেই গান সারা বাড়িতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে —'আমার এ ঘর বহু যতন করে, ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।'

দুইটি বছর, মানিনী, আমাদের জীবন যেন এক ব্রতকথার মতো উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মনে হইত, কাংড়া উপত্যকার অনামা কোনো শিল্পীর আঁকা ছবির দিকে তাকাইয়া আছি। নানা রং সেই পটে উৎসব হইয়া উঠিয়াছে। তুমি বলিতে, 'ইহা আমাদের বন্ধুত্বের সংসার।'

আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'বন্ধুত্ব কী, তুমি জানো মানিনী?'

তুমি তখন ড্রেসিং টেবিলের দর্পণের মুখোমুখি বসিয়া চুল আঁচড়াইতেছিলে, আমার মনে আছে। আমি তোমার প্রতিবিম্বের দিকেই তাকাইয়াছিলাম। প্রতিবিম্বের একাকিত্ব আমাকে সর্বদা সম্মোহিত করিয়াছে।

'জানিতে চাহিয়ো না অন্তু। বন্ধুকে শুধু অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়ো। গুণকে যখনই জানিতে চাহিবে, দেখিবে; জানিতে জানিতে সেই গুণকে যে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছ। বিজন আর আমি এইজন্যই একসঙ্গে থাকিতে পারিলাম না। আমরা কে কাহাকে কতখানি বুঝি, তাহা বিচার করিতে করিতে একদিন দেখিলাম, পরস্পরকে বুঝিবার জন্য যে অনুভব লাগে, তাহা আমাদের মধ্যে নাই। একদিন আমাদের মধ্যে ঝগড়াও বন্ধ হইয়া গেল। পড়িয়া রহিল নির্লিপ্তির হাড়গোড়। আমি তাই চলিয়া আসিলাম অন্তু। যাহাকে কিছু দিতে পারিব না তাহার সহিত...'

'আমাকে তুমি কী দিয়াছ?'

'জানি না। কিন্তু নিজেকে আমি যা দিতে পারিতেছি, তাহাই তোমার কাছে পৌঁছিবে। আমি জানি।'

'কী দিতে পারিতেছ আপনাকে?'

'বাঁচিয়া থাকিতে ভালো লাগে—এই সামান্য কথাটুকু।'

মানিনী নিজেকে যে কথা দিয়াছিলে, তাহা এইভাবে ফিরাইয়া লইতে হইল কেন?

একটি চিঠি রাখিয়া গিয়াছিলে আমার জন্য। চিঠিটি পুলিশের হাতে আমি দিই নাই। তাই কয়েকটি শব্দের ভিতরে তোমার আত্মহত্যার কারণ তো খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। হয়তো পাওয়া যাইতেও পারে। কিন্তু সেই কারণে পুলিশের কী প্রয়োজন? তুমি লিখিয়াছিলে, 'আমার জন্য শোক করিয়ো না। একটি জীবন নিজের ভিতরে কতগুলি জীবনকে বহন করিতে পারে? তোমার জন্য এই প্রশ্নই রাখিয়া গেলাম। —মানিনী।'

মানিনীর কথা এভাবেই শেষ হোক।

মানিনীর মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে দীপনও ফিরে যায় লিসবনে, তার বাবার কাছে। রঞ্জন দীপনকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছিল। দীপন তার হাত ধরে বলেছিল, 'সরি আঙ্কল।'

'কেন?'

'আপনি আবার একা হয়ে গেলেন।'

'মানিনী আমার জন্য একটা প্রশ্ন রেখে গেছে।'

'কী?'

'তোমার সঙ্গে আবার কখনও দেখা হলে — তখন তুমি অনেক বড়ো হয়ে যাবে — তখন না হয় বলা যাবে।'

আমদরবার

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

আমের দিন এ-বছর এতই প্রবল যে আম মাখি, আমে ঘুমোই, আম আম নিপাত যাই। সেই সঙ্গে প্রকৃতি দিয়েছেন ভয়ংকর তাপ। জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টির ব্যবস্থা নেই। অকালে আম পেকে যাচ্ছে। বেশিরভাগই দরকচা প্রাপ্ত হচ্ছে। খদ্দের সন্দ করছে, কারবাইড নাকি! অথচ গাছ-পক্ক আম লজ্জায় মরে যাচ্ছে।

এই আম-পক্ক মাসে পুরভোটে দণ্ডায়মান প্রার্থীরা শুধু গণনার অপেক্ষায়। কাঁচারা ভাবছেন, কৌশল তো একটাই। এখন সেটা যথার্থ কাজে লাগলে হয়। বড় কিংবা পাকা দলে অন্তর্ঘাত ও অন্তর্টিপুনি ছাড়া বাদবাকি কাঁচা এবং দরকচায় দোদুল্যমানতার চোখ ঠারা। শুধু গোঁজ প্রার্থীরা বৃষোৎসর্গের দেগে দেওয়া ষাঁড়। এসবেরই ছকের মধ্যখানে এই শিল্পতাড়িত মহকুমার চোদ্দোটি পুরসভার ভোট নামছে। মহকুমাশাসক অ-বঙ্গসন্তান আই.এ.এস.। কাঠি-দেওয়া কূট নিম্নস্থ অফিসাররা বলেন, আই অ্যাম সেফ। তরুণ 'সেফ'-এর দল তীব্র আই.কিউ. বশত এসব বুঝে মুচকি হাসেন। কেননা তারা জানেন অধস্তনেরা অধিকাংশই বশংবদ অধমাধম। খুচরোখাচরা দু-একখানা বোকা বোকা, সৎ বিদ্রোহী যা আছে সে-সব সংখ্যালঘু। কিন্তু এই ভোট বাজারে পাকা আম এবারে এমনই সংখ্যাগুরু যে অন্য ফলেরা ম্রিয়মাণ। সেফ-অফিসার নিচয়ের চারপাশে ঘুরঘুর হিমসাগর, বোম্বাই, গোলাপখাস অনুগতদের বাইরে একজন শিবতোষ রায়, যিনি নেজারত ডেপুটি কালেক্টর বা এন.ডি.সি., পদে পদে অতীব আহত হলেও মোটেই হতোদ্যম নয়। তিনি সিনিয়রিটি বলে মহকুমা শাসকের পরের ধাপেই আছেন। নির্বাচনের সরকারি টাকা নয় এবং ছয় যাতে না করা যায় সে বিষয়ে তিনি একা কুম্ভ। দুর্ভাগ্যত তার মূল চাবিকাঠি নাজিরবাবু বীরেশ্বর পাল একইপ্রকার সৎ, দাম্ভিক এবং অতীব নিরেট। সরকারি টাকা মানে লোষ্ট্রবৎ, এই সাধুবাক্য তিনি প্রায়ই আওড়ান। তাঁর কর্তা এন.ডি.সি. কপচান বিবেকানন্দ, কার্ল মার্কস এবং আগাথা ক্রিস্টি। আগাথার সেই বচনটি তাঁর টেবিলের কাচের নীচে বড়ো বড়ো করে কম্পিউটার অক্ষরে লেখা, যেখানে অনেক অর্থ জড়িত সেখানে কাউকে বিশ্বাস না করাই বিধেয়। নাজির বীরেশ্বর থেকে থেকে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, — বাংলার বাঘ ম্যায় আশুতোষ, আমাদের বাঘ স্যার শিবতোষ।

প্রথমে ক-দিন ছিল গেলাপখাস। তার লেজ ধরে এল বোম্বাই। আর ইদানীং হিমসাগরের কাল। মাঝখানে ছিল টুকটাক মধুকুলকুলি, চাটুজ্যে ও পাতি স্বদেশিবর্গ। এখন বাজারজোড়া বোম্বাই আর হিমসাগর। বিহার-ইউপির চৌসা টৌসা এখনো নামেনি। এ-বছরের নির্বাচনে দলীয় কোন্দল বাড়তে বাড়তে ফুস্ করে মিলিয়ে গেল। কোনো এক নেত্রী কিন্তু কতক ইন্দিরা গান্ধী মেজাজে দলের লোকজনকে ভৃত্যসম ছাঁটকাট করে চলেছেন। মহিলা জানেন না কোথায় থামতে হয়। যেমন এই মহকুমা অফিসের নির্বাচনের দায়প্রাপ্ত অফিসার চণ্ডীদাস সেন জানেন না থামতে হয় কোথায়। তাঁর কথাতেই 'সেফ' মহকুমাশাসক যে চলেন এ-কথা সুচর্চিত। চণ্ডী প্রতি নির্বাচনের আগে দাড়ি রাখেন যদিও নাকি একদা বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি

করতেন। চণ্ডীদাস থামতে না জানার কারণে নির্বাচনী স্বার্থে ভুরি ভুরি মোটা টাকার ভাউচার বানান তো বানানই। কম্পিউটার, প্রোজেক্টর, জেরক্স মেশিন, কী নয়। সবেতেই মহকুমাশাসক নড করেন। জুলেপুড়ে মরেন এন.ডি.সি. রায়সাহেব। তস্য অবতংস নাজিরবাবু। তিনি ঘন ঘন প্রতিবাদী নোট দেন। চণ্ডী মিটিমিটি হাসেন। বড়কর্তা সে-নোট নিপাতে পাঠান। নির্বাচন নামে এক ভাগাড়ে শকুনতাণ্ডব অব্যাহত থাকে। বাজারে আমের রমরমার পাশাপাশি নির্বাচনী খাত থেকে অবৈধ প্রচুর কেনাকাটা হয়। এখন হিমসাগর চলছে। সামনে ল্যাংড়া। তারপরেই বিধানসভা নির্বাচন। তার মধ্যে সব পুরবোর্ড গড়ে যাবে। সেফ অফিসার আরো সেফ হয়ে স্থানান্তরে পদোন্নতি পাবেন। পাশে ঘুরঘুর-করারা পাবে স্পেশাল পোস্টিং। সংখ্যাগুরু এবং লঘুদলেরা নতুন ভোটার তালিকায় এসে গেলে কাজের দিকে সপ্রেম চাহনিতে চেয়ে থাকবে। পশ্চিমবাংলার যা হবার তা হবে।

২

কত লোক ভোট দিচ্ছে। আবার কত কেউ পারে না। তার মধ্যে ওই না-এর দলের কার্তিক সরকার আজ দীর্ঘসময় ধরে মহাসংকটে। এই শহরতলির গঙ্গার ধারে তার পুরোনো চা-দোকান। তার পেছনে টালি আঁটা বাড়িটিও পুরোনো। ভোটার তালিকায় তার মা জননী, পরিবার, এমনকী একমাত্র ছেলেরও নাম আছে। তার নাম হাওয়া। বহুবার ভুল-সংশোধনী দরখাস্ত করেও কার্তিক হয়েছে যথাক্রমে কাঁতিক, কাতির্ক এবং কর্তিক। এই পড়বার পর তার ভোট দেওয়া হয় না বছরের পর বছর। ভোটার পরিচয়পত্র হয় না। দোকান উন্নতিকল্পে ব্যাঙ্ক লোন হয় না। একমাত্র পুত্র সাইকেলের দোকানে লেবার খাটে। বউ বিড়ি বাঁধে। কার্তিক চা-চপের দোকান সামলাতে সামলাতে ভাবে ওই তো সামনেই স্থিরপাড়া জুনিয়ার হাইস্কুল ১৯৫৭। ভোট দিয়ে এলেই তো হয়। কিন্তু কাঁতিক তো কার্তিক হয় না। এ-বিষয়ে কোনও দলই তার পেছনে দাঁড়ায় না। কেননা সে বোকার মতন প্রকাশ্যে বলে, ভোট দিলে নির্দলকে দেবো। মূর্খ জানে না, নির্দলও একটা মস্ত দল।

মূর্খ শিবতোষ জানেন না। ওসব বিবেকানন্দ, মার্কস করে কিস্যু করা যায় না। স্রোতে গা ভাসাও, প্রেমে গলে জল হয়ে যাও। প্রভু ছাড়া কোনো গীত শুনো না এ সবই তো গুহ্য সত্য। তত্ত্ব আর জীবনে ব্যাপক তফাত। জীবন মানে বিপুল তরঙ্গ। তরঙ্গ মানে বৃষ্টিহীন প্রবল গ্রীষ্মে বোম্বাই, হিমসাগর। ল্যাংড়া অবতরণ অপেক্ষায়। এপারে তুমি রাধে ওপারে আমি। প্রেম শুধু প্রেম। পুকুর ভরাট প্রেম, হঠাৎ বার-স্থাপন প্রেম, অবাধ যৌনকর্মী উজ্জীবন প্রেম, প্রোমোটার মার্তণ্ড প্রেম, সুস্থ সংস্কৃতি প্রেম, মিডিয়া প্রেম, শকুনের ইলেকশন ভাগাড় প্রেম, হতশ্রদ্ধ প্রায় বসে-যাওয়া দলীয় কর্মীর শুধুমাত্র পার্টির পতাকা প্রেম, গ্রামে নগরে টাটা সুমো মোটর-সাইকেল ও সেলফোন প্রেম, দলনেত্রীর প্রকোপে বঞ্চিত নবীন মঞ্চগঠন প্রেম। কার্তিক এতসব লিস্টি না জানলেও যেহেতু তার চা-দোকান, সেখানকার বেঞ্চেই পৃথিবীর তাবৎ সমাচার, অতএব সে মনে মনে চুপটি করে একা ভাবে সেই ছেলেকালে চিত্রবাণী হলে 'ক্ষুদিরাম' বলে একটি ছবি দেখেছিল। আর 'বিয়াল্লিশ' বইতে বিকাশ রায়ের সে কী তাণ্ডব। এসব ছেলেখেলা আজগুবি গপ্পো লেখে কেটা! অবোধ শিবতোষ মনে মনে প্যাঁচ কষেন, সব বেটার ভিজিলেন্স

করিয়ে ছাড়ব। যাবতীয় নোটশিটের জেরক্স কি এমনি এমনি রেখে দিয়েছি। এস.ডি.ও. সাহেবের সাবেকি বাংলোর বাগানে যৎপরোনাস্তি আম ঝোলে। ঝোলে। দোল খায় গঙ্গার বাতাসে। স্বদেশি সব আমেদের মধ্যে একটিমাত্র প্রবীণ অ্যালফানসো আজও আছে। কোনো মি. রবার্ট, আই.এ.এস. বুঝি একে আদর করে বসিয়েছিলেন। সুদূর গুজরাট থেকে এনে। সাহেব নেই। তাঁর ফল আছে। আছেন ভারতীয় প্রশাসনের উচ্চ আমলা। আছেন তাঁকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গীয় বয়স্য সিভিলিয়ানস। নৈকষ্য কুলীন সর্বভারতীয় কর্তাদের পেলে ভঙ্গকুলীন বঙ্গ আমলাদের জিভ লালাসম্পৃক্ত হয়। শ্রদ্ধাভক্তি বাড়ে। মন বলে বলিহারি বলিহারি। এতদিনে আমি শিব পেয়েছি গো, শিব পেয়েছি। অতঃপর কে তুমি হে মহাপ্রভু, নমস্তে নমস্তে-এ-এ-এ।

বীরেশ্বর নাজির ফিসফিস করে — স্যার, নীচে ইলেকশান দপ্তরে বিরিয়ানি টিফিন শুরু হয়ে গেছে নমিনেশনের ডেট থেকে।

হতবুদ্ধি শিবতোষ,— তাহলে আমরা কী টিফিন দিচ্ছি নাজিরখানায়?

— আপনি আমি খাই না। তবে এখানে সন্ধে ছ-টা বাজলে তারপর দশ টাকার প্যাকেট। একটা যা হোক নোনতা। আর মিষ্টি। মাঝে দু-বার চা। এন.ডি.সি. অকস্মাৎ হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন— হ্যাঁ নাজিরবাবু, গত পার্লামেন্ট ইলেকশনের সময় আপনাকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছিল না! আপনার নামে করাপশানের দরখাস্ত পড়েছিল না। নাম নেই মানে অ্যানোনিমাস পিটিশন। হুঁ, আমি তখন এল.ডি.সি. ছিলাম না। শুধু সেকেন্ড অফিসার। তাই না?

বীরেশ্বর নতমুণ্ড। — আপনাকে একটু লিকার চা দিতে বলি স্যার।

শিবতোষ নড়েচড়ে বসেন। বলেন — একটা মাটির জালা কেনার ব্যবস্থা করুন নাজিরবাবু। আমার ঘরের ওই কোণে বসানো থাকবে। সক্কলে, মানে নাজিরখানার সব স্টাফ ওর থেকে জল খাবে।

— তলায় খানিকটা বালি বিছিয়ে দিতে হবে। আর একটা বিঁড়ে।

— হুঁ। বেশ,একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়া যাবে।

— হ্যাঁ স্যার। এস.ডি.ও. সাহেবের সি.এ.-র ঘরে ফ্রিজ ভাড়া করে বসিয়ে দিয়েছি। ভোটের অবজারভাররা সব এলেন বলে।

— হুঁ। ঠাণ্ডা জল। ঠাণ্ডা কোল্ডড্রিংক। তবে এই ভোটে তো রাজ্যের সরকারি অবজারভারগণ মানে ডেপুটি সেক্রেটারি, বড়োজোর জয়েন্ট সেক্রেটারিরা আসবেন। লিস্ট তো পেয়ে গেছি।

— তবু তো অবজারভার স্যার, লালবাতিওয়ালা ঠাণ্ডা গাড়ি, ধরতে হবে মোটর ভেহিকেলস দিয়ে।

— অবজারভার মানেই তো আমাদের জামাই। অথচ খবর নিন, দেখবেন এই কর্তারা কেউ চন্দননগর, কেউ পলতা থেকে ট্রেনে রাইটার্স বা সল্টলেক ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন। সন্ধেবেলা বৈঠকখানা, উল্টোডাঙা থেকে বাজার করে আনেন।

— এসব কথা তো বলা যাবে না স্যার। তবে এদের মধ্যে তিনজন আই.এ.এস. আছেন।

— হুঁ। একজনমাত্র ডাইরেক্ট আই.এ.এস.। বাকি দুই নমিনেটেড। রিটায়ার করলেন বলে।

— তবে স্যার, এস.ডি.ও. বলেছেন এই তিনজনের জন্যে সব চেয়ে ভালো গেস্ট হাউজ বুক করে রাখতে।

— হুঁ। গন্ধবিচার।

কার্তিক কার্তিক থেকে পিছলে আসে নিজের স্থলে। ভোটের খাতা থেকে বাবা মায়ের খাতা। মা-বাবা মানে দয়ার সংসার। স্নেহের বিড়ম্বনা। আর সরকারি ব্যবস্থা মানে আইন, আইনের চোদ্দোগন্ডা বাচ্চা। এই করতে করতে একদিন এই অ্যাত্তোটুকুন ব্যাঙাচি।

যেহেতু চা-দোকান মানে বিধানসভার একপ্রকার চা-কক্ষ তাই এক চা ফরমায়েশি হঠাৎ বলে ওঠে, — তাহলে কার্তিকদা তোমার ভোটটা এবারও দেওয়া হল না, কী বলো।

— দেখি, সামনের বার কী হয়।

— সামনের বার! মানে আরো পাঁচটি বছর।

— না, না, সামনের বছর বিধানসভা ভোট আছে না।

— বিধানসভা? পারবে তো নাম ঠিক করতে।

— কেন বলো দেখি! অমন করে কথা কইছ কেন?

— কোথায় পুরসভা। কোথায় বিধানসভা। ঝড় বাদল আর সুনামি।

— তাহলে লোকসভা ভোট কী শুনি?

— এখনো চার-চারটি বছর দেরি আছে। মনমোহন সিংহ মোটামুটি টানছে তো।

— তদ্দিন আমি টানতে পারব তো।

— হাঃ। কী এমন বয়েস তোমার কার্তিকদা।

— কী জানি বাপু। ভোটে নাম না থাকলে নাকি আমি থেকেও নেই। বড্ড ভয় করে একথা ভাবলে।

— ভয় কেন?

কার্তিক ছাঁকনিতে চা ছাঁকে। — মনে হয় দিন বুঝি ফুরিয়ে এল।

৩

পি-মাইনাস-ওয়ান, মানে পোল-ডের আগের দিন। আজ বোধন, কাল রাত পোয়ালেই ভোট। ঢাকের কাঠি নেই। সব প্রচার-ট্রচার আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে বন্ধ। এখন খদ্দেরের কানে কানে ফিসফিস, গুজগুজ। চোরা ক্যাম্পেন। গুপ্ত প্রচার। মাসল ও প্রতিরোধ প্রদর্শন। বাজারে অবজারভারগণ অন্তর-বাহির গরম-ঠাণ্ডা। লালবাতি জ্বলা গাড়িতে গভীর নাট্য সহকারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেফ মহকুমাশাসক একটির বাড়তি তিন-তিনটি মোবাইল নিয়ে যাবতীয় যোগাযোগ রেখে এবং এড়িয়ে চলেছেন কৌশলে। অফিসে জনশ্রুতি, তাঁর মিসেস পাঁচ মাসের হবু জননী।

এন.ডি.সি. শিবতোষ তার নাজিরখানার আড়াইজন লোক নিয়ে এত বৃহৎ শ্রাদ্ধ তুলতে যথানিয়মে সীলড টেন্ডারাদি করে চোদ্দোটি পুরসভার চোদ্দো অকুস্থলে বিশাল বিশাল প্যান্ডেল, কাউন্টিং ভেনু, ব্যালটপেপার সমেত ব্যালটবাক্স রাখার বজ্র-আঁটন স্ট্রং রুম — কী নয়— সবই সমাধা করেছেন, অবশ্যই নিয়ম মেনে। করেছেন সরকারি ভোটকর্মীবর্গের পুলিশসমেত তিন-চার দফা টিফিন ও খাদ্য উৎসবের ব্যবস্থা। পুরোনো সাপ্লায়ার কনট্রাকটর-এর দল কী লুকোনো কারণে এ-বছর দূরে অপসৃত। যত সব নবীন, এতকাল ঢুকতে না পারা কম পুঁজির

দল এবার হইহই করে ঢুকে পড়েছে টেন্ডারসমেত। প্রাথমিকভাবে অবশ্য নতুন এন.ডি.সি. শিবতোষ মোটামুটি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে বসেছিলেন যে কোনো মাসলবাজ বা নেতার সন্তান, যদি কোনো কাজ পাওয়া নতুন ছেলেকে হুমকি টুমকি দেয় তাহলে তাদের কপালে দুঃখ আছে। পুলিশ বরাবর উচ্চে টাঙিয়ে চেরাই ধোলাই হবে। নাজির বীরেশ্বর-এর গলা এক ধাপ চড়েছে, বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ...

কোথায় কোথায় কী পোল হতে পারে তা নিয়ে প্রশাসনের খবর আছে। সেইসব দিকেই কর্তাদের বেশি নজর। অধিক পুলিশ, বাড়তি ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি। কোথাও কোথাও জোড়া জোড়া অবজারভার দেওয়া হয়েছে আইনশৃঙ্খলা কঠোর হস্তে বহাল রাখতে। সেই রকমই এক এ-প্লাস ক্যাটিগরির পুরসভায় ম্যাজিস্ট্রেসির ভার পড়েছে শিবতোষের ঘাড়ে। এটি তাঁর বাড়তি ও বিষম কাজ। নাজির বীরেশ্বর বারংবার বলেছেন — স্যার, ওখানে আপনাকে দেওয়াটা ষড়যন্ত্র। যাবেন না স্যার। এস.ডি.ও.-কে বলে দিন পারব না।

শিবতোষ গম্ভীরমুখে বলেছেন,— বাঘ থেকে বেড়াল, সেটা কী ভালো হবে?

এসব কথা পি-মাইনাস ওয়ান ভোটের আগেরদিন বিকেলে অফিস চেম্বারে বসে হচ্ছে। টেবিলের এপারে শিবতোষ। ওপারে নাজির বীরেশ্বর আর উপনাজির অতীব দুর্বল রোগা শ্যামবর্ণ ঝোলাগোঁফ যুবক রাজীব তেওয়ারি। কোমরস্থানটি এমনি পলকা যে প্যান্ট কেবলই নেমে নেমে আসে। দু-হাত বোঝাই তাবিজ, পাথর আর তাগা। বাবার অকালমরণে সরকারি কাজ পেয়েছে ছেলেটি। যেমন ভীরু তেমনি সৎ। আর ততোধিক কড়া। রাজীবের দুঃখ তার বউ ও চারবছরি ছেলেকে বউয়ের বাপ ঝাড়খণ্ডের গ্রামদেশ থেকে তার কাছে আনতে দেয় না। এলেও নিজে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। দু-দিন থেকে আবার নিয়ে যায়। বৃহৎ চুল দাড়িওয়ালা শিবু সোরেন ছাঁচের শ্বশুরের দুটি মাত্র যুক্তি। এক হল, বুড়ো তাঁর দৌহিত্রকে ছেড়ে থাকতে পারে না। দ্বিতীয়, এই ঘিঞ্জি কারখানা বস্তি বাজার আর ধোঁয়া-ঘেরা অবস্থায় তার মেয়ে কষ্টেসৃষ্টে তিন মাসও টিকবে না। ফলে অতীব বেচারি এই রাজীব অহর্নিশ মরমে মরে থাকে। ঘন ঘন শিব আর হনুমান মন্দিরে যায়। ঘড়ি ঘড়ি উপবাস করে। কপালে সিঁদুর তিলক ও ভস্ম আঁকে। এই পুরভোটে তার ভোট থাকলেও দেবার ইচ্ছে নেই। কী হবে ভোট দিয়ে। তাতে করে কি তার বউ বাচ্চা কাছে চলে আসবে চিরদিনের জন্যে। তবে রাজীব মনে মনে ভীষণ মান্য করে এই নতুন এন.ডি.সি.-কে। এন.ডি.সি.-র বুকের জোর দেখে তার কোমরে কভু কভু তেজ ঘটে। দু -হাতে প্যান্ট টেনে তোলে মহা আত্মতেজে। তবে বাজারে আমের এত রমরমার মধ্যেও সে একটিও আম মুখে দেয় না। তার ঘরওয়ালি ভারি ভালোবাসে এই ফলটি। এসব ছিঁচকে কথা, প্যানপেনে আদিখ্যেতা সে তার বাড়িউলি বুড়ি আম্মাকেও বলতে পারে না। কেননা তিনকুলে কেউ নেই বলে বাঙালি বিধবা বৃদ্ধা তাকে ভারি ভালোবাসেন। রাজীবের মনের ক্ষুদ্র বেদনা চারদিকের এমন আমপচা প্রাবল্য আর গরমগরম নির্বাচনী উৎপীড়নের কোন অতলে দীন হয়ে পড়ে থাকে। তার সদাই কম্পিত মন অতি গোপনে বলে শ্বশুর মরবে কবে?

মরবে বাসনা করলেই তো মানুষ মরে না। বেচারি রাজীব জানে না এসব প্রার্থনা কোনো ঠাকুরই শোনেন না। বরং তার পরমায়ু বেড়ে যায়। যেমন হয়ে চলেছে ওই ঝাড়খণ্ডি বুড়ো

শ্বশুরের। যেমন ঘটে যাচ্ছে এই পুর-নির্বাচনে সরকারি অখণ্ড পরমায়ু টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ এবং প্রাক্-নির্বাচনী মুহূর্তে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের আঠারো কলা পরিপূরণ। রাজ্য সরকারি অবজারভারগণ সবই অবজারভ করবেন। এই তো সেদিন শেষন সাহেবের মস্তিষ্কজাত এই অবজারভাররা আদপে ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকারি নৈকষ্যকুলীন জামাতা, এবং ও এবং কেবলই অবজারভ্ করার নাট্যে। কোনো কূট ঝামেলায় নিদান দেওয়ার মুরোদে তাঁরা নেই। নেই বোমাবাজির সামনে আইনি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়ার মহিমা। এ যেন সব আলোকসম্ভব নভশ্চর কিছু হঠাৎ প্রজাতি। টি.এন.শেষন কী রিটায়ার করার পর এমনি এমনি ভোটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাজনীতির লোলুপ ছাঁচতলে ছোঁক ছোঁক করেছিলেন।

এসব কথা কমার্স গ্র্যাজুয়েট মরমে মৃত রাজীব তেওয়ারি জানে। জানতে জানতে ভাবতে ভাবতে একসময় খেই হারায়। আর তখনই মনে হয় তার মতন ঝিঁঝি পোকার এসব রাজকীয় ভাবনার কাম কী। তার চেয়ে বউ বাচ্চার বিরহ বিরহে মরে থাকা অনেক ভালো।

তেমনি নিত্য চা-ঘোঁটা কার্তিক ভেবে পায় না ভোট দিতে পারলে কী, না পারলেই বা কী। এই পারা না পারার ক্রীড়াচ্ছল তার কাছে দিন দিন সংসার টেনে চলার বাইরে খানিক নিরাপত্তাজনিত। তাও কখনো কারণ কখনো অকারণ। অথচ মাত্র রাস্তার এপার হতে ওপার টপকালেই ভোটদান কেন্দ্র। রাস্তার এপারে ওপারে ভ্যানরিকশা বোঝাই আম সাজিয়ে বিহারি আমওয়ালা। অজস্র ফলনের জন্য আমের দাম এখনো সস্তা। সকলে কিনছে। বাকি আম পচে যাচ্ছে। নালা-নর্দমায় আমের খোসা আঁটির পুঞ্জ। দুর্গন্ধ। কে বলে এর নাম অমৃত ফল।

৪

সকাল সাতটা থেকে ভোটারম্ভ। চলবে অপরাহ্ন তিনটে তক। তারই মধ্যে গনগনে প্রকাণ্ড উনুনে কড়ায় কচুরি ভাজা হচ্ছে কানাই ঘোষের জমজমাট দোকানে। বারকোশে ডাঁই করা ছানার জিলিপি। ভোট-পাবলিক আসতে যেতে কচুরি জিলিপি খাচ্ছে। এ-কচুরি না খেয়ে কারোর নিস্তার নেই। যদিও জন-রটনা ঘোষ নাকি কচুরিতে সিদ্ধি জাতীয় স্বদেশি কিছু মেশায়। ফলে একটি খেলে ক্রমে আটটিতে গিয়ে ঢেঁকুর উঠবে। সকালে খেলে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত জনগণ চমৎকারভাবে রইবে।

কচুরির আগুন এই মে মাসের ঝটকা হলকায় গেল রাতে যৎকিঞ্চিৎ ঝোড়ো বাতাস ও বৃষ্টিতে মুখচাপা পড়লেও সকাল থেকে যথারীতি রইরই গরম, রে রে চামড়াদহন রোদ্দুর, ভুসস্ ভুসস্ কোল্ড ড্রিংক-এর বোতল উচাটন, ব্যানার ফেস্টুনের সংসারে হরেক রঙের চতুরালি, প্রাণঘাতী হুটার বাজিয়ে ঘন ঘন পুলিশি কনভয়-এর অগ্রপশ্চাৎ কভু অবজারভার কভু ম্যাজিস্ট্রেট। ভোট নিরীক্ষণ হচ্ছে। শান্তি বজায় রাখার অখণ্ড প্রয়াস চলছে। এবং সেই প্রক্রিয়ার পিঞ্জরে পড়ে ম্যাজিস্ট্রেট শিবতোষ শাদা রঙ জীর্ণ অ্যামবাসাডারে উপবিষ্ট, সেই প্রাতঃ সাড়ে ছ-টা হতে। সামনের কাচে 'ম্যাজিস্ট্রেট অন ডিউটি' লাল স্টিকার। ড্রাইভারের পাশে খাকি পোশাক এবং রিভলবার কোমরে সিকিউরিটি বসন্ত। বঙ্গজ এই যুবক পুলিশ লাইন থেকে এই ক-দিন সাহেবের সঙ্গে ট্যাগড হয়েছে। তার নিবাস গঙ্গাসাগর। ঘরে মাত্র দেড় বছরের বিয়ে করা স্ত্রী এবং আড়াইমাসি কন্যা। তিন-তিনটি মাস ছুটি হয় না বসন্তর।

ফলে তার মনে এই তাপ দহনেও সদাই সাগরের হু হু হাওয়া। সাহেবের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে এই শহরতলির পশ্চিমে কেবলই চোখে আসছে রোদ, তাতল গঙ্গার গেরুয়া। কলের চিমনি থেকে কোথাও ধোঁয়া, কোথাও ফাঁকা নৈরাশ্য। নদীর জলে সূর্য ছাড়া আর কোনো প্রতিচ্ছায়া নেই। বসন্ত ভাবছে এই নদী তাহলে তার সেই দেশেরও সাগর ছুঁয়েছে। শিবতোষ সাহেবের মোবাইলে ঘন ঘন খবর হচ্ছে, 'স্যার, আটের এগারো ভবতারণ প্রাথমিকে গণ্ডগোল। স্যার, এইমাত্র কনট্রোল রুমে খবর এল, তেরোর এক আর দুই, প্রিয়নাথ বালিকা..., সারকাসুন্দিয়া হাইস্কুল,... তেজচাঁদ জুটমিল লাইব্রেরি..., পেপারমিল ডিসপেনসারি বাইশ নম্বর বুথ...।' মেন রোড ছেড়ে ভেতরকার সব লেন বাইলেনের ধারে প্রায়ই গৃহস্থ আমবাগান। থরে থরে আম সাজানো; হিমসাগর, ল্যাংড়া, আম্রপালী। গতরাতের ছিটেফোঁটায় এই উন্মাদ রোদ পোয়ানো আমগুলি এখন ভারি প্রফুল্ল। মোড়ে মোড়ে ফলের ঠেলাওয়ালার পাটাতনে কার্বাইড শানানো হলুদ হলুদ তাগড়াই আম। বিক্রেতার মাথায় গামছা পেঁচানো। কেউ বা ছত্রপতি। বাদবাকিরা শূন্য মাথায় গরম চাখছে। খদ্দেরকে ছুরি দিয়ে মিঠে আমের চিলতে চিরে চাখতে দিচ্ছে। ফলে বৃহৎ নীলমাছিরা আশকারা পেয়ে যাচ্ছে। চা দোকানি কার্তিক অবিরাম চা ঘাঁটতে ঘুঁটতে ভাবছে কিছু আম কিনে আমসত্ত্ব করে রাখলে মন্দ হত না। সংসার খেয়ে আহ্লাদ করত।

বীরেশ্বর নাজির তার মাত্র গুটিকয় পরিচর নিয়ে নাজিরখানা আগলাচ্ছে শত হস্তে। কোণপুর অফিসে ল্যান্ড ফোন, ফ্যাক্স বিগড়োচ্ছে, কোথায় পুলিশ বনাম সিভিল ফুড প্যাকেট নিয়ে মাথা গরম হচ্ছে, কোথায় অবজারভারের লিঁয়াজ অফিসার নিজ মোবাইল ফোনের বাড়তি গোটাছয়েক ক্যাশকার্ড নিয়ে গোঁসা হচ্ছেন, কোথায় অবজারভারের টাটা সুমোর মাথায় তোলা লালবাতি সকালে ঘুরছিল এখন স্থির শিবনেত্র, কোথায় জনৈক সহকারি রিটার্নিং অফিসার বুকে ব্যথা নিয়ে শুয়ে পড়েছেন। নাজির মুহুর্মুহু হুঙ্কার দিচ্ছেন তেওয়ারি তেওয়ারি। বেচারি রাজীব তেওয়ারির গতকাল সন্ধের ঢিলে প্যান্ট আরো অবনত। কেননা গেল রাতে তার ঝাড়খণ্ডি শ্বশুর টেলিফোনে হুমকি দিয়েছে, এই আমপচা ভোট গরমে বউ-বাচ্চা নিয়ে যাবার কথা মুখে আনবে না। ভোট মিটলে, বর্ষা টর্ষা হলে তখন দেখা যাবে।

বীরেশ্বর হাঁকেন— তেওয়ারি।

— হাঁ বড়োবাবু।

— দমদম অফিসে ফোন করে দ্যাখ্ ল্যান্ডফোনটা ঠিক হল কি না?

— ফোন খারাপ থাকলে ক্যায়সে ফোন হবে বাবু?

— আরে ছাগল, ঘোষ সাহেবের মোবাইল ধর্।

— ধরি বড়বাবু।

ওধার থেকে বাংলোয় থাকা এস.ডি.ও.-র ফোনে তলব। — নাজিরবাবু...

— স্যার। স্যার।

— আপনাকে আজ থেকে পন্দরা দিন আগে ফ্রিজের কথা বললাম।

— স্যার, বসিয়ে দিয়েছি তো। আপনার কনফিডেন্সিয়াল সেকশানে। স্যার।

— বললাম দুটো, হল একটা। তো নাজিরবাবু...

— স্যার। স্যার।

— বাংলোরটা কী হল?

— স্যার। স্যার। বাংলোয় তো একটা ছিল... তাই...

— সেটা তো আপনার দেখার কথা নয় নাজিরবাবু।

— স্যার। স্যার।

— তো কী হবে?

— স্যার ভুল হয়ে গেছে। স্যার। স্যার।

— এত ভুল হলে তো...

খটাত।

— তেওয়ারি।

— বড়োবাবু।

— শালা মাকড়া।

— বড়োবাবু।

— চাকরি নেই রে তেওয়ারি। মুণ্ডু গেলে খাবটা কী?

খানিক বেখাপ্পা সুর শুনে রাজীব থতোমতো। তবু সে বলতে চায়— মুণ্ডু! কী হল বড়োবাবু।

বীরেশ্বর ঝেঁঝে ওঠেন, — অ্যাই, সবসময় বড়োবাবু বড়োবাবু বলবি না তো। স্যার বলবি, স্যার। নাজিরও একজন সাহেব বটে।

— স্যার। স্যার।

শিবতোষের কানে এবার এস.ডি.ও.। — মুখার্জি সাহেব, কী খবর আছে?

— খবর আর নতুন কী স্যার। লছমন সিং নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মারছে সেই সকাল থেকে।

ওধার থেকে অবজ্ঞার চালাকি হাসি, — এইজন্যই তো বাংলায় ফেল হয়ে গেল এ-বছর।

বোঝা গেল ওর ডিপার্টমেন্টাল বাংলা পরীক্ষা বিষয় এবং শিবতোষের নাকে দড়ির দুর্বোধ্যতা নিয়ে মধুর এই কটাক্ষ। তবু বাঁচোয়া এই বাংলায় পাস না করলে ইনক্রিমেন্ট বন্ধ।

— হুঁ স্যার। অবস্থা মোটে ভালো নয়। কটা যে রি-পোল হবে কে জানে!

— ঠিক আছে। দেখা যায়।

অর্থাৎ দেখা যাক। এই সামান্য দেখা-না-দেখার পাঁকে পতিত হয়ে ওর মাইনে এক বছর হল বাড়ে না। এদিকে আবার রি-পোল মানে আগামীকালই ভোট করতে হবে। কতগুলো আধমরা, নড়বড়ে ভোটক্লান্ত কর্মচারী নিয়ে ভোটতরণী বাওয়া। সবার চোখে রাজ্যের ঘুম। শুধু দু-একজন ম্রিয়মাণ বাদে বাকি রাজনৈতিক এজেন্টরা বিলকুল তরতাজা।

কার্তিকের স্ত্রী-পুত্র এখন এই দুপুর বারোটা নাগাদ ভোট দিতে যাচ্ছে রাস্তা টপকে ওপারের স্কুল বুথে। উভয়ের হাতেই পার্টির দেওয়া স্লিপ। পরিবার একখানি পাটভাঙা শাড়ি পরেছে। সাইকেল লেবার একমাত্র ছেলে সেই লেবারি অবস্থাতেই। ওধার থেকে 'আসুন বউদি' বলে

সে কী না আকুলি। এমতাবস্থায় কার্তিকের কেমন যেন তটস্থ ফাঁকা মনে হয় নিজেকে। মনে হয় এই চৌপাট গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে কোথাও যাবার জায়গা নেই। একটা একা চিল নিরম্বু আকাশে ঘুরছে তো ঘুরছেই। এ-সংসারে তার কোনো ঠিকানা নেই।

সিকিউরিটি গার্ড বসন্ত এই দুর্ভেদ্য গরম সরিয়ে মনে আনতে চাইছে তার আড়াইমাসি মেয়ের কচি আমপাতা মুখখানি। সেই সঙ্গে গৃহলক্ষ্মীরও। হায় ভোট। হায় সংসার।

নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বা ওসি ইলেকশন চণ্ডীদাস মনুষ্যত্ব ভুলে বেমালুম বেআইনি কেনাকাটা করে যাচ্ছে এই মওকায় এবং এস.ডি.ও.-র কারুণ্যে। ক্ষিপ্ত শিবতোষ নোটের পর অবজেকশন নোট লিখে লিখে ক্রমে হতাশ মেষশাবক হয়ে পড়ছেন। নাজির বীরেশ্বর ততোধিক বিষণ্ণ বিরস। তবুও তার উচ্ছ্বাস—বাংলার বাঘ আশুতোষ, আমাদের বাঘ স্যার শিবতোষ—মনে মনে বুজকুড়ি কাটে।

৫

সকাল থেকে চরকিবাজি আরম্ভ হয়েছে। সামনে বাঁয়ে বসন্ত সিকিউরিটি। ডাইনে শিবুলাল সিং ড্রাইভার। হাতে ধরা মোবাইলে কামাই নেই প্রতারক খবরের। উত্তরে গণ্ডগোল হলে পুবের খবর আসে। পুব হলে কোথাও না।

মাঝখানে একবারে পথিপার্শ্বে কচুরি খাওয়া কানাই ঘোষের দোকানে। সেখানে এক গুঁপো অবজারভারের সঙ্গে দূরসাক্ষাৎ। ভদ্রলোক ঠাণ্ডা টাটা সুমোর মধ্যে বসে গরম কচুরি মচকাচ্ছেন। গলদ্‌ঘর্ম সিকিউরিটি দোকান থেকে গরম গরম বয়ে আনছে। অবজারভার কাচের ওপার থেকে হাতটি দ্রুত নাচান। শিবতোষ হাতের মুদ্রায় বুঝিয়ে দেন পেটে চড়া পড়েছে।

এবার খবর এল স্থিরপাড়া জুনিয়ার হাইস্কুলে থেকে। সেখানে ভীষণ গোলযোগ। সংবাদদাতা স্বয়ং এস.ডি.ও.।

স্থিরপাড়া কোথায়, কোনদিকে। ওয়ার্ড নং তেরো। কিন্তু কী অবাক কেউ ওয়ার্ড বোঝে না। পুরসভার মজা এমনই যে বাসিন্দাও তার ওয়ার্ড জানে না। ড্রাইভার শিবুলাল কেবলই মুখ কাত করে জিজ্ঞেস করে— ভাই অস্থিরপাড়া কৌন দিকে?

অস্থিরপাড়া! লোকজন অবাক হয়ে মুখ তাকাতাকি করে। এমন পাড়ার নাম তো কভু শোনা হয়নি।

— দাদা, অস্থিরপাড়া কিধার হোগা?

রসিক নাগরিক জবাব দেয়— এখন তো সব পাড়াই অস্থির দাদা।

— না না, অস্থিরপাড়া জুনিয়ার হাই...

— সিনিয়ার, জুনিয়ার, সবই আজ অস্থির।

এবার মেজাজ হারান শিবতোষ,— আপনি থামুন তো। অস্থিরপাড়া, অস্থিরপাড়া হুঁঃ। বসন্ত, তুমি জিজ্ঞেস করো।

বসন্ত এবার বাঁয়ে হেলে জিজ্ঞেস করে— দাদা, স্থিরপাড়াটা কোনদিকে?

লোকটি গলা তুলে বলে— সিধে চলে বাঁয়ে শিবমন্দির, কার্তিকের চায়ের দোকান। ঠিক তার উলটোদিকে।

শিবতোষ কথা বলেন, — রাস্তার ওপরেই তো?

— একেবারে। কার্তিকের চায়ের দোকান বললেই সবাই বলে দেবে।

শিবতোষের মোবাইল ঘড়িতে দুপুর দুটো দশ। আর পঞ্চাশ মিনিটের খেল।

নিঝুম শান্ত অকুস্থল। স্থিরপাড়া বুথ। নিচু পাঁচিলের ওপরে একজোড়া কাক গ্রীষ্ম কাটাচ্ছে। এপার থেকে দেখা যাচ্ছে ভেতরে চার কামরার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র। কোথাও কোনো গোলযোগের পাতা ঝরাও নেই। কী অকাট্য নীরবতা। কোথায় গণ্ডগোল? কোথায় ব্যালেট পেপার ছিনতাই?

কার্তিককেই প্রশ্ন করল ড্রাইভার, — কার্তিকের চা-দুকান কী এটা?

বাজপড়া কার্তিক বলে ফেলল — তাহলে ভোটার লিস্টির ভুলটা আপনিও জানেন স্যার।

গণ্ডগোল বুঝে বসন্ত বলে ওঠে,— কার্তিক, কার্তিক।

— হ্যাঁ স্যার, ঠিক নামটা দেখছি আপনি জানেন। বাঃ, একেই বলে পুলিশ প্রশাসন।

খোলা গেট দিয়ে শিবতোষ ভেতরে গটগটান। পাশে পাশে নিরাপত্তা বসন্ত।

— স্যার, ওই লোকটাই হল কার্তিক। ওর দোকান।

— হ্যাঁ স্যার। বহুকালের বাসিন্দা হলেও ভোট নেই আমার। তাহলে কী আমি থেকেও নেই স্যার।

খোলা দু-খানি দরজার দু-পাশে দুই-দুই চার রাইফেলধারী। ভেতরে নিস্পন্দ। মানুষ নেই এমন মনে হয়।

টেবিলের ওপর মাথা রেখে প্রিসাইডিং অফিসার। পাশে রাখা প্লেটে রুটি মাংসের অবশেষ। ওধারে পোলিং অফিসারবর্গ। কেমন ধ্বস্ত চোখমুখ। পোলিং এজেন্টদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। ঘরময় ছত্রাকার ভোটার লিস্ট। ওলটানো ভোটবাক্স। চটের পরদা ফর্দাফাঁই। ইনভেলিবল ইঙ্ক মেঝেয় গড়াচ্ছে। মাথার উপরে বনবন পাখা ঘুরছে।

বুকে আঁটা ম্যাজিস্ট্রেট লিখন দেখে সবাই নড়ে বসে। কেউ বা দাঁড়ায়। কোনো একজন গিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারকে নড়িয়ে দেয়। তিনি কতক স্বপ্নে চমকে ফ্যালফ্যালিয়ে তাকান, বলেন — কী? কী?

শিবতোষ প্রশ্ন করেন — কী হয়েছে? এখানে কী হয়েছে?

— কিছু না স্যার, কিছু না। সব শান্তিপূর্ণ।

— তবে যে বলল গণ্ডগোল হয়েছে এখানে।

— গণ্ডগোল কিছু হয়নি তো। ওরা এল। আমার টেবিল থেকে ব্যালট পেপারের বান্ডিলটা তুলে নিল। কাগজগুলো ছিঁড়ল। তারপর ব্যালটবাক্স উলটে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। একটা পটকাও ফাটায়নি।

—আপনার পুলিশরা কী করছিল? ধরল না যে।

— ওরা তখন লাঞ্চ করছিল স্যার।

পুলিশ দু-জন দাঁড়া-সৈনিক। নড়ে না চড়ে না। কাষ্ঠসম নিবাত নিষ্কম্প। কোনো ঝুটে নেই ঝামেলাতেও নেই।

— কতগুলো ব্যালট পেপার নিয়ে গেছে?

— দুশো, আড়াইশো। তিনশোও হতে পারে।

— সে আবার কী? হিসেব নেই!

— কাউন্টারফয়েল, তারপর মার্কড কপি অফ ইলেকটোরাল রোল, সব গুছিয়ে নিয়ে গেছে। তবে বাকি ব্যালট যা আছে সব ওই বাক্সে আছে।

পপাত ব্যালটবক্সের দিকে আঙুল দেখান প্রিসাইডিং অফিসার। বাকি পোলিং অফিসাররা মাথা নেড়ে সায় রাখেন।

ঘড়ি দেখেন শিবতোষ। তিনটে বাজতে দশ। এখানে আর ভোটের গল্প নেই। পরের কাহিনী আগামীকালই রি-পোল। অবিশ্রান্ত শারীরিক তাণ্ডবে মাথার মধ্যে আকাশ স্থির হয়ে আছে। বাইরে থেকে পোক্তশক্ত বলবান দেহ দেখলে বোঝবার জো নেই অন্দরে কী হচ্ছে শিবতোষের। বাইরে দিব্যি পাকা রঙ আম। টিপলেও মোটামুটি নরমের দিকে। কামড় দাও, দরকচা টক, কভু কভু মিষ্টির স্বাদ। কার্বাইডে পাকালে যা হয় আর কী। অতএব কাল ভোর থেকে আবার ভোটের রশি ধরে মারো টান। ছুটি কখন, তার জবাব কোথাও কোনো রুলস-এ লেখা নেই। লেখা নেই চারদিকের এই ভয়ংকর উত্তপ্ত আকারহীন নিরেট দেওয়ালে। নির্বাচন পদ্ধতির আওতায় শরীর, মন এবং ছুটি বলে কোনো আখ্যান নেই।

গঙ্গার দিকে গনগনে সূর্য কাঁপছে সন্ধ্যার মুখোমুখি। কলকারখানার আকাশবর্তী চোঙারা সব নেপথ্য চিত্র। গাছপালারা গঙ্গার জলে নিজেদের দিনময় পোড়া মুখচ্ছবি দেখছে মহা আনন্দে।

মহকুমা অফিসের যথা তথা মিষ্টির প্যাকেট, শালপাতার পুঞ্জ। দোতলার বারান্দাতেও কুকুর ঘুরছে। বীরেশ্বর নাজির এসে গুটিগুটি ঘরে ঢোকে। হাতে একগোছা কাগজ, রেজিস্টার। তার পশ্চাতে অফিসের লেবার বুড়ো যতীন দাস। মাথায় একটি পিজবোর্ডের বড়োসড়ো চৌকোনা প্যাকেট। চৌদিক দিয়ে সেলোটেপের বন্ধন। জানলার ওপারে সূর্য ডুবছে।

— স্যার, আলোটা জ্বেলে দিই?

বীরেশ্বরের বিনতি।

— হুঁ। আপনার হাতে এই অবেলায় ওগুলো কী?

— কতগুলো নোংরা কাগজ স্যার। ঝুটো ভাউচার।

চেয়ারে পিঠ টান টান শিবতোষের। — ইলেকশনের ঘর থেকে এল তো?

— হ্যাঁ স্যার। তবে কতগুলো সত্যি সত্যি লেবার পেমেন্ট বিলও আছে। ছেলেগুলো দিনরাত খেটে ব্যালটবাক্স টানা, লরিতে লোড করা...

— আর মিথ্যে বিলগুলো?

— হাজারে হাজারে ভোটার লিস্ট জেরক্স করানো হয়েছে বাইরে থেকে, অফিসে তিন-তিনটে জেরক্স মেশিন থাকতেও। তা ছাড়া শয়ে শয়ে টিফিন প্যাকেট, কম্পিউটারের পার্টস, গণ্ডায়-গণ্ডায় স্টেশনারি জিনিসপত্র, যার কোনো হিসেব নেই।

— থাক থাক, থামুন এবার।

দরজায় ছায়ামূর্তি রাজীব তেওয়ারির। মুখে সর্বত্র যথারীতি ভীরু ভীরু হাসি।

— কী হল তেওয়ারি?

— ভালো হল স্যার। ভালো খবর আছে।

— কীরকম কীরকম?

— স্যার, বউ ফোন করেছিল আজ, অফিসে। বলল, আমায় নিয়ে যাও।

— বাঃ বাঃ। শুধু বউ! ছেলে? ছেলের কী হবে?

সলজ্জ কাঁপা হাসি তেওয়ারি দু-হাতে নামি নামি প্যান্ট তুলে নেয়। বলে — সেও আসবে স্যার। তবে...

— তবে কী?

— কী জানি স্যার! আবার আগের বারের মতো আমায় বলতে হবে না তো, চলেই যদি যাচ্ছ তাহলে এলে কেন?

বীরেশ্বরের হুকুমে যতীন বাক্সটা নামিয়ে রাখে শিবতোষের টেবিলের পাশে।

— কী ওটা নাজিরবাবু?

— কিছু না স্যার। এস.ডি.ও. সাহেব, সব অফিসারদের জন্যে বাগানের আম পাঠিয়েছেন। অপর্যাপ্ত আম তো। তা ছাড়া ইলেকশনটা কী চমৎকার পার করে দিলেন স্যার।

— হুঁ। ইলেকশন পার হল। বাগানের আমগুলোরও সদ্‌গতি হল। সেই সঙ্গে তেওয়ারির বউও ফোন করে বলল, আমায় নিয়ে যাও।

বীরেশ্বর কতকটা নির্বোধ মুখে তাকিয়ে রইলেন। শিবতোষ হাসলেন, — কে জানে, হয়তো আরো কত কী ভালো হল। কত ভালো ভালো খবর তৈরি হল। সব কী আর আমরা জানতে পারি।

এই পরবাসে

কামাল হোসেন

রোজকার মতো আজকেও ঘুম ভাঙতে দেরি হল। বেলা ন-টা বেজে গেছে। দরজা খুলে বাথরুমে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকবে, এমন সময় সেই একই খিটকেলে কাণ্ড। বাথরুমের দরজা হাট করে খোলা। আশি বছরের বৃদ্ধ বাবা বস্ত্রহীন অবস্থায় পায়খানার প্যানের উপর ঘুঘু পাখির মতো কোঁত দিচ্ছেন।

এই দৃশ্যটা দেখলেই আনুর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। প্রচণ্ড গা ঘুলিয়ে বমি পায়। প্রাণপণে জোরে চ্যাঁচাতে থাকে — সানুভাই — ও সানুভাই।

রান্নাঘরে তখন তরতরকারি কাটাকুটি রান্নাবান্না এসবে ব্যস্ত ছিল আনুর ছোড়দা। সানু অর্থাৎ সানাউল। খালি গা গরমে ঘামে ভরতি। এক হাতে একটা ছুরি অন্য হাতে একটা লম্বা ঝিঙে নিয়ে সে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

— চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? সানু বিরক্তিমাখা গলায় শুধায়।

বাথরুমের খোলা দরজার দিকে আবার তাকায় আনু। বৃদ্ধর একজোড়া ঘোলাটে হলুদ বর্ণের চোখ মুখের কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। রোগা হাড়গিলে চেহারা। সমস্ত শরীরে শুধু হাড়গোড় ছাড়া আর কিছু নেই বলে মনে হয়।

নিজের গলায় দ্বিগুণ আওয়াজ তুলে আনু অর্থাৎ আনোয়ারা এই ভয়ংকর রুচিবিকৃতি ও অশোভন আবহাওয়ার বিরুদ্ধে নিজের প্রতিবাদ জানায় — এই বাড়িতে মানুষ বাস করে?

ঠাণ্ডা গলায় সানু বলে — বুড়ো মানুষ। ভীমরতি ধরেছে। তার উপর কানে শুনতে পায় না, মুখে বলতে পারে না। আমাদের জন্মদাতা বাপ, তার উপর রাগ করতে আছে?

— ওসব সেন্টিমেন্ট ধুয়ে তুমি পানি খাও। আমার বাপু সোজা কথা। বাপ হও আর শ্বশুর হও, তুমি হচ্ছ ব্যাটাছেলে, তার মানে জলজ্যান্ত পুরুষ মানুষ। নিজের জোয়ান মেয়ের সামনে বসে বসে সেক্স অরগ্যান নাচাবে?

— ছিঃ, কী সব বলছিস আনু! তোর মাথার ঠিক নেই। রোজ সকালে একই গপ্পো।

— রোজ সকালে একই খিটকেল ঘটলে আমি কেন চুপ করে থাকব? মহিলা সমিতির পারুদি বলে, মেয়েমানুষ হয়েছ বলে পুরুষের কোনো রকম বজ্জাতি সহ্য করবে না। সব সময় প্রটেস্ট জানাবে।

— প্লিজ, এবার চুপ কর আনু। জানিস আব্বা কনস্টিপেশনের পেশেন্ট। রোজ রাতে আমি ইসবগুলের ভুসি পানিতে গুলে সরবত বানিয়ে খাওয়াই। তবু কত কষ্ট পায় বেচারা। তোর মায়া হওয়া উচিত।

— ধ্যাত্তেরি মায়া! জানো আমি রোজ এত দেরি করে ঘুম ভেঙে উঠি, এসব ডিজগাস্টিং ঘটনা আর একটু আগে কমপ্লিট করতে পারো না? ঘুম থেকে উঠে আমার ব্লাডার ফেটে যাচ্ছে, একটামাত্র বাথরুম, আমি ব্যাটাছেলে নই যে রাস্তায় বেরিয়ে কুত্তার মতো ঠ্যাং তুলে ল্যাম্পপোস্টের তলায় পেট ফাঁকা করে আসব!

বোনের ধারালো সংলাপের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করে সমবেদনা বোধ করে সানু, কিন্তু আপাতত বাবার কোষ্ঠকাঠিন্য লাঘব না হলে সে নিজেও খুব অসহায় বোধ করতে থাকে।

— রাতে ওষুধ খেয়ে ঘুমাই, জীবনে এতটুকু সাধ-আহ্লাদ হল না, তবু আমার যন্ত্রণার কথা একবারও ভেবে দেখবে না। সারাজীবন ধেড়ে কার্তিকের মতো ল্যাজ নেড়ে নেড়ে দালালি করে গেলে, মনুষ্যত্বের মতো একফোঁটা জিনিস তোমার দেহের মধ্যে নেই। সাধে বলি; ভাই তো নয়, জানোয়ার! আমার হয়েছে কপাল। এই রকম দোজখের আগুনে দিন রাত পুড়ে মরতে হয়।

জোরজবরদস্তি জল ঢেলে শৌচকার্য সম্পন্ন করে বাবাকে বাথরুমের বাইরে বার করে আনে সানু।

বাবার বোধহয় আরো বহুক্ষণ ওখানে বসে থেকে কোঁত মারতে ইচ্ছে করছিল। হাত-পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। বছর দশেক আগে হঠাৎ এক সেরিব্রাল স্ট্রোকের ঝটকায় ওঁর কথা বলা ও শোনা দুটোই শব্দহীন হয়ে গেছে। কলকাতা শহরের ভালো ভালো নামজাদা অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে। কোনো উপকার হয়নি।

লুঙ্গিটা কোমরে শক্ত করে গিঁট দিয়ে বেঁধে চৌকির উপর বসায় সানু। বাবার গায়ে মাথায় শিশুর মতো হাত বুলায়। আদরের ভাষায় বলে— দাঁড়াও, আনু উঠেছে, এবার আর একবার চা করব। গরম চা খেলে তোমার হাগা ভালো হবে।

বাবার সঙ্গে আকারে ইঙ্গিতে কথা বলার অদ্ভুত একটা অভ্যাস তৈরি করে ফেলেছে সানু। বাবা ঠিক বুঝতে পারে তার কথা। খুব জটিল বাক্যবিনিময় করার সময় বাবার হাতের পাতায় আঙুল দিয়ে বানান করে প্রয়োজনীয় বাক্য লিখে দেয়, বাবা ঠিক বুঝতে পারে।

দ্রুত বাথরুমে ঢুকে কয়েক বালতি জল ঢেলে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করতে থাকে আনু।

আজ সারাদিন আনু কীভাবে উৎপাত করবে কল্পনা করেই শিউরে ওঠে সানু। বাবার গায়ে একটা জামা পরিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে আপন মনে সে বলে যায় — রুটি আলুভাজা বানিয়ে রেখেছি। চা-টা গরম করে তিনজনে একসঙ্গে নাস্তা করব।

সবজান্তা পুতুলের মতো বড়ো বড়ো ঘোলাটে চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন বাবা। মাথায় বিশাল টাক। গালে আধা-খোঁচা দাড়ি। হপ্তায় দু-দিন বাবার দাড়ি কামিয়ে দেয় সানু।

শায়ার দড়িটা বুকের কাছে বেঁধে বাথরুম থেকে বেরোয় আনু। বিশাল বিশাল দুটি স্তন দুলতে থাকে শায়ার আচ্ছাদনের ভিতরে। মধ্য চল্লিশের মেয়েটির শরীরে স্বাস্থ্য এবং যৌবন, সবকিছুই এখনো বুঝি ঝলমল করে। অল্পবয়সে বেশ সুন্দরী ছিল আঁচ করা যায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সকালের তৈরি চা গরম করতে থাকে সানু। স্টোভের নীলাভ আগুনের শিখাকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে সে ভাবে, ভাগ্যিস ছোটোবেলা থেকে সে মায়ের কাছে বসে রান্না করা দেখতে ভালোবাসত! নইলে আজকে কে এই তিনটে মানুষের পেটের অন্ন নিয়মিত জোটাত?

আনুর ঘরে বিছানায় একটা প্লেটে রুটি আলুভাজা আর চা রেখে এল সানু। এর মধ্যে একটা শ্যাওলা রঙের জংলা ছাপঅলা ম্যাক্সি পরে নিয়েছে মেয়েটা।

আনু চিৎকার করে বলল — আমার এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

নরম গলায় সানু বলে — খা বোন। খালি পেটে আছিস, পিত্তি পড়ে যাবে।

— বললাম তো খাবো না। এবার কিন্তু ছুঁড়ে ফেলে দেবো বলে দিচ্ছি।

আঁতকে কাতর গলায় সানু বলে — সকাল থেকে খুব কষ্ট করে তৈরি করেছি আনু।

— এই নাস্তা মুখে তোলা যায় নাকি? রুটির ছিরি কী! ট্যারাব্যাকা; গোল করে নেচি বেলতেও জানো না। তোমার মতো অপদার্থ ছেলে ভূ-ভারতে পাওয়া যাবে না। পঞ্চাশ বছর বয়স পেরিয়ে গেল, তবু একটা চাকরিও জোটাতে পারলে না!

নিজের অপদার্থতা স্বীকার করে বাবার সঙ্গে এক থালা থেকে রুটি আলুভাজা খেতে খেতে সানু বলে — একটা চাকরি জোগাড় করা যে কী কঠিন ব্যাপার, নিজের জীবনে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। আসলে আমি একটা প্লেন বি-কম পাশ, স্মার্টনেস নেই, চালাক চতুর নই, ঘ্যাম ক্যাচ নেই, কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসার মতো বুদ্ধি আর সাহস কোনোটাই নেই, সুতরাং আমার কপালে কোনো চাকরি জোটা খুব মুশকিলের ব্যাপার, এ সব গল্প তোদের হাজার বার শুনিয়েছি বোন।

— তুমি সবদিক থেকে হোপলেস সানুভাই। এল.আই.সি.-র এজেন্টগিরি করে সকলে বাড়ি গাড়ি করে ফেলল, আর তুমি এখনও এই ভাঙা পৈত্রিক বাড়িতেই পড়ে থাকলে।

— সবই নসিব বোন। বিড়বিড় করে বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে এগোয় সে। তাড়াতাড়ি রান্না করে স্নান করে খেয়েদেয়ে তাকে দৌড়তে হবে। মেটিয়াবুরুজে একটা পুরোনো পার্টি খবর দিয়েছে। ট্যাক্স বেনিফিটের জন্য পলিসি করবে বলেছে।

নিজের ঘর থেকে চিৎকার করে আনু বলে — বেরোবার আগে আমার জর্দা দেওয়া পান আর তিন প্যাকেট 'শিকর' কিনে দিয়ে যাবে।

বিরক্ত হয়ে নিজের মনে সানু বলে — ডাক্তারসাহেব এতবার নেশা করতে মানা করেছে, তবু ওইসব ছাইপাঁশ খাবে। মানা করতে গেলেই এখনই দুনিয়া কাঁপিয়ে খিস্তি করতে শুরু করবে।

২

দুপুরবেলাটা সব থেকে বাজে কাটে আনুর। পাশের ঘরে বাবা ঠ্যাং ছড়িয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। এ-ঘরে একলা বিছানায় অলসভাবে সময় খরচ করে আনু।

মাঝে একটা এফ-এম রেডিয়ো কিনে দিয়েছিল সানুভাই। দুপুরবেলায় কিংবা সারারাত ঘুম না আসলে রেডিয়োটা বেশ বকমবকম করে ভালো সঙ্গ দিত। কিন্তু মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে কী যে পোকা নড়েচড়ে ওঠে, তখন মনের ভিতরে এত রাগ এসে যায়, সব কিছু তছনছ করে দিতে ইচ্ছে হয়। ব্যাস, এইরকম এক তীব্র ক্রোধের মুহূর্তে হাতের কাছে রেডিয়োটা হয়ে দাঁড়াল প্রচণ্ড শত্রু। ব্যাটার এত তেজ হবে কেন যে সারাক্ষণ কানের পাশে ননস্টপ বকবক করে কানের পোকা মেরে যাবে? সুতরাং একখানা বলিষ্ঠ লাথি — দূরে দেওয়ালের গায়ে ঠিকরে পড়ে চুরমার হয়ে গেল রেডিয়োটা।

সব থেকে ঝামেলা করে কানের কাছে ভেসে আসা কথাগুলো। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, সত্যি সত্যি আমার কানের ভিতরে কোনো রেডিয়ো ফিট করা নেই তো, নইলে এক অপরিচিত পুরুষের গলা কেন সে শুনতে পাবে?

হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। এই এক জ্বালা হয়েছে। ফ্যানটা চলছিল বলে তবু হাওয়া লাগছিল। এখন এত গরমে চুপচাপ ঘরের ভিতরে বসে থাকা যায়? আচ্ছা, একটা ডাণ্ডা দিয়ে সুইচ বোর্ডটা ভেঙে দিলে কেমন হয়? সানু মিঞার আরো কিছু পয়সা খসবে। ব্যাটা হাড় চিপ্পুস। এত করে বললাম সেদিন, একটা ইলিশ কিনে আনো বাজার থেকে। বলে কিনা, তিনশো টাকা কেজি, এখন কেনা যাবে না।

— কী গো আনোয়ারা বেগম, শুয়ে শুয়ে কী ভাবছ শাহাজাদি?

— বাজে বক বক করবে না। এখন এই লোডশেডিং-এ আমার মাথা খুব গরম হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে কখনো চোখে দেখিনি, না হলে ঝাঁটা মেরে ভূত ভাগিয়ে দিতাম।

— আমাকে তুমি ভয় পাচ্ছ বেগমসাহেবা?

— ভয়? কী ভেবেছ আমাকে? সকলে বলে, আনু খেপে গেলে দুনিয়া মাত করে দেয়। সেখানে তুমি তো কোন ছার!

— তুমি এত সাহসী বলেই তো নিয়মিত আসি তোমার কাছে।

— হাওয়া থেকে তোমার গলার আওয়াজ শুনতে আমার বেশ ভালোই লাগে। কত নতুন নতুন গল্প শোনাও। আসলে আমার তো কোনো বন্ধু নেই। আমি বেশ একা মানুষ। অবশ্য এটাই আমার ভালো লাগে। মনে হয় এটাই আমার পক্ষে মঙ্গলের।

— একা থাকা নর্মাল নাকি? তোমার একটা প্রেমিকও নেই? এমন চমৎকার সুন্দরী মেয়েমানুষ, এখনো বিয়ে হল না, তাই বলে একটা সিক্রেট লাভার থাকবে না? আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না বাপু।

— কেন তোমার কাছে পেট-খোলসা করব এখন?

— কলেজে পড়ার সময় অনেক ছেলে নিশ্চয়ই তোমার পেছন পেছন ঘুরত? লাইন মারত, চিঠি-চাপাটি দিত?

— তা ঘুরত বইকি! চিঠিও অনেক পেয়েছি। তখন আমি ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলাম। সত্যি সত্যি সে-সময়ের চেহারার সঙ্গে এখন কোনো মিল খুঁজে পাবে না। এখন কত মোটা হয়ে গেছি, গলার স্বরে আর কোনো সুর নেই, মিষ্টত্ব নেই, কতদিন গলায় কোনো গান আসে না।

— ওসব তোমার ভুল ধারণা। এখনো তুমি কত সুন্দর। যে কোনো পুরুষের বুকে আগুন জ্বেলে দিতে পারো।

— এবার আমি রেগে যাব। ফালতু প্রশংসা কখনো করবে না। আমি এখন নিজের সমস্যায় মরছি!

— তোমার আবার কীসের সমস্যা? সংসারে একটা কাজও তো গতর নড়িয়ে করতে হয় না। সানুভাই বাজার করছে, রান্না করছে, ঘর পরিষ্কার করছে, থালাবাসন মাজছে, কাপড় কাচছে...

— এই, এবার চুপ করো বলছি! তুমি তাহলে সানুভাইয়ের দালাল। শালা ইনসিওরেন্স কোম্পানির দালাল, আর তুমি হচ্ছ সেই শয়তানের দালাল। তোমাকে আমার চেনা হয়ে গেছে।

— তুমি আমাকে কিছুই চেনোনি আনোয়ারা। আমি সত্যি সত্যিই তোমার মঙ্গল চাই।

— আমার আর মঙ্গল চাইতে হবে না। দিনরাত আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শি সকলে আমার ক্ষতি করার জন্য তান্ত্রিকের সাহায্যে জাদু-টোনা করছে। আমি ঠিক বুঝতে পারি।

— এসব তোমার কল্পনা আনোয়ারা।

— তাহলে বলতে চাও শুধু শুধু আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল? বছরের পর বছর গোবরা মেন্টাল হসপিটালে সানুভাই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, ডাক্তাররা ওষুধ দিচ্ছে, আমি গিলছি, কখনো কাউকে না জানিয়ে বাইরে সেগুলো ফেলে দিচ্ছি ... দেখতে দেখতে আমার বয়স বেড়ে গেল, বিয়ে হল না, আইবুড়ো থেকে গেলাম, দিনদিন সকলের হাসির খোরাক হয়ে যাচ্ছি।

— দ্যাখো, তাহলে সত্যি কথাটাই বলে ফেলি, আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।

— একদম ফাজলামি করবে না। কোনোদিন দেখতে পেলে কী করি দেখতে পাবে।

— আদর করবে? সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।

— মাঝে মাঝে দেহের খিদে জাগে না, তা নয়। কিন্তু এখন এটুকু বুঝে নিয়েছি, ওসব প্রেম, ভালোবাসা, ঘর, সংসার, সন্তান, কোনো কিছুই আমার জন্য লিখে রাখেননি আল্লা।

— তোমার দুঃখ আমি ঠিক বুঝি আনোয়ারা।

— ছাই বোঝো। এই বুড়ি বয়সে আর ধ্যাস্টামো দেখাতে এসো না।

— তুমি কাউকে বিশ্বাস করো না কেন?

— কেন করব? আমি সকলের মনের কথা বুঝতে পারি। দূরে কাউকে কথা বলতে দেখলে তার ঠোঁট নড়া দেখে বুঝতে পারি, সে আমার নামে কী নিন্দা করছে। সব শালাকে আমার চেনা হয়ে গেছে।

— এসব ভুলভাল সন্দেহ করা ছেড়ে দাও।

— তুমি দেখছি সানুভাইয়ের মতো জ্ঞান দিতে শুরু করেছ। খানিকক্ষণ দেখব, তারপর হাত চালাবো। আমাকে এখনও চিনতে পারোনি ঠিকমতো।

— ছিঃ, একটুতেই অত উত্তেজিত হতে হয়? তোমার সুন্দর মুখ রাগে কেমন কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে।

— বেশ করছি, রাগ করছি। আমাকে নিয়ে রেডিয়োতে আলোচনা হচ্ছে, টিভিতে লাইভ কভারেজ দিচ্ছে, সব কিছু আমার কল্পনা? এত বড়ো ইন্টারন্যাশনাল ষড়যন্ত্র সি.বি.আই.-কে দিয়ে তদন্ত করানো উচিত। এসব কিছু ভাবতে বসলেই আমার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। আমার মতো একটা সাধারণ অবলা মেয়েমানুষ আর কত লড়াই করবে বলতে পারো? খবরের কাগজে পর্যন্ত আমাকে নিয়ে খবর করছে।

— তুমি নিজেকে এত ইম্পরট্যান্ট ভাবো কেন?

— সেটাই তো আমার সমস্যা। আমার মতো একটা নগণ্য মেয়েমানুষকে নিয়ে সকলের এত মাথাব্যথা কেন, সেটাই আমার বুদ্ধিতে কুলায় না।

— তুমি একবার জানলার সামনে এসে দাঁড়াও। অনুভব করার চেষ্টা করো, তোমার কাছে আছে এক বিচিত্র রূপরসগন্ধময় রহস্যময় পৃথিবী। ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে সত্যিকারের ভালোবাসার সুগন্ধি বুকের মধ্যে অনুভব করতে পারবে।

আর কথার উত্তর দিতে কিংবা ঝগড়া করতে ইচ্ছা করে না আনুর। ময়লা বিবর্ণ বিছানায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে সে। ঘুম আসে না। স্বাভাবিক নিয়মে সে অনেকখানি অন্যমনস্ক, কত কিছু স্মৃতির কণিকা মাথায় জমা হচ্ছে, তারা খেলা করছে, সে শুধু নির্লিপ্ত সময়ের শবদেহে কারুকার্যময় প্রশ্নচিহ্নের অর্থ খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হচ্ছে, অথবা স্বেচ্ছায় সময়ের কোনো গোপন টানেলের অন্ধকারে লুকোচুরি খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

৩

অনেককালের পুরোনো জার্মান প্রাইমাস স্টোভের পাম্পটা জোরে জোরে টিপতে থাকে সানু। আজ ফিরতে দেরি হয়ে গেল। বিকেলে মল্লিকপুরে গিয়েছিল বড়োবুবুর বাড়িতে। মন খারাপ থাকলে এরকম হুটহাট দুই দিদির বাড়িতে চলে যায়। ছোটোবুবু থাকে আক্রা সন্তোষপুরে। দু-জনের ভালো অবস্থা। ওদের কাছে গেলে ভালো ব্যবহার, সমবেদনা, কিছু সুখাদ্য, এসব অবশ্যই সে খুব তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। ভাগনা ভাগনি, দুলাভাইরাও ঠাট্টা-রসিকতা করেন, ওখানে ক-দিন থাকতে বলেন। কিন্তু তা কী করে সম্ভব তার পক্ষে? যার কাঁধে যে বোঝা চাপান আল্লা, মানসিক বিকারগ্রস্ত ছোটোবোন আর অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা; এদের দেখার কেউ নেই। বড়োভাই মোটা মাইনের চাকরি করে, বড়োলোকের সুন্দরী মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করেই আলাদা হয়ে গেছে। আর যোগাযোগ রাখেনি। শোনা যায় ফ্ল্যাট কিনেছে, গাড়ি কিনেছে, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে রসেবসে আছে।

স্টোভের ফ্লেম ভালোভাবে জ্বলে উঠলে ভাতটা চাপিয়ে দেয় সে। সকালের তরকারির অবশিষ্টাংশ আছে। দুটো আলু কেটে ভাতের মধ্যে দিয়ে দিল। সেদ্ধ হলে ভর্তা করা যাবে।

বাবা নিঝুম হয়ে শুয়ে আছে। হাঁ-করা মুখের ভিতর থেকে দাঁতহীন ফ্যাকাশে মাড়ি, কালো রঙের ছোপঅলা জিভ দেখা যাচ্ছে। বাবার জন্য খুব মায়া হয় সানুর। অসহায় মানুষটা। অথচ এই লোকটাই যখন সুস্থ ছিলেন, রোজগার করতেন, সুপুরুষ দিলখোলা মানুষটার পুরোনো দিনের চেহারা মনে পড়লে হাহাকার করে ওঠে সানুর হৃদয়। কী সুন্দর সাজানো গোছানো সংসার ছিল তাদের। সাধারণ চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন যেমন হয়। তবু তার ছেলেবেলার দিনগুলো এখনো মনে করিয়ে দেয়, সত্যি সত্যি স্বর্গের পারিজাত উদ্যানে কিছুদিন বসবাস করার সুযোগ তাদের হয়েছিল।

তখন বাবা ছিলেন এক আশ্চর্য জাদুকর, যিনি ইচ্ছে করলেই ঝুলি থেকে বের করতে পারতেন হাজার রকম চাওয়া-পাওয়ার রঙবেরঙের উজ্জ্বল মোহর। ভালোবাসা তখন খুব নিশ্চিন্তভাবে চোখ মেলে দেখতে থাকত জীবনের কত মূল্যবান রহস্যময় প্রান্তর, উপত্যকা, ঘাস, গাছপালা, নদীনালা।

পাশের ঘরে আনু আপনমনে বকবক করে যাচ্ছে। ও নাকি কানের মধ্যে নানারকম লোকের কথা শুনতে পায়, তাদের সঙ্গে গল্প করে, কখনো রেগে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটিও করে।

জ্বলন্ত স্টোভের দিকে তাকিয়ে সানু ভাবে, তাদের পরিবারের এই তিনজন মানুষের জীবন এত অভিশপ্ত হল কেন? মা বোধহয় আগে মারা গিয়ে বেঁচে গেছেন। বিশেষ করে বাবা ও আনুর এই দুঃখজনক পরিণতি তিনি চোখ মেলে দেখতে পারতেন না।

আজকে বালিগঞ্জ স্টেশনে মিনুকে দেখে খুব ভালো লাগছিল। এখনো কী সুন্দর ফিগার রেখেছে। পঞ্চাশের আশেপাশে বয়স হল, কেউ দেখে বলবে? সঙ্গে তার সুপুরুষ স্মার্ট স্বামী, দেখলেই বোঝা যায় তিনি একজন সফল মানুষ। আর চমৎকার তরুণ ছেলেটি নিশ্চয়ই ওদের সন্তান। ডাক্তারি বা ইনজিনিয়ারিং পড়ে বোধহয়।

একটা আইডিয়াল সুখী সংসারের ছবি। ট্রেনের জানলা দিয়ে ওদের তিনজনকে দেখতে কী ভালো লাগছিল সানুর।

আসলে মিনু ছিল তার কলেজ জীবনের স্বপ্ন, কবিতা লেখার প্রেরণা। সেই এক বয়স, যখন চোখে লেগে থাকে স্বপ্ন, মনের মধ্যে বুকভরা ভালোবাসার অনন্ত পিপাসা।

দু-জনে কত গল্প করেছে, সুযোগ সুবিধামতো শরীরের কাছাকাছি এসেছে, তার জন্য কোনো দ্বিধা মনের মধ্যে কাজ করেনি। তখন তারা নিশ্চিত ছিল বিয়ে তারা করবেই, দুনিয়া এদিক ওদিক হলেও তাদের প্রতিজ্ঞার যৌথ প্রতিকৃতি কোনোদিন ঝাপসা হবে না।

তবু খুব স্বাভাবিকভাবেই একদিন দূরত্ব বাসা বাঁধাল। সংসারের হিসেবে পিছিয়ে পড়া সানুর বদলে বাবা-মায়ের পছন্দের একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষকে সামাজিক স্বামী হিসেবে মেনে নিল মিনু।

প্রথমটা খুব রাগ আর দুঃখ হলেও ধীরে ধীরে সংসারের এই বেদনাপর্বের সব ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গাইতে শুরু করেছিল সানু, এই করেছ ভালো নিঠুর হে...

বস্তুত আজ মিনুকে এতদিন বাদে দেখে কবেকার ভুলে যাওয়া যৌনতার ইচ্ছেগুলো কাপাস তুলোর মতো তার মনের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

আনুকে ঠিকভাবে খাওয়ানো আজকাল ভারি সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। কোনোরকমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু-গাল মুখে তুলে উচ্চস্বরে নানারকম অখাদ্য কুখাদ্য গালাগাল দিতে দিতে নিজের ঘরে গিয়ে সে ঢুকল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাপের পাশে এক বিছানায় শুয়ে পড়ে সানু। কী মনে হতে বাবার হাতের তালুতে সে আঙুল দিয়ে লিখতে থাকে, দেখে নিয়ো আব্বা, আমাদের একদিন ভালো দিন আসবে। সেই পুরোনো দিনের মতো। আমরা সবাই সেদিন আগেকার মতো হাসব, নাচব, গান গাইব।

বৃদ্ধ বাবা কী বুঝলেন কে জানে। আপনমনে মধ্যবয়স্ক ছেলের গায়ে মাথায় হাত বোলাতে থাকেন। ছেলের কপালে খুব আদর করে একটি চুমু খেলেন। তাঁর চোখের কোটরে টলমল করছিল কতকালের জমা হওয়া অশ্রু।

চুপচাপ পাশ ফিরে শুয়ে থাকে সানু। সেই তরুণ বয়সে মিনুর সঙ্গে শারীরিক মেলামেশার

গল্প মনে পড়ে যায়। মাঝে মাঝে নিজেরই অবাক লাগে, সত্যি সত্যি আমার বুকের মাঝে কোনোদিন আশ্রয় নিয়েছিল ওই লাবণ্যমণ্ডিত সুন্দরী?

এভাবেই তার মনের ভিতরের এই অনন্ত খেলায় যৌনতা বেদনা আনে, আবেগের নীল তারাটির চোখ থেকে ঝরে পড়ে অশ্রু, পাখিরা একটি করে গাছের পাতা মুখে করে উড়ে আসে সমুদ্রের অপর কিনারে। স্বপ্নের সমুদ্রস্নানে শরীরে আশ্রয় নেয় অজস্র ঝিনুক, শ্যাওলা, জলচর প্রাণী এবং ঢেউয়ের লবণ। স্নায়ুর মেধাবী গভীরে উল্লাস ঝাঁপিয়ে পড়ে বাজনা বাজায়, সুর ওঠে, শিল্পের মতো প্রকৃতির নির্ভুল ধমনীতে বহে যায় স্রোত। নিজস্ব বর্ণমালায় কবিতা ছলকিয়ে ওঠে শরীরের আকাশে বাতাসে। উজ্জ্বল প্রজাপতি উড়তে থাকে এই বিষণ্ণ পরবাসে আর জলস্রোতে ভাসতে থাকে অজস্র অভিমান।

ধনপতির সিংহলযাত্রা

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

সাধু ধনপতি যাবে দক্ষিণ পাটনে। সপ্তডিঙা ভাসে ভ্রমরার জলে। ডিঙা খোলে হরিণ-নারিকেল-পারাবত-সিন্দুর, ডিঙা কোলে হরীতকী-বয়ড়া-মসুরি-তণ্ডুল। শত বাইন্যানি সন্ধ্যারাতে সেরে গেছে তরণীপূজা, কাণ্ডার ও গাবর বরণ। ভাসিয়েছে শত কদলীভেলা। পরল, গুয়া, কুল, কদলী, শিম, বেতুয়াশাক, মুলা, লাউপাতা, ক্ষীরের পুত্তলিকা, পুষ্প আর দীপ নিয়ে তারা এখন সুরনদী পথে, দেবলোক উদ্দেশে। ভ্রমরার ঘাটে পালে লাগছে হাওয়া, জলে জাগছে ঢেউ। এগিয়ে আসছে যাত্রাকাল। এমন সময় দূরে জাগে বালাকণ্ঠ, 'সাধু, সাধু।' সদাগর ডিঙা দুর্গাবরের কিনারে আসে। দেখে আলুথালু বেশে লহনা আসে নদীঘাটে। চিৎকারে বলে, 'ওগো সাধু, ভূত-পেতিনি বাস গড়বে ঘরে। কাউর-কামিখ্যার যোগিনীরা লোহিত বাসে হুলাহুলি দেবে। তুমি সাগর পাটন সেরে ফিরে এসে দেখো লহনার বাস বাঘ, নাগ আর মৃগপতির সঙ্গে, কাননে।' ধনপতির চোখ জুড়ে বিস্ময়। লহনা কথা জোড়ে কথার পিঠে,— 'দেবালয়ে ষোলো উপচারে ডাকিনী দেবতা পূজে খুল্লনা। প্রদক্ষিণ করে জলগর্ভা বারি। ওই যোগিনীর সঙ্গে সাধু বিনে আমি কেমন করে থাকব নাথ। আমি না জানি ছল, না ছলনা। না চিনি কাউর না কামিখ্যা। গুলাল, শিরীষ, বকুল, কুন্দ, আর পদ্মের মৃণাল এনে কোন মন্ত্রবলে বাণ মারতে হয় পতিকে, জানা নাই আমার। শ্বেতকাকের শোণিতের সঙ্গে কালিয়া কঙ্কুরের পীত আর ছিনা জোঁক কোন তন্ত্রে বাটতে হয়, আমি জানিনি পতি। তাই লহনা তোমার দুয়ো, খুল্লনা সুয়োরানি। তবে জ্ঞাতিজনে দোষ দিলে আমায় দুষো না। রুষ্ট হলে কুলদেব, বলো না আমায়। আমি পতিমুখী। অষ্টমুখী গৃহে, ধ্যান করে ভৈরবীর। দেখবে তো ত্বরা চলো সাধু।'

লহনার কথা শুনে সাধুর গৌরবর্ণ রাঙা হয়, স্ফীত হয় নাসা। কেশ ফোঁসে যেন কালিনাগ। সাধুর কোপ দেখে হর্ষ হয় লহনার। স্বামী সোহাগে বড়ো গরব বেড়েছে সুয়ার। তসরের শাড়ি দোছোটে পরে উড়ে বেড়াচ্ছে দিনরাত। দুবেলা দুবলাকে দিয়ে কেশমাঞ্জন চলছে। কবরীতে বাঁধছে মালতী-মল্লিকা-চাঁপা-গাভা। কর্ণে পরেছে কনক-বউলি, বাহুযুগে কনক-কেয়ূর আর পদে কনক-নূপুর। হাতে হেমদণ্ড আর আরশি। আরশিখানিতে দেখে বাবকের রসে মাজন করে কেমন লাগে অধরখানি। ওরে কুঞ্জরগামিনী ইন্দ্রের নাচনি, সাধু ছেড়ে, ছাগগুলোকে জল দেখা। ধামের বৃষটিকে ভুলে গোশালের গাভীটিতে তৈল দিয়ে কণ্ঠআল পাতা খাওয়া, বৎস বিয়োবে তাড়াতাড়ি। কে শোনে কার বাক্য! তিনি মণিগাঁথা কিঙ্কিণী পরে মরালের ধ্বনি তুলছেন ঝমঝম। দেখছে কলধৌত কণ্ঠমালা কতখানি কুচযুগলে লোটায়। এবার কত দেখবে দেখুক। সোনাবেণের ঠুকুরঠাকুর কর্মকারের এক ঘা। চলো তো সাধু। সোহাগের অনেক চুমু দিয়েছে, এবার রোষের একখানি কিল দাও তো সুয়া পিঠে। আমি নয়নসুখে দেখি খুল্লনা কেমন গড়াগড়ি যায় ভুঁয়ে।

পূজাগৃহ দ্বারে হাজির হয় ধনপতি। দেখে নৃত্য করে রামা। এ-দৃশ্যে কোনোদিন খুল্লনাকে দেখেনি সাধু। মনে হয় যেন দেবধামে কোনো সুন্দরী নাচে। দেহের মুদ্রার সঙ্গে ঘন বেজে চলে

কিঙ্কিণী-কঙ্কণ। তাণ্ডব নাচে রামা আর কোনো অদৃশ্য দেবদেবী বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা বাজায়। কণ্ঠে সুর ভাঁজে অনুচনা, অদ্রিকা, অলম্বুষা, অম্বিকা, অসিতা, কাম্যা, ক্ষেমা, তিলোত্তমা, পুণ্ডরীকা, প্রমথিনী, বিদ্যুৎপর্ণা, মিত্রা, মরীচি, রম্ভা প্রমুখ দেবলোকের কণ্ঠসুন্দরীরা। খুল্লনা নৃত্য করে আর তার বাহুযুগের কনক-কেয়ূর ঝলমল হাসে। রামার মুদ্রায় কুন্তলপাশ আকুল হয় যেমন মাঘ-নাগের ফণা প্রথম বসন্তবায়ুতে মাতনে মাতে। সাধুর মনে হয় পূজাগৃহটি যেন ঢেকে আছে প্রভাতের কুয়াশায়। আলো-আঁধারিতে কায়া আর ছায়া, মতি আর মায়া, আসক্তি আর বিরাগ, প্রকৃতি ও পুরুষ, স্থিতি ও প্রলয় নেচে চলে যন করতালিতে। সাধু অবাক হয়ে দেখে তার দেবগৃহে অবস্থান করে আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক-আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ, ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিগণ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিদেব, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এই ত্রিজগৎ। সাধু ভাবে সাত নগরে ঢোল পিটিয়ে তার সপ্তডিঙায় উঠল কুরঙ্গ, বিড়ঙ্গ, প্লবঙ্গ, কবুতর, হরীতকী, বয়ড়া আর তার গর্ভগৃহে ত্রিকাল নৃত্য করছে আপনাআপনি। একী দেখি!

সাধুর ঘোর কাটাতে লহনা ঠেলা দিয়ে বলে, 'তুমি ত্রিকালে ডুবলে নাথ, ওদিকে খুল্লনা পূজে ত্রিকোণ অঙ্গ। ওর নেত্য থামাও সাধু নইলে পাটন থেকে ফিরে দেখবে একটিও ছাগশিশু নাই। ওই রক্তবসনা সব ক-টি খাইয়েছে কাউর-কামিখ্যায়। তুমিও যদি বামাচারী হও আমি কোথা যাব সাধু, আমি কি বনচারী হব?'

বোধে ফেরে ধনপতি। নৃত্যের ঘোরে তার নেত্র দুটি অন্ধ হয়েছিল। লহনা-খুল্লনাতে রক্ষে নাই তার উপর চণ্ডা, চণ্ডী, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা। তাদের আবার চৌষট্টি যোগিনী। সাধু ধনপতির দেবালয়ে তাদের অর্চনা হবে? কী অদৃষ্টে এমন পাপিনী যুবতী ঘরে এল?

সাধুর রোষ দেখে ভগবতী ঘট ছেড়ে গগনে ওঠে। খুল্লনার কেশ ধরে কুপিত সদাগর। ভূতলে লুটায় রামা। রোষজুত ধনপতি বলে, 'আমি ধনপতি সদাগর, তুই কিনা তার ধামে পূজিস স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা? আমার জাত-কুল সব গেল। আমি কেমন করে বার হব নগরে, কেমন করেই বা যাব জ্ঞাতিগৃহে? লোকে বলবে দৈবপুরুষ দেশদাস, শঙ্খভূতি, আবটদত্ত আর বিম্বটগুপ্তের বংশধরদের সংসারে যজ্ঞ ছেড়ে যোগিনী পূজা হয়। ও-ভিটায় ভল্লুক, সিংহ, সর্প, কপিমুখীদের বাস। ও-সংসারে ওড়পুষ্পের অঞ্জলি পায় শূকর, কাক, মীন, মোরগ, ভেক আদি চৌষট্টি বাহন। যদি সব দ্বিজ বলে ধনপতি দত্তের শুভ কাজে নাই আমরা। না আসে উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধবাসরে। না গ্রহণ করে কনক, রূপা, বসন, বাস, ভুজ্য? তখন কী হবে খুল্লনা? যদি চান্দবেনে, শঙ্খ দত্ত, নীলাম্বর দাস, রাম রায় না আসে আমার গৃহে? অর্ঘ্য না গ্রহণ করে কুটুম্বজ্ঞাতি? সনাতন চন্দ, শ্রীধর হাজরা, বিষ্ণু কুণ্ড, অরবিন্দ দাস, রঘু দত্ত, গোপাল দত্ত, রাম দাঁ, জসমন্ত খাঁ, বাসুলা আর গোতানের ছয় ভাই ধুম দত্ত-যাদব-মাধব-হরি-শ্রীধর-বলাই না নেয় অর্ঘ্য, আমি কী করব? যদি না গ্রহণ করে নিমন্ত্রণ, আমি বেনেকুলে থাকব কেমন করে? পিতৃশ্রাদ্ধের কথা মনে নাই তোর? নীলাম্বর দাস বলেছিল দশমী-দিবসে আমিষ-অন্ন ভোজন করবে না সে। যখন বলা হল নিরামিষ রাঁধবে ব্রাহ্মণে তখন শোনায়, গয়া-গঙ্গা-জগন্নাথ দর্শন হয়েছে তাই ভিন্ন গোত্রে অন্নগ্রহণ করবে না। যে-ব্যাটার বাহান্ন পুরুষ লবণ বেচেছে এ-তার বায়না! শেষে মল-মনের বক্র কথাটি প্রকাশ করে—শুকনো জলাশয়ে মৎস্য, তেপান্তরে রজত- কাঞ্চন আর কাননে একাকী বুলে বেড়ানো বামা মিললে

মুনিজনাও কী ছাড়ে? নাকি হে সব বান্যার নন্দন। তাহলে ধনপতির ছাগল-রাখালি পত্নীর কী বিধান হবে? দেবকুলের বধূ সীতা রাবণভবনে অবস্থানহেতু অগ্নিপরীক্ষা দেয় আর মানবকুলের বাইন্যানি ছাড় পায় কেমন করে? আগে এটির সুব্যবস্থা হোক তারপরে অন্নগ্রহণ। কী হবে খুল্লনা, জ্ঞাতি যদি রাজঠাঁয়ে গিয়ে উচিত বিচারের কথা তোলে? রাজা বলে বামপথি ও-বামার পরীক্ষা নাও। কতবার তুই সরোবর জলে ডুবে পাল্লা দিবি পথিকের শ্বাসবলের সঙ্গে? কতবার কলসের বিষধরের মুখ থেকে নিয়ে আসবি কনক-অঙ্গুরি? কতবার উত্তপ্ত ঘৃতে হাত ডুবিয়ে তুলে আনবি কাঞ্চন? কতবার পাণিপুটে ধরবি হুতদেহ শাবল? কতবার তুলাযন্ত্রে দোষ পরীক্ষা দিবি? কতবার ঢুকবি জৌঘরে?

খুল্লনা বলে, 'আমাকে এ-জিজ্ঞাসা কেন নাথ? আমি তো আপন ইচ্ছেয় বনে ছাগ-রাখালি করিনি। ও ছিল সত্তার আধা-কপট প্রবন্ধরচন আধা আমার কপাললিখন। ওই পাণি-ফণী-ঘৃত-শাবল-তুলা পরীক্ষা কি আমার স্বেচ্ছা নিবেদন, নাথ? জৌঘর কী কারো ব্রহ্মানন্দধাম? সে ঘরে তো সাধু আধা বণিকবিধান আধা ও-বামার বিধি। বিধি আর বিধান কোনোটাই না তোমার হাতে, না আমার।

সাধু রোষে বলে, 'তুই কর্মদুষ্টা তাই তোর এত বিড়ম্বনা।'

লোহিতবসনা হাসে। বলে, 'দুষ্টা আমি জানি কিন্তু কর্ম কি আমার, সাধু? কর্মকারী পিতা লক্ষপতি, ঘটক দনাই পণ্ডিত, জ্ঞাতিগুষ্টি আর স্বামী-ভর্তা-অধিকারী-অধিপতি তুমি হে নাথ। আমি কর্মসাক্ষীও নই, সাধু। তারা হল সূর্য, চন্দ্র, যম, কাল ও পঞ্চ মহাভূত। আমার স্বেচ্ছা কোনো ক্রিয়া নাই তবু আমি কর্মচণ্ডালিনী, কর্মদোষী, কর্মনাশা। সাধুসখা দনাই পণ্ডিত বলেছিল যত গন্ধবন্যা আছে তার ভেতর রূপে, গুণে, শীলে, কুলে তোমার কন্যার যোগ্যপাত্র, ওহে লক্ষপতি, উজানি নগরের সপ্তডিঙা সাধু। ঘটকের মুখে বরের কীর্তি শুনে সম্বন্ধেসায় দিয়েছিল পিতা। পাপ প্রবাহিণী কর্মনাশা যে জাহ্নবীতে মেশে সে কী তার দায়? অদৃষ্টের চালক নই আমি, দৃষ্টেরও নিয়ন্তা নই তবু কেন এত কর্মদোষ। যে কর্মে আমার একমাত্র অধিকার সেই পাপকর্ম তো আমি নিস্পৃহ সম্পন্ন করেছি। বিষধর-জৌঘর প্রমুখ পঞ্চপরীক্ষা সেরে যে ওদন যে ব্যঞ্জন দিয়েছি জ্ঞাতি-বন্ধুজনে তাতে না ছিল গরল না অনল। শাক ভেজেছি, রেঁধেছি, ফুলবড়ি দিয়ে পাতলা সুপ, ঘিয়ে ছেঁকেছি পটল। কোনো পদে লবণ পড়েনি বাড়তি একরতি। কটু তৈলে ভেজেছি দশ পণ কইমৎস্য আর তাতে দিয়েছি আদারস। একটুও রোষ ছিল না রসে। চিতলের কোল ভেজেছি অত পণ কিন্তু পোড়েনি একটিও। রোহিত মৎস্যের ঝোল রেঁধেছি আলু-কুমড়া আর বড়ি দিয়ে, গাছমরিচের উগ্রচণ্ডা রাগ মেশেনি তাতে। ডালের সঙ্গে ভোজনের জন্য ভেজেছি বদরি, শকুল আর সফরী মৎস্য। সঙ্গে দিয়েছি দধি, ক্ষীর, মধু, ঘৃত, মরিচ ও কর্পূরবাসিত রসাল। এর একটি ভাগ বেশি হলে রসনার বাসনা অপূর্ণ থেকে যাবে। তেমন হয়নি সাধু। রন্ধনের পাকে ধন্যি ধন্যি করেছিল বণিককুল। ভেজেছি বেশ ক-ধামা কুমড়ার ফালি আর চিংড়ার বড়া। এরপর ছিল দধি, পিঠা আর মধুর পায়স। মধুমুখে খেয়েছিল বান্যাসমাজ।'

কপাটের আড়ে দাঁড়িয়ে শোনে লহনা। সাধু বলে পাপকর্মে কর্মদোষ আর খুল্লনা শোনায় পাপকর্মে জ্ঞাতিতোষ। বড়ো দুষ্টা, বড়ো শঠ, বড়ো টেঁটা এই মাগি। গা জ্বলে লহনার। গাত্রদাহ

সামলাতে না পেরে ঢুকে পড়ে ভিতরে। খুল্লনাকে বলে, 'কর্মের কী শেষ আছে বোন। শূরসেনের কুমারী কন্যা কুন্তী জন্ম দিল কর্ণে। তারপর বড়োপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মের ঔরসে, মেজপুত্র ভীম বায়ু বীর্যে, ছোটোপুত্র অর্জুন ইন্দ্র শুক্রে। মাদ্রীর দুটি সন্তানের জনক হল অশ্বিনীকুমার। বৃহস্পতির পত্নী তারার গর্ভে জন্ম নিল নিশাপতির পুত্র বুধ। দ্রৌপদীর হল পঞ্চপতি। বহিনী আমার, নারীকর্মেরও অন্ত নাই। কর্ম যোগিনী। দিবারাত্র ঘৃতাহুতি দেয় কর্মযজ্ঞে। তুমি খুকি তাই শোনোনি খানকিবৃত্তান্ত।'

খুল্লনা বলে, 'কুমারী কুন্তীর অতিথিসৎকারে সন্তুষ্ট মুনি দিল পাঁচ মন্ত্র। প্রতি মন্ত্রে আবির্ভূত হবে এক দেব। কিঙ্করের মতো পূরণ করবে কুন্তীর বাসনা। কৌতূহলী কুমারী কন্যা ডাক দিল দিবাকরে। এল দেব। কুন্তীর পরীক্ষা সফল। বলে ফিরে যেতে ব্যোমে। কিন্তু কে কার অধীন, কে কার বশবর্তী! দিবাকরের কামনা কুন্তীর কৌমার্য। শত আবেদন-নিবেদন করে শূরকন্যা কিন্তু দিবাকর তখন কামাম্বরে অগ্নিপিণ্ড। বলে ভস্ম করবে কুমারীকে। নিরুপায় কুন্তীগর্ভে জন্ম হয় সূর্যপুত্র কর্ণের। শুনো গো লহনা দিদি, ভস্মভয়ে রতিসুখ, এমন কথা আগে শুনিনি। আর দুটি যে সন্তান তাও পাণ্ডুর ইচ্ছাবলে। একদিকে ঋষি-অভিশাপে অবাপিত কামরসে মৃত্যুভয় অন্যদিকে নিঃসন্তানের স্বর্গপথে বাধা তাই পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্রকামনা। প্রতি বৎসরে একটি সন্তান চেয়েছিল পতি, কুন্তীর বাধায় থেমেছিল তিনে। আর মাদ্রীর যে সন্তানপ্রাপ্তি অশ্বিনীকুমারের ঔরসে তাও পাণ্ডুর ইচ্ছেয়। কুন্তী-মাদ্রীর কথা ছেড়ে দুই অশ্বিনীকুমারের কথা বলো দিদি। স্বামী নপুংসক তাই বঞ্চিমতীকে দিল হিরণ্যহস্ত নামে পুত্র আর প্রসববেদনা থেকে মুক্তি। বন্ধ্যা গাভীকে করেছিল দুগ্ধবতী। সত্যযুগে বন্ধ্যা গাভী দুগ্ধবতী হয় আর কলিতে বান্যা ঘরের বন্ধ্যা বালা কুচগিরিতে গরল জমায়, এও পোড়া চোখে দেখতে হল গো প্রাণের বহিনী। এবার শোন তারার বৃত্তান্ত।'

লহনা ধনপতিকে বলে, 'ওগো সাধু, লোহিত বস্ত্র আর ওড়পুষ্পে তোমার মোহিনী বালা যে বজ্রতারা হয়ে উঠছে। ওকে থামাও।' খুল্লনা বলে, 'বৃহস্পতিপত্নী তারা নিশাপতির সঙ্গে নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে দেবগুরু যে মমতাতে মজেছিল, সে কথা শোনোনি বহিনী? আর দ্রৌপদীর পঞ্চপতি? সে কি তার স্বেচ্ছা নির্ধারণ, সে কি তার আনন্দন?'

লহনা গালে হাত রেখে বলে, 'তুই কত পুরাণ কত শাস্ত্র জানিস সতী। শরীরটিতে বাঁধুনি আছে তাই ঘাটে তরী বেঁধে সাধু শোনে তোর বায়ুরূপ বাক্। তেমন দড় পতি হলে বসিয়ে দিয়ে আসত ইছানি নগরে। কে পুষবে বায়ুকোপের রুগি সংসারে?'

ধনপতি বলে, 'ঝারি-বারি ফেলে সংসারে গৃহমতে থাকো। ওই সব শ্মশানবাসিনী কালী, শ্রীফলশাখাবাসিনী চামুণ্ডাকে ছাড়ো।' লহনা বলে, 'ছাড়তে মন না চাইলে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলার সঙ্গে তুইও শ্মশানবাসী হ। সংসারে চিতাকাঠ সাজাবে, তা কী করে হয় বহিন। শিবভক্ত সাধু সইবে কেমন করে?'

খুল্লনা বলে, 'নিত্যদিনের এই চণ্ডীপূজা তা তো সংসারের জন্যেই। রোগমুক্তির কামনায় দশমহাবিদ্যার ব্রত। জ্বর, সর্দি, কাশ, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অম্লরোগ, অতিসার সব সারে দেবীর ইচ্ছায়। বসন্ত, ওলাউঠা, প্রমেহ, প্রদর, অধিক রজঃস্রাব সব গৃহ থেকে দূরে থাকে দেবীর আশ্বাসে। দেবী তুষ্ট হলে শ্বাসরোধ, শিবরোগ, নাসারোগ, চর্মরোগ, চক্ষুরোগ কিছু নাই।

আদ্যা, সনাতনী, শঙ্খিনী, শূলিনী, কপালমালিনী অভয় দিলে শোক নাই সংসারে, মানুষজন হয় শতায়ু, গাভী-ছাগ দীর্ঘায়ু, কুলখানি চিরায়ু। ভদ্রকালী, শিবা, দুর্গা ক্ষমা, চণ্ডভীমা, ভৈরবী গৃহে অবস্থান করলে চোর-বাটপাড়ের সাধ্য নাই সন্নিকটে আসে। ওগো সাধু, তুমি জলযাত্রী তাই ভয়ের বাস বুকের ভেতর। তুমি লবণপানিতে চলো তাই নলদলের মতো কাঁপি তিরতির। তুমি পরবাসে যাও তাই ত্রাসে ভুগি আমি। আমি অবলা বালা, না পারি সঙ্গ দিতে, না পারি সঙ্গে যেতে। তাই চণ্ডী আরাধনা। শ্রীরাম চণ্ডীবোধনে ফিরে পেল সীতা। তুমি চলো লঙ্কারাজ্যে। ফিরে এস বিনা ক্লেশে সপ্ততরী ভরে। অমি কাপড়ের খুঁটে গেরো বেঁধে সাতবার স্মরণ করব তারা মন্ত্র, তুমি দেখো সাধু পরবাসে কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। আমি একশো আটটি রক্তপদ্ম তারা নামে আহুতি দেব অগ্নিতে, তুমি দ্যাখো সাধু, কোনো নারী তোমাকে বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি কাক-পালকের ওপর বত্রিশবার ওই মন্ত্র পড়ে ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবো বায়ুতে। তুমি দেখো ঝড় ও ঝাপটায় সমস্ত শত্রুর গৃহ একে একে শুয়ে পড়বে ভুঁয়ে।'

রোষে বলে ধনপতি, 'ওরে কুলের কালি খুল্লনা, আমার পণ ছিল ঘরে মায়্যা দেবতার আসন হবে না। তুই সেই পণ ভঙ্গ করালি। ওই চণ্ডীদেবী শত্রু-ঘর ভুঁয়ে শোয়াক পরে, তার আগে আমি ঘটের বিড়াটি ছুঁড়ে ফেলি। দেখি এবার তোর দেবী কোথায় পাছা ঠেকিয়ে বসে।'

সদাগরের পায়ের আঘাতে ছিটকে যায় খড়ের বিড়া আর গড়াগড়ি খায় মঙ্গলঘট।

বিলকিস ভালো আছে

অলোককুমার বসু

কিছু ঘটনা মানুষের মনে এমন দাগ রেখে যায় তা আর সারা জীবনে মোছে না। হয়তো কয়েকটা মুহূর্তের ছবি বা একদিনেরই কোনো ঘটনা তবু ভোলা যায় না তাকে, অথচ কত হাজার দিন চলে যায় আরো, আমরা ভুলে যাই সেসব দিন। তেমনি একটা স্মৃতির কথা লিখছি এখন। দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি, মৃদু কয়েকটা শব্দের উচ্চারণ আর কয়েক পাতা আঁকা-বাঁকা লেখা। তা যে এভাবে আমার চিরকালের সঙ্গী হবে কে জানত।

ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলছি। কেউ যদি যুগপৎ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং রাস্তা তৈরির লোক হয় তাহলে তেমন মানুষের কোনোদিন কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে না। আমারও নেই। পথ যেখানেই যায় আমিও যাই সঙ্গে সঙ্গে। এখন যেমন আছি বাংলাদেশে এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের এক প্রোজেক্টে। এরকম নানা দেশে গেছি কাজের খাতিরে। মাঝে একবার ওমান যেতে হয়েছিল এরকমই একটা প্রয়োজনে।

ওমান খানিকটা আরব সাগরের আর খানিকটা তার নিজের নামের উপসাগরের তীরে মধ্যপ্রাচ্যের একটি ছোটো তৈলসমৃদ্ধ দেশ। তার রাজধানী মাস্কাট সমুদ্রবন্দর নিয়ে সাজানো শহর। মাস্কাটের কাছে নিজওয়া থেকে ছোটো ছোটো জনপদ আদম, ঘাবা, হাইমা, দাউকা আর মনতাসার হয়ে, সুলতানের প্রিয় অঞ্চল এবং মোটামুটি সমৃদ্ধ জেলা সালালার থামরিট পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে গ্রেট ওমান মরুভূমির ওপর দিয়ে। মাঝখানে এই আদম। ঘাবা অথবা হাইমা শুনে তাদের মোটেই লিলুয়া, বর্ধমান বা কানপুরের মতো কিছু ভাববেন না যেন। তারা শুধু রাস্তার ধারে ধারে একটা নামের বোর্ড। বোর্ডের পাশে বড়ো রাস্তা থেকে একটা শাখাপথ ভেতরে ঢুকে গেছে বালিয়াড়ির মধ্য দিয়ে। তার মোড়ে একটা কিয়স্ক। সেখানে আপনি পাবেন চিকেন সসেজ দিয়ে তৈরি হট ডগ এবং ঠান্ডা পানীয়। ওই পার্শ্বপথ দিয়ে গেলে শেষ গন্তব্যে হয়তো কোনো মরূদ্যান আছে, আছে প্রাগৈতিহাসিক কোনো জলের কুণ্ড বা কোনো পরিত্যক্ত দুর্গ। সেখানেই কিছু মানুষের বসবাস থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু রাস্তা থেকে সেসব কিছু দেখ যায় না। শুধু শ-খানেক কিলোমিটার দূরে দূরে ওই বোর্ড আর কিয়স্ক। ব্যস! বাকি জমির ওপর সবটাই বালির রাজত্ব, হলদেটে, ফ্যাকাশে এবং অদ্ভুত। রাস্তায় দুরন্তগতিতে ছোটে বড়ো বড়ো তেলের ট্যাংকার আর গোষ্ঠিপতি আরব শেখদের মারসিডিজ। যাবাবর তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ *দৃষ্টিপাত*-এ লিখেছিলেন 'বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ।' এখানে দাঁড়ালে বিজ্ঞানের বেগ তো নজরে পড়ে কিন্তু কেড়ে নেওয়ার মতো আবেগের কিছুই বাইরের পৃথিবীতে দেখা যায় না। রাস্তার ধারে দু-একটা গাছের ঝোপ আছে মাঝে মাঝে। তাও খুব বিরল। প্রাণের আর কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। আবেগ তাহলে শুধু মানুষের মনে। কিন্তু মানুষ কই এখানে? চারিদিকে শুধু মাঠ। মানুষ হয় বাড়ির ভেতরে নয় গাড়ির ভেতরে।

এখানে কেন এলাম এবার সেটা তাহলে বলি। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক আনুকূল্যে তৈরি এই নিজওয়া থামরিট এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কিছুদিন পরেই জায়গায় জায়গায় ফেটে গিয়েছিল। ওমান সরকার আমাদের ডেকেছিলেন সেটা দেখে তার কারণ বার করতে এবং পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের একটা প্রস্তাব দিতে। প্রায় আটশো কিলোমিটার পথ। সবটা এক দিনে দেখে প্রস্তাব দেওয়া সম্ভব নয়। দিন দু-এক তো লাগবেই। তার আগে মাস্কাটে ওমান সরকারের হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টে বসে রাস্তার নির্মাণ ইতিহাস জানতে কয়েকদিন গেল। কী পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে তাকে, নীচে কোন ধরনের মাটি আছে, সারাদিনে এই মরুভূমিতে তাপমাত্রার কীরকম পরিবর্তন হয়, কত ওজন নিয়ে এবং কী সংখ্যায় ভারী গাড়ি তার ওপর চলাচল করে এই সবই এ-ব্যাপারে দরকারি তথ্য দিতে পারে। এই সব প্রয়োজনীয় পড়াশুনা করে নেওয়ার পর একদিন সকালে বেরিয়ে পড়েছিলাম মাস্কাট থেকে নিজওয়া হয়ে থামরিটের দিকে।

সময়টা ছিল এপ্রিল। আকাশে দাউদাউ করে জ্বলছে সূর্যের শরীর। চারিদিকে যতদূর চোখ যায় উদাসীন বালির প্রান্তর। তার মধ্যে উটের পিঠের মতো বালির স্তূপ। আমি দেখেছিলাম উটের পিঠ, এম. এফ. হুসেইন হলে হয়তো এর মধ্যে গজগামিনীকে দেখবেন। জিওলজির পরিভাষায় একে বলে স্যান্ড ডিউন। বালির মধ্যে মিশে থাকা অভ্রের কণা ঝিকমিক করে জ্বলে। এই পথ আর মাথার ওপর সূর্য ছাড়া কোথাও প্রাকৃতিক কোনো দিকচিহ্ন নেই। চারিদিক সমান। গাড়িতে শুধু আমার চালক নূর মোহাম্মদ আর আমি। দু-পাশে মাঝে মাঝে শাদা ধবধবে চুনাপাথরের মাঠ। দেখে মনে হয় পৃথিবী নয়, অন্য কোনো গ্রহ বুঝি। এরই মধ্যে মাথায় একটা বড়োসড়ো বেতের টোকার মতো টুপি পরে নামতে হচ্ছে রাস্তায়। ছবি নিতে হচ্ছে সঙ্গে আছে ভয়েস রেকর্ডার। যা দেখছি রেকর্ড করছি সেসব। এই থেকেই তৈরি হবে আমাদের প্রস্তাব। যেখানে থামছি সেখান থেকে পরের গন্তব্যে আবার গাড়ি দৌড়োচ্ছে ঘণ্টায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে। এই রাস্তায় এটাই আইনসম্মত গতিসীমা। নূর মোহাম্মদের গাড়িতে বেঁধে দেওয়া এই গতিসীমা অতিক্রম করলে একটা বাজনা বাজে টিং টিং করে। সেটা প্রায়ই বেজে উঠছিল। তবুও রাস্তা পরিদর্শনের জন্য থামতে হচ্ছে বিস্তর। তাই অর্ধেক পথ পৌঁছোতেই সন্ধ্যা হয়ে এল। তারপর অন্ধকার। রাত কাটাবার জন্য একটা আশ্রয় আছে। খবর নিয়ে এসেছি একটা ড্রাইভ ইন মোটেল আছে হাইমাতে। কিন্তু সেখানে পৌঁছোতেও তো রাত আটটা হবে। পেছনের সিটে গা এলিয়ে বসলাম। নূর মোহাম্মদ কেরালার লোক। লতা মুঙ্গেশকরের গানের ক্যাসেট ছিল গাড়িতে। চলতে লাগল সেটা। 'মেঘা ছায়ে আঁধি রাত বৈরন বন গয়ে নিন্দিয়া।' হেডলাইটে তখন দেখা যায় বাইরে ঝোড়ো বাতাসে বালির স্রোত বইছে রাস্তার ওপর দিয়ে। হাইমার নাম লেখা বোর্ড দেখা গেল এর পরেই।

একতলা ড্রাইভ ইন মোটেল। রাস্তা থেকেই দেখা যায়। সামনেই কয়েকটা বড়ো গাড়ি পার্ক করা আছে। মোটেলের পেছনের সমান জায়গায় কয়েকটা খেজুরগাছ। দুটো উটকেও বিশ্রাম নিতে দেখলাম। হয়তো এখানেই কোনো মরূদ্যান আছে। রিসেপশনে গিয়ে ঘর বুক করে কাউন্টারের টেলিফোন লাইন থেকেই একটা কল করছিলাম বাংলাদেশে। সেখানে তখন এডিবির আর্থিক আনুকূল্যে চিটাগাং পোর্টের জন্য শহরকে বাইপাস করে একটা পোর্ট অ্যাকসেস রোডের

ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। তা ছাড়া ময়মনসিংহের একটা রাস্তাও হাতে নেওয়ার কথা। সেই সব ব্যাপারে কিছু জরুরি বিষয় জানাচ্ছিলাম ঢাকাতে নিযুক্ত আমার সহকর্মী ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত দত্তকে। কথা বলার সময় একজন আরব শেখ এসে ঢুকলেন। চেহারা খুব একটা লম্বা-চওড়া নয়। মাঝারি ফ্রেমের বলা যায়। পরনে ওমানের জাতীয় পোশাক। শাদা ধবধবে আলখাল্লার মতো দামি মসলিনের একটা পরিধেয় যার নাম কুন্তুরা। মাথায় গোল করে আরব স্টাইলে ছোটো কাপড়ের পাগড়ি। কোমরে কাপড়ের কোমরবন্ধ এবং তাতে গোঁজা আছে ওমানি খঞ্জর। এটাও জাতীয় পোশাকের অঙ্গ এবং সাধারণত রইস লোকেরাই কোমরে রাখেন। তার পেছনে আসছিলেন বোরখা আবৃতা এক রমণী। সম্ভবত তাঁর বেগমসাহেবা। শেখ তো কাউন্টারে এসে স্টাফদের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় আলাপ শুরু করলেন। আরবদের আলাপ এক কথায় শেষ হয় না। কাজ বেশি নেই। যেটুকু আছে সেটা আমাদের মতো বিদেশিরাই করে। সুতরাং ওনাদের অনেক কথা থাকে। আমাদের গত শতাব্দীর জমিদারি স্টাইল আর কী।

মধ্যপ্রাচ্যে অনেক আরবই নিজস্ব ধরনে শৌখিন মানুষ। রইসদের মধ্যে খুব দামি সুগন্ধ ব্যবহার করা একটা সামাজিক প্রথা। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় টের পাওয়া গেল সেটা। মরুভূমির অত ভেতর থেকে কথা বলছিলাম বলেই বোধ হয় বাংলাদেশের লাইনে প্রতিধ্বনি হচ্ছিল খুব। আওয়াজও খুব কম। আমাকে বেশ চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছিল। অগত্যা উভয়ের সুবিধার্থে শেখ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করলেন। আমি চিৎকার করতেই থাকলাম—'না দেবু, তুমি ওনাদের বলো, আমরা ফৌজদারহাট থেকে অ্যালাইনমেন্টের প্রথম সাত কিলোমিটার সমুদ্রের তীরে শহর-রক্ষা বাঁধের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাব। এটা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি, কাজেই জমি অধিগ্রহণের সমস্যা নেই। আমি দিন সাতেকের মধ্যেই ঢাকায় ফিরছি। ময়মনসিংহের রাস্তাটা তারপর ঘুরে আসা যাবে। ... হ্যাঁ কী বললে, এটা কেমন জায়গা? নিজওয়া থেকে বেরোলেই কেবল মরুভূমি। অতিশয় নীরব জায়গা ভাই। এখানে খালি বালি চারদিকে, তবে মাস্কাট ভালো শহর। বেশ সাজানো...' ইত্যাদি। কথা বলতে অবশ্য আমরাও শেখেদের থেকে কম যাই না সময় সময়। তবে এখন এজন্য আমার একটা ন্যায়সংগত অধিকার ছিল। অনেকদিন বাংলা বলিনি। দম যে আটকে ছিল এটা নিজেই বুঝতে পারলাম। শেখের তন্বী অনুগামিনী ততক্ষণে রিসেপশনের সামনের লাউঞ্জে সোফাতে গিয়ে বসেছেন। আমি সেদিকে মুখ করেই রিসিভারটা ধরে ছিলাম। এই অবস্থান থেকে ওনার মুখের খানিকটা দেখতে পেলাম। বোরখার চোখের কাছে খানিকটা আবরণ নেই। সেখানে সূক্ষ্ম সিল্কের জাল লাগানো। তার আড়াল থেকে দুটো উজ্জ্বল কালো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখলাম। আরব্য রজনীর রাজকন্যারও তাহলে এমন মায়া জাগানো চোখ ছিল। চোখের ওপর ভ্রূমধ্যের যেটুকু অংশ বেরিয়ে আছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে গায়ের রং দুধে আলতার মতোই। কিন্তু চোখদুটিতে আর কালো ভ্রূতে যেন কোনো নিপুণ চিত্রকরের আঁকা তুলির টান। গভীর আর সজল। যেন জলের অদৃশ্য রেখায় কত কিছু কথা লেখা আছে এই দৃষ্টির আয়নাতে। চোখে চোখ পড়তে তিনি দৃষ্টি অবনত করলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ফিরে চাইলেন। আবার মুহূর্তে মুখ নিচু করে চেয়ে রইলেন কার্পেটের দিকে। এই দেশে এই সমাজে এমন তো

হওয়ার কথা নয়। পরপুরুষের চোখের দিকে একবার চোখ পড়ে যেতে পারে। আবার ফিরে দেখা মানে তার ব্যাপারে কৌতূহলী হওয়া। এত কথা অবশ্য ভাবিনি তখন। স্বাভাবিকভাবেই অন্যদিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলাম আমি। গাড়িতে গিয়ে আমার ব্যক্তিগত জিনিসগুলো নিয়ে এলাম সেখান থেকে। ততক্ষণে শেখ সাহেবও কথা শেষ করে যাচ্ছেন করিডোরের দিকে। তার অনুগামিনী সোফা থেকে উঠে এগোচ্ছেন, তবে তার সঙ্গীর থেকে খানিকটা পেছনে পড়ে আছেন। তার গতি যেন ইচ্ছে করেই অনেক ধীর। আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। খুব ধীরে প্রায় শিশির পতনের শব্দের মতো নারীকণ্ঠ এল পাশ থেকে—'যা বলব তা শুনে দাঁড়াবেন না। এগিয়ে যান। আমি ময়মনসিংহের বিপাশা, এখন বিলকিস। আপনি?'

এমন বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে ভাবতে পারিনি। কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করতে দেরি হয়নি আমার। কোনোরকমে আমার নামটা নিচু গলায় উচ্চারণ করে দ্রুত এগিয়ে গেলাম নিজের ঘরের দিকে। করিডোরে গিয়ে ঘরের চাবি খুলে ঢুকলাম। বেশ বুঝলাম পেছনে আসতে আসতে বোরখার আড়ালের দুটি চোখ সব লক্ষ করছে।

রাত্রে, সারাদিনের করা কাজের ভয়েস রেকর্ডিং আর রাস্তার নকশার পর্যবেক্ষণ থেকে নোট বানাচ্ছিলাম আমাদের প্রস্তাব তৈরির জন্য। এই রাস্তার সমস্যাটা মনে হয় খুঁজে পেয়েছি আমি। সয়েল এবং জিওলজি রিপোর্টে বলছে এখানে রাস্তার নীচে জায়গায় জায়গায় মার্ল নামে একটা মিনারেল আছে। ওমান শুকনো জায়গা হলেও কখনো কখনো ক্লাউড বার্স্ট হয়, বাংলায় যাকে বলা যায় মেঘ বিস্ফোরণ। পাঁচ বছর কী দশ বছর পর পর উপসাগর থেকে হঠাৎ করে একদিন গভীর কালো মেঘ এসে মুষলধারে বৃষ্টিপাত ঘটায়। সেই জন্য মরুভূমির মধ্যেও কালভার্ট রাখা আছে। মার্ল এমনিতে শক্ত, কিন্তু জলে ভিজে গেলে নরম হয়ে যায়। ওমানে কয়েক বছর আগে ক্লাউড বার্স্ট হয়েছিল। রাস্তায় দেখা ফাটলগুলো মোটামুটি মার্ল পাওয়া যায় এইরকম জায়গাতেই আছে মনে হয়। কিন্তু এতসব কিছু টেকনিকাল চিন্তাভাবনার মধ্যে দুটি কালো চোখ বারবার ভেসে উঠছিল মনে। ময়মনসিংহের মেয়ে এই মরুভূমিতে শেখদের ঘরণী হয়ে এল কীভাবে? হোটেলের ঘরে টিভি ছিল। কিন্তু কেবল টিভির বোকা বাক্স কোনোদিনই খুব একটা আকৃষ্ট করে না আমায়। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছিল অনেক আগেই। ওমানের ঘড়ি কলকাতার থেকে চার ঘণ্টা পেছনে চলে। শরীরের নিজস্ব ঘড়ি তো আর চাকরির প্রয়োজনে পালটায় না। তাই অতটা না হলেও খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে যেত। খসখস আওয়াজ শুনে বিছানা থেকে তাকিয়ে দেখি ঘরের দরজার নীচ দিয়ে একটা খাম দিয়ে গেল কেউ। হোটেলে কোনো মেসেজ এলে অবশ্য অনেক জায়গাতে এভাবেই দিয়ে যায়। কিন্তু এখানে আমাকে মেসেজ পাঠাবে কে? উঠে গিয়ে দেখি খামের ওপরে মেয়েলি হাতে বাংলায় আমার নাম লেখা।

দরজা খুলে কাউকে দেখলাম না। যে-ই এসেছে খুব দ্রুত সরে গিয়েছে সে। আমার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি।

ঘুম-চোখ থাকলেও ভোরবেলা কে দিয়ে যেতে পারে এমন একটি খাম তা অবশ্য বুঝতে পারছি। ভেতরে দীর্ঘ একটি চিঠি। হোটেলের ঘরে রাইটিং ডেস্কে যে প্যাড এবং খাম দেওয়া

থাকে তাই ব্যবহার করা হয়েছে দেখলাম। এই চিঠি বহুদিন ধরে আছে আমার সঙ্গে। তাতে যা লেখা আছে উদ্ধৃত করলাম নীচে —

মাননীয় অলোকবাবু,

খুব ঝুঁকি নিয়ে এই চিঠি আপনাকে দিতে হবে। শেখ সাহেব জানলে আমি শেষ। আপনি পরপুরুষ তো! খুব সম্ভব এটা 'কবিরা গুনাহ্'। অর্থাৎ ভীষণ ভীষণ পাপ। হয়তো আমায় মেরেই ফেলবে জানতে পারলে। তবে লেখবার সময় ঝুঁকি নেই। বাংলা তো এ বুঝবে না কিছু। আমি প্রতিদিন অনেক সময় ধরে ডায়েরি লিখি। আমার শরীরটা ভালো লেগেছে বলে এবং খানিকটা শুধু মায়ায় পড়ে শেখ সাহেব আমাকে নিয়েছেন। আমরা কেউ কারো ভাষা তো বুঝি না এখনো। দু-একটা শব্দ ছাড়া। এই যেমন 'মুশ তামাম' মানে ভালো না, 'মাফি মুশকিল' মানে সমস্যা নেই — ব্যস এইরকমই ভাঙা ভাঙা দু-একটা কথা শিখেছি এখন অবধি। প্রথমে ভয় ছিল কে জানে এসব লেখালেখি উনি কীভাবে নেবেন। অনেক কষ্টে হাবেভাবে ওনাকে বোঝাতে পেরেছি সবসময় তো ওনার আমাকে লাগে না। যখন লাগে তখন তো আমি আছি। আমি ছাড়াও ওনার আরো তিনজন বিবি আছেন। আমি তো সবার ছোটো। কত সময় একা থাকি। ডায়েরি লিখে আমার মন হালকা হয়। অনেক সময়ই উনি ঘুমালেও আমি টেবিলে এসে লিখি। উনি এজন্যে এখন আর কিছু বলেন না। এটা অবশ্য ডায়েরি নয়, হোটেলের প্যাডের কাগজে লিখছি। লিখছি এখন কিন্তু আপনাকে দিতে হবে কাল ভোরবেলা। চুপি চুপি। উনি কোনোদিন ভোরবেলা ওঠেন না। বেলা আটটার সময় উঠে কাওয়া খান তারপর বিছানা ছাড়েন। কাওয়া কী জানেন তো? চা-এর মতো অনেকটা। এখানে আরবরা খায়। আমি খাই না। ভালো লাগে না। আবদুল্লা অর্থাৎ শেখ সাহেব আমাকে অনেক সময় খেতে দিয়েছে। বলে 'জেন, জেন'—অর্থাৎ ভালো, ভালো। আমি ঘাড় নাড়ি। বিশ্রী খেতে! ও, ওনার পুরো নাম তো জানেন না। ওনার নাম শেখ আবদুল্লা ইবনে আজিজ। অর্থাৎ আজিজের পুত্র আবদুল্লা।

আপনার নাম অলোক বসু বললেন তো, তাই অলোকবাবু বলেই সম্বোধন করলাম আপনাকে। আমাদের গ্রামে তো এইরকমই নিয়ম ছিল বড়োদের মধ্যে। আমি এখন বড়ো হয়ে গেছি না? তিন বছর হয়ে গেল এস.এসসি. পাস করেছি। আমার বাবাকে লোকে অমলবাবু বলে ডাকত। আবার অনেকে পুরুতঠাকুরও বলত। বাবার পুরো নাম অমল মুখোপাধ্যায়। আমি তার মেয়ে বিপাশা। পরীক্ষায় আমি অনেক নম্বর পেয়েছিলাম। কিন্তু...

আমাদের গ্রাম হয়তো আপনি চিনবেন। আপনি যে টেলিফোন করছিলেন বাংলাদেশে তাতেই বুঝলাম আপনি খুব ঘোরেন সারা দেশে। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ তো আপনি যাবেনই। ময়মনসিংহ থেকে ঈশ্বরগঞ্জ গিয়ে বামের রাস্তাটায় পাবেন সোহাগীর বাজার। রাস্তাটা সেখান থেকে সোজা বুড়িগঙ্গা নদীর তীর পর্যন্ত গেছে। বুড়িগঙ্গা নদীর অন্য পাড়ে আমার গ্রাম কুমোরখালি। ওখানে কিন্তু কোনো সেতু নেই। আপনাকে ওখানে গাড়ি থেকে নামতে হবে। তারপর দেখবেন একটা নৌকা আছে, তাতে এপার-ওপার দড়ি বাঁধা। নৌকা যদি ওই পারে

থাকে তাহলে দড়ি টেনে এপারে আনতে হবে। তারপর ওপারের দড়ি ধরে টানলে নৌকা ওপারে যাবে। খুব সোজা, সবাই পারে। আপনিও পারবেন। কুমোরখালিতে একটা কালীমন্দির আছে। ভাঙাচোরা বহু পুরোনো। চারিদিকে বট আর অশ্বত্থ গজিয়েছে। প্রায়ই সাপ বেরোয়। কাউকে কালীমন্দির কোথায় জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে। তার পাশেই আমাদের বাড়ি। বাবা এখনো পুজো করেন ওই মন্দিরে। কতবার লোকে রাত্রিবেলায় মূর্তি ভেঙে দেয়। বাবা আবার যত্ন করে বানান। কোনো মানে হয় বলুন? নিজেই নিজেকে বাঁচাতে পারে না, দুষ্ট লোকে এসে পা ভেঙে দেয়, হাত ভেঙে দেয়। যে ঠাকুর তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, সে-ঠাকুর বাঁচাবে আমাদের? যেমন ঠাকুর তেমন তাঁর পূজা? সারাদিন খালি গান করেন 'কোথা ভবদারা, দুর্গতিহরা, কতদিনে তোর করুণা হবে।' করুণা কোনোদিনও হবে না। যাকগে সে-কথা। বাবাকে এসব বললেও শুনবে না কোনোদিন।

মানুষ যত না, তার থেকে বেশি গ্রামটার কথা মনে পড়ে আমার কষ্ট হয় জানেন। ভোরবেলা নিজের মনে বেড়াতাম আমি। আমার বাবা-মা কোনোদিন বারণ করতেন না। তখনই তো নাসির একদিন পিছু নিল আমার। তারপরেই আমার পৃথিবীর সব কিছু পালটে গেল।

অনেক ভোরে আলোর সঙ্গে হালকা কুয়াশা মিশে থাকে। যেন একটা নতুন পৃথিবী জন্ম নিচ্ছে মনে হয়। ঘাসের মধ্যে জমে থাকে শিশির। ঠিক মুক্তোর মতো না? কী ভালো লাগে তখন ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটতে! আর ভোরবেলা সব থেকে মজা লাগে হাঁসগুলোকে দেখে। সারারাত ওদের একটা কাঠের ঘরে আটকানো থাকে তো। ভোরবেলা ছাড়া পেলেই ডানা ঝাড়া দেয় আর লাইন দিয়ে প্যাঁকপ্যাঁক করতে করতে দৌড় দেয় নদীর দিকে। এক দল হাঁস যারা নদীতেই থাকে তারা এদের দেখে জোরসে ডাকাডাকি করতে থাকে। যেন একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছে, 'কী ভাই, ভালো আছ তো?' আর এখন এপ্রিল মাস না? তার মানে বসন্তকাল সবে শেষ হবে। এই সময়ই আমাদের বাড়ির কাছে শিমুলগাছে খুব লাল লাল ফুল হয়। যখন প্রথম সূর্যের আলো পড়ে তখন আরো লাল হয়ে যায়। ঠিক মায়ের সিঁদুরের মতো লাল। আমারও বিয়ে হয়েছে কিন্তু আমি সিঁদুর পরি না। এখন তো আর বিপাশা নই, এখন আমি বিলকিস। শেখ সাহেবের বিবি। আমাদের এসব নিয়ম নেই। কিন্তু মা যখন সিঁদুর পরতেন বেশ লাগত। সিঁদুর পরতে গেলে অল্প কিছু নাকের ওপর উড়ে এসে পড়ত। আমার ঠাকুমা বলতেন এটা নাকি শুভ লক্ষণ।

এখন খুব সকাল তো! এখন মা আমাদের ঘরের পেছনে সবজি বাগান থেকে তাজা তাজা শিশিরমাখা সবজি তুলবে সবজি-খিচুড়ি রান্নার জন্য। আমাদের গ্রামে এই খাবারটা অনেকেই জলখাবারে খায়। আপনি খেয়েছেন কখনো? খুব মজা লাগে গরম গরম খেতে।

আমাদের বাড়ির কাছ দিয়েই মসজিদে যাবার রাস্তা। ওখান দিয়ে গ্রামের মুরুব্বিরা এইসময় ফিরতেন ফজরের নামাজ সেরে। খুব ভোরে আমি মাঝে মাঝে নদীর ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম দূরের আর একটা নির্জন ঘাটের দিকে। ওখানে কোনো পারাপারের খেয়া নেই। জল খুব নিঝুম নীল। নীল আকাশের ছায়া পড়ে জলে। মাঝে মাঝে কচুরিপানা ভাসে। ঘাটে বাঁধা কোনো জেলে নৌকা অল্প অল্প দুলতে থাকে হাওয়াতে। ওইখানে নাসির যেত আমার

পিছু পিছু। সে বলত যে আমায় ভালোবাসে। আমায় না পেলে সে মরে যাবে। বলত — 'আমি চাঁদেরই সাম্পান যদি পাই, সাত সাগরে পাড়ি দিয়া তরে লইয়া যাই।' মিথ্যুক, একদম বাজে কথা।

আপনি যে ফোনে বলছিলেন না আপনি যেখানে এসেছেন এটা খুব বিশ্রী জায়গা, কেবল বালি, তা কিন্তু নয়। আপনি যখন এই রাস্তার শেষে সালালা পৌঁছোবেন দেখবেন অনেক সবুজ আছে। একেবারে অন্যরকম। অনেক সবজি হয় সেখানে, কলাগাছ আছে, বড়ো বড়ো পেঁপে হয়। ওমান দেশটাও সুন্দর। শেখ সাহেব আমাকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। নতুন বিবি তো তাই। ওমানে একরকম সুন্দর সাজানো মস্ত বড়ো নৌকা হয়, তাকে বলে ধাও। আমরা তাইতে করে বেরিয়েছিলাম সমুদ্রে। কী সুন্দর নীল জল! ওখানে অনেক বড়ো বড়ো শুশুক আছে। শেখ সাহেব দেখতে পেয়ে আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন 'ডলফিন'। ওরা আমাদের খুব কাছে চলে এসেছিল। ওরা মানুষকে ভালোবাসে। ওরা খুব ভালো।

নাসির খুব খারাপ ছিল। যখন সেই নির্বাচনের গোলমালের পর রাতে গ্রামে হিন্দু মেয়েদের খোঁজ করতে লাগল খারাপ লোকে, তখন আমি আর মা কাছেই রহিমচাচার বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। আমাদের প্রতিবেশী যারা লুকোতে পারেনি তাদের অনেককেই পরের দিন নিঃশব্দে কাঁদতে দেখেছি। এসব কথা তো আর কাউকে বলা যায় না। এর পরে নাসির আমাকে ডেকে বোঝাল যে এইখানে আর থাকা যাবে না। আমি তোমায় নিয়ে অন্য দেশে চলে যাব সোনা। সেখানে তুমি খুব সুখে থাকবে। নাসির তখন মাঝে মাঝেই গ্রামে থাকে না। ঢাকাতে যায়। তার বেশ পয়সাও হয়েছে বোঝা যায়। তার নাকি কীসের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা। তখন কী জানি এই আমদানি-রপ্তানি শুধুই মানুষের।

নাসিরের কথায় আমি বিশ্বাস করলাম। ওকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। টিভিতে সিনেমায় যেরকম দেখায় একদম সেই রকম ঠিক ঠিক ভালোবাসা। একদিন ভোরবেলা মাকে একটা চিঠিতে সব লিখে চলে গেলাম আমি। লিখলাম—'মা, তোমায় তো একদিন আমার বিয়ে দিতেই হত। একদিন পর হয়ে যাওয়ার জন্যই তো মেয়েরা আসে। কে জানে, এখানে কার হাতে পড়তাম আমি। তারাও কী আমায় ঠিকভাবে রাখতে পারত! সবাই যে বলে আমায় দেখতে ভালো। আমরা দেখতে ভালো হলে যে কী বিপদ তা তো দেখছই। নাসির আমায় খুব ভালোবাসে জানো মা। নাসিরের সঙ্গে যাচ্ছি। আমরা বিয়ে করে অন্য দেশে থাকব। নাসির বলেছে ওখানে সব ব্যবস্থা আছে। আমি পৌঁছে তোমায় সব খবর দিয়ে চিঠি দেবো, ঠিকানা দেবো।'

শুধু এই কথা জানিয়ে চলে এসেছিলাম। তখন নাসির আমায় লুকিয়ে সীমান্ত পার করে নিয়ে গেল ভারতে। আমার জীবনের সব থেকে কষ্টের কাহিনী তখনই শুরু। আমাকে সে ব্যবহার করে বিক্রি করে দিল। তার চাঁদের সাম্পানের দর উঠেছিল নাকি বিশ হাজার টাকা। সেখান থেকে যন্ত্রণা আর আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে আর এক যমদূত আমায় নিয়ে গেল পাকিস্তান। তখন থেকেই গায়ে বোরখা উঠল। তারপরে কত সীমান্ত পার হয়ে কীভাবে আমি মাস্কাটে পৌঁছোলাম তা উপন্যাসের মতো কাহিনী। একদিন যখন শেখ সাহেবকে দিয়ে গেল তারা হোটেলের ঘরে আমার কী জানি মনে হল এই মানুষটা বোধহয় আর পাঁচজনের মতো নয়।

আমি তার পা ধরে খুব কাঁদলাম। খুব কাঁদলাম আমি। উনি আমার হাত ধরে তুললেন। তারপরে নিজেই একজন মেয়ে-ডাক্তার নিয়ে এলেন। সে আমায় পরীক্ষা করল, রক্ত নিয়ে গেল। পরীক্ষায় বোঝা গেল আমার শরীরে কোনো দোষ নেই। তখন উনি কিনে নিলেন আমায়। বুঝলাম ওনার আমাকে খুব ভালো লেগেছে। চিরকালের জন্য নিজের করে রাখতে চান। নাহলে চেনা নেই শোনা নেই হঠাৎ করে কাউকে কেউ এমন বিবি করে নেয়! অবশ্য শেখ সাহেবদের এমন অনেক বিবি থাকে। সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। চারিপাশে কত লোকজন, তাদের ভাষা বুঝি না। এরা তো আমায় কোনো চিঠি লিখতে দেয়নি। আমি লিখতে সাহস পাই না। আপনার কাছে অনুরোধ, যদি সম্ভব হয় আমার বাবা-মাকে একটা খবর দিয়ে দেবেন যে তোমাদের মেয়ে বিপাশা এখন ভালো আছে। তার খাওয়া-পরার কোনো কষ্ট নেই। শেখ সাহেবের অনেক বাড়ি। একটা ভিলা আছে সালালার কাছে রাইসুট-এ। রাইসুট খুব সুন্দর জায়গা। ওখানে সমুদ্রের ধারেও অনেক জেবেল আছে। জেবেল অর্থাৎ পাহাড়। আমি তো আর চিরকাল এমন বন্দী থাকব না। আর সব বিবিদের মতো আমারও ছেলেমেয়ে হবে, হবে না? হবে তো? বলুন? ওরা অবশ্য পাকিস্তানে আমাকে অজ্ঞান করে কী একটা অপারেশন নাকি করেছিল। তাই বলে কী আর ছেলেমেয়ে হবে না? শেখ সাহেবকে ইশারায় বললে উনি ওপরদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বোঝান সেটা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় হবে। আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে তো কোনো দোষ করিনি। শুধু ভালোবেসে বিশ্বাস করেছি বলেই না এমন অবস্থা। আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো। শেখ সাহেবেরও। আমাদের যখন ছেলেমেয়ে হবে তখন আমারও অনেক অধিকার হবে আর সব বিবিদের মতো। আমি আমার ছেলেমেয়েদের বলব তোদের মায়ের দেশে চল্। তখন আমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আসব। মাকে-বাবাকে বলবেন তো সব? মনে থাকবে? বুড়িগঙ্গা নদীর ধারে কুমোরখালি গ্রাম। আর আমি বিপাশা। এখন বিলকিস বেগম। সমুদ্রের ধারে রেসায়েত বলে জায়গা, সেখানে একটা ভিলায় থাকি আমি। আমার বরের নাম শেখ আবদুল্লাহ ইবনে আজিজ।

চিঠিটা লিখতে বসেছিলাম রাতে। ভেবে ভেবে লিখতে হল। এখন দিনের আলো ফুটে এসেছে। আপনাকে চিঠিটা পৌঁছে দিতে হবে আপনি বেরিয়ে যাওয়ার আগে। দেশে ফিরে আমার কথা মনে থাকবে তো? ভুলে যাবেন না তো? আমার নমস্কার নেবেন।

ইতি — বিপাশা

সকালবেলা যখন আবার তৈরি হয়ে হোটেল থেকে চেক আউট করলাম তখন সাতটা বাজে। বিলকিসের চিঠি অনুযায়ী এখন তো শেখ সাহেব ঘুমোবেন। কিন্তু বিলকিসের সঙ্গে যোগাযোগ করার ফল মারাত্মক হতে পারে। তাই নীরবেই হোটেল ছেড়ে চলে আসতে হল। বোরখাতে আবৃত দুটো সজল চোখ বারবার ভাসতে লাগল চোখের সামনে।

এরপর বাংলাদেশে ফিরে আমি কুমোরখালি গিয়েছিলাম। প্রোজেক্টের পাজেরো জিপ নদীর অপর পাড়ে রেখে খেয়া নৌকা করে পার হয়েছিলাম সেই নদী। বট আর অশ্বত্থের ছায়ায় সেই পুরোনো ভাঙা কালীমন্দির এখন পরিত্যক্ত। সেখানে আর কোনো বিগ্রহ নেই। শুধু

সাপখোপ থাকে। নাসিরের খোঁজ পাওয়া গেল না। সে এখন আর গ্রামে আসে না। ঢাকায় থাকে। আদিম-ব্যবসা করে মস্ত বড়োলোক। তিন-চারটে গাড়ি। অমল মুখোপাধ্যায়ের মেয়ের সঙ্গে নাসিরের বিয়ের কথা এখানে জানে না কেউ। তারা কাউকে কিছু না বলে এই গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। তাদের বাড়িতে এখন সেই গ্রামেরই অন্য লোক থাকে। একজন বললেন বোধহয় ইন্ডিয়াতেই গেছে। তাহলে সেখানে আমি কোথায় খুঁজব তাদের। কেউ কী করে জানবে কেষ্টপুর খালের পাড়ে কিংবা টালিগঞ্জের রেল লাইনের ধারে কোন বস্তিতে আছে তারা। পাঠক, যদি আপনার এমন কোনো লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, যিনি কুমোরখালি গ্রামের কালীমন্দিরের প্রাক্তন পুরোহিত অমল মুখোপাধ্যায়কে চেনেন তাহলে আপনি তাকে দয়া করে শুধু এইটুকু খবর দিয়ে দেবেন যে তাদের মেয়ে বিপাশা ওরফে বিলকিস এখন ভালো আছে। তার ঠিকানা — গ্রাম: রেসায়েত। জেলা: সালালা, সুলতানেট অফ ওমান। তার বরের নাম — শেখ আবদুল্লাহ ইবনে আজিজ।

নিজের গোলকধাঁধায় রাষ্ট্রপতি

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস্ (অনুবাদ : অমিতাভ রায়)

সম্পাদকীয় সংযোজন : ফিদেল কাস্ত্রোর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ভেনেজুয়েলার বর্তমান প্রেসিডেন্ট উগো শাভেস্। শাভেস্-এর সঙ্গে মার্কেস্-এর কথোকপথনের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনটি রচিত।

রাত্রি ঘনিয়ে আসার মুহূর্তে সুইজারল্যান্ডের দাভোস থেকে বিমানটা ছাড়ল। বিমানের অন্যতম যাত্রী কার্লোস আন্দ্রেস প্রেস্।[১] প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল ফারনান্দো ওসোয়া আন্তিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসায় কার্লোস আন্দ্রেস প্রেস্ রীতিমতো বিস্মিত। উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, —'কী ব্যাপার?' আন্তিক যথেষ্ট দৃঢ়তা নিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করলেন যে রাজধানী কারাকাসের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মিরাফ্লোরেস প্রাসাদ পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যাওয়া রাষ্ট্রপতির পক্ষে সম্ভব নয়। তবে নিজের বাড়ি লা কাসোনা-য় যেতে অসুবিধা হবে না। রাষ্ট্রপতি ঘুমিয়ে পড়লেন। ফোন করে আন্তিক তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে জানালেন যে মারাকে এলাকায় ফৌজি অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেছে। মিরাফ্লোরেস প্রাসাদে রাষ্ট্রপতি পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গেই গোলন্দাজবাহিনীর গোলাবর্ষণের আওয়াজ শোনা গেল।

তারিখটা ছিল উনিশশো বিরানব্বই-এর ফেব্রুয়ারির চার তারিখ। ঐতিহাসিক তারিখের ব্যাপারে কর্নেল উগো শাভেস্ ফ্রাস পুরোপুরি সংস্কারাচ্ছন্ন। লা প্লানিসি মিউজিয়ামে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে গড়ে তোলা অস্থায়ী সদর দপ্তর থেকে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নির্দেশ দিচ্ছিলেন কর্নেল উগো শাভেস্। ওদিকে জনসমর্থনের উপর কার্লোস আন্দ্রেস প্রেস্-এর অগাধ আস্থা। কাজেই প্রাসাদে যাওয়ার আগে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার জন্যে তিনি টেলিভিশন স্টুডিয়োর দিকে রওনা দিলেন। দু-ঘণ্টা বাদেই অভ্যুত্থানের অবসান হয়ে গেল। তাঁকেও জনগণের সামনে হাজির হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে, এই শর্তে আত্মসমর্পণ করলেন কর্নেল উগো শাভেস্।

মাথায় বেরেট[২] টুপি চাপানো বিমানবাহিনীর একদল সেনানীকে সঙ্গে নিয়ে এই তরুণ ক্রেয়োল[৩] কর্নেল, যাঁর ভাষণ জনগণকে মোহিত করে রাখতে পারে, আন্দোলনের যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিলেন। তাঁর টেলিভিশনের ভাষণটি ছিল রাজনৈতিক মুনশিয়ানায় সমৃদ্ধ। দু-বছর কারাবাসের পর রাষ্ট্রপতি রাফায়েল কালদেরা[৪]-র আনুকূল্যে মুক্তি পেলেন কর্নেল উগো শাভেস্। পরাজয় স্বীকারের মুহূর্তে দেওয়া ভাষণ শুনে তাঁর সমর্থক এবং বিরোধী সকলের ধারণা হল যে এটা হল এক নির্বাচনী প্রচারের সূচনা যা তাঁকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবে।

একসঙ্গে বিমানে কারাকাস রওনা হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে শাভেস্ আমাকে এই কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন। এর দিন তিনেক আগে হাভানায় ফিদেল কাস্ত্রো এবং কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি আন্দ্রেস পাসত্রানা[৫]-র সঙ্গে এক সভায় শাভেস্-এর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তাঁর পেশিবহুল শারীরিক কাঠামো দেখে তো আমি একেবার মুগ্ধ। ভেনেজুয়েলার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে নিহিত ক্রেয়োলদের স্বাভাবিক উত্তেজনায় তিনি ভরপুর। আবার দেখা

করার কথা থাকলেও নিজেদের ব্যস্ততাকে শিথিল করার সময় বা সুযোগ না মেলায় দেখা হল কারাকাসগামী বিমানে। তাঁর বিভিন্ন প্রকল্প এবং সাফল্য নিয়ে আলোচনা হল।

পেশা থেকে ছিটকে যাওয়া সাংবাদিকের পক্ষে এটা এক শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা। তাঁর নিজের জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে প্রচারমাধ্যমের গড়ে তোলা স্বেচ্ছাচারী ভাবমূর্তির বদলে অন্য এক ব্যক্তিত্বর খোঁজ পেলাম। তিনি একেবারে অন্য রকমের শাভেস্। কিন্তু তাঁর কোন চরিত্রটা সত্যি?

বিদ্রোহের ছক কাটা এবং বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটানোর কীর্তিকেই তাঁর বিরুদ্ধে উনিশশো আটানব্বই-এর নির্বাচনী প্রচারে প্রধান অভিযোগ হিসেবে পেশ করা হল। কিন্তু ভেনেজুয়েলার ইতিহাস এর আগে এরকম চারজন ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রথমজন হলেন— রোমুলো বেতানকোর্ট।[৬] সাধারণভাবে বা ভুলবশত তিনি গণতান্ত্রিক ভেনেজুয়েলার জনক হিসেবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রপতি ইসাইয়াস মেদিনা আনগারিতা[৭]-কে ক্ষমতাচ্যুত করেন রোমুলো বেতানকোর্ট। প্রাক্তন সৈনিক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসমৃদ্ধ ইসাইয়াস মেদিনা আনগারিতা রাষ্ট্রপতি হুয়ান ভিসেন্তে গোমেস্[৮]-কে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে সুদীর্ঘ স্বৈরাচার থেকে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন সাহিত্যিক রোমুলো গাইয়েগস্।[৯] গাইয়েগস্‌কে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী জেনারেল মার্কোস পেরেস্ হিমেনেস্[১০] ভেনেজুয়েলায় উনিশশো পঞ্চাশের দশকে স্বৈরাচারের প্রবর্তন করেন। পরবর্তী প্রজন্মের তরুণ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিকরা হিমেনেস্‌কে অপসৃত করে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিদের মাধ্যমে দেশ শাসনের বন্দোবস্ত করে দেন।

আপাতদৃষ্টিতে উনিশশো বিরানব্বই-এর ফেব্রুয়ারির অভ্যুত্থান ছাড়া শাভেস্ আর কোনো ভুল করেননি। উনিশশো চুয়ান্নর আঠাশে জুলাই বারিনাস্ প্রদেশের সাবানেতায় জন্মমুহূর্তেই যে ভাগ্যলিপি লেখা হয়ে গিয়েছিল, অভ্যুত্থানজনিত বিপত্তি সেই নিয়মেই সৌভাগ্যক্রমে লব্ধ এক কল্পমূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয় বলে শাভেস্-এর ধারণা। তিনি সিংহরাশির জাতক। আর সিংহরাশি তো ক্ষমতার প্রতীক। শাভেস্ পুরোদস্তুর ক্যাথলিক এবং তাঁর বিশ্বাস যে ছোটোবেলা থেকে গলায় জড়ানো পুরোনো উত্তরীয়টাই তাঁর সৌভাগ্যের প্রতীক। কাপড়টা আসলে খ্রিস্টিয় সন্ন্যাসীদের পোশাকের অংশবিশেষ। কর্নেল পেদ্রো পেরেস্ দেলগাদো ব্যবহৃত এই উত্তরীয়টি শাভেস্ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। কর্নেল পেদ্রো পেরেস্ দেলগাদো সম্পর্কে তাঁর প্রবীণ মাতামহ হলেও শাভেস্ তাঁকে জীবনের আদর্শ বলে মান্য করেন।

মা-বাবা দু-জনেই শিক্ষক। ন-বছর বয়স থেকেই সংসারের স্বার্থে তাঁকে রাস্তায় বসে ফল আর মিষ্টি বিক্রি করতে হত। কখনো-সখনো মাসির সঙ্গে দেখা করার জন্যে বাড়ির গাধাটার পিঠে চড়ে তিনি মামার বাড়ির গ্রাম লস্ রেসত্রহস্-এর দিকে রওনা দিতেন। তাঁর বিবেচনায় সাবানেতা একটা আদর্শ ছোটো শহর, যেখানে সূর্যাস্তের পর অন্তত ঘণ্টাদুয়েক বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে। শাভেস্-এর মায়ের ইচ্ছা, ছেলে যেন বড়ো হয়ে পাদ্রি হয়। কিন্তু শাভেস্ মনেপ্রাণে চেষ্টা করেছিলেন যাতে কয়্যার-এর যন্ত্রশিল্পী হওয়া যায়। বাজনার হাত ভালোই ছিল। তাঁর বাজনা শুনে সবাই বলে উঠত,—'শুনছ, উগো বাজাচ্ছে।' একদিন মায়ের একটা

বইয়ের পাতা ওলটানোর সময় প্রথম অধ্যায়ের ওপর তাঁর নজর আটকে গেল। অধ্যায়টির শিরোনাম 'জীবনে কীভাবে সফল হতে হয়।'

আসলে ওটা ছিল বিভিন্ন পেশার বিবরণী সমৃদ্ধ একটা ডাইরেক্টরি। আর তাঁর মনে হল সব ক-টি পেশার জন্যেই তিনি উপযুক্ত। বারো বছর বয়সে ছবি আঁকার একটা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে মাইকেল এঞ্জেলো ও ডেভিডের প্রশংসায় শাভেস্ পঞ্চমুখ। গিটার বাজানোয় দক্ষতা আর গানের ওপর দখলের জন্যে জন্মদিনের অনুষ্ঠান বা সেরেনাদে[১১] ছিল তার ভীষণ চাহিদা। বেসবল খেলার মাঠেও শাভেস্ সমান সাবলীল। সামরিকবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে মোটেও তাঁর তালিকায় ছিল না। নেহাত কেউ তাঁকে বুঝিয়েছিল যে সব চেয়ে সেরা বেসবল দলে খেলার সুযোগ পেতে হলে বারিনাস মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে যোগ দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ।

তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে পড়লেন ইতিহাস। তাঁর জীবনের সেরা 'সিংহ' সিমোন বলিভার[১২] সম্পর্কে তিনি এতই আগ্রহী যে বলিভারের প্রত্যেকটি ভাষণ শাভেস্-এর মুখস্থ। উনিশশো তিয়াত্তরে আইয়েন্দে[১৩]-র মৃত্যু শাভেস্‌কে প্রথম রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। শাভেস্ কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না, কেন একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সামরিকবাহিনী ক্ষমতাচ্যুত করবে। কিছুদিনের মধ্যেই শাভেস্-এর ক্যাপ্টেন তাঁকে হোসে ভিসেন্তে রানগেল-এর ছেলের উপর নজরদারির দায়িত্ব দিলেন। ছেলেটিকে কমিউনিস্ট হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছিল। 'জীবন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ',— অট্টহাসিতে মুখর হয়ে শাভেস্ আমায় বললেন, — 'ছেলেটির বাবা এখন আমার পররাষ্ট্র মন্ত্রী।'

ভাগ্যের আরেক বাঁকে, ফৌজি জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে কার্লোস আন্দ্রেস প্রেস্-এর হাত থেকে শাভেস্ পেয়েছিলেন সামরিকবাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। পরে সেই রাষ্ট্রপতি কার্লোস আন্দ্রেস প্রেস্-কেই ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে শাভেস্‌কে অভ্যুত্থানের উদ্যোগ নিতে হয়। আমি বললাম, —'আর কী! আপনি তো তাঁকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন।' প্রতিবাদ করলেন শাভেস্,—'মোটেও নয়। আমরা একটা সাংবিধানিক আইনসভা গড়ে দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম।'

তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপের পরই বুঝতে পারি যে শাভেস্ জন্মসূত্রেই একজন গল্পকার। ভেনেজুয়েলার সংস্কৃতি যা একাধারে সৃজনশীল, কাব্যিক এবং জনপ্রিয়, তার প্রতিনিধি হিসেবে শাভেস্‌কে বিবেচনা করা যেতেই পারে। তাঁর সময়ানুবর্তিতা অসাধারণ। আর তাঁর স্মৃতিশক্তি? নেরুদা বা হুইটম্যানের সব কবিতা এবং রাষ্ট্রপতি তথা সাহিত্যিক রোমুলো গাইয়েগস্-এর সমস্ত বক্তৃতা তাঁর মুখস্থ।

খুব অল্প বয়সেই তিনি আবিষ্কার করেন যে প্রবীণ মাতামহ কর্নেল পেদ্রো পেরেস্ দেলগাদো সম্পর্কে তাঁর মায়ের বর্ণনা ঠিক নয়। পেদ্রো পেরেস্ দেলগাদো ডাকাত ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপতি হুয়ান ভিসেন্তে গোমেস্-এর আমলের এক প্রবাদপ্রতিম যোদ্ধা। পেদ্রো পেরেস্ দেলগাদোর কাজকর্ম সম্পর্কে শাভেস্ এতই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন যে দেলগাদোর একটা জীবনী লিখে তাঁর বদনাম দূর করার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। বিভিন্ন মহাফেজখানা,

ফৌজি গ্রন্থাগার ঢুঁড়ে এবং যে-পথে পেদ্রো পেরেস্ দেলগাদোরা যাতায়াত করতেন সেই রাস্তায় সফর করে আর প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শাভেস্, জীবনীটি লিখবার উদ্যোগ নেন। তবে শেষপর্যন্ত নিজের তৈরি বীরের তালিকায় হুয়ান ভিসেন্তে গোমেস্-এর নাম লিখে তিনি খ্রিস্টিয় সন্ন্যাসীদের পোশাকের অংশবিশেষ গলায় জড়িয়ে, জীবনী লেখার সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেন।

গবেষণায় মগ্ন হয়ে একদিন সীমান্ত এলাকার আরুকা নদীর সেতু পেরোতে গিয়ে কলম্বিয়ার সীমান্তরক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। সীমান্তরক্ষীদের কী দোষ? তাঁর ব্যাগে ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, গোপন নথি, ওই এলাকার ফোটোগ্রাফ ও ফৌজি মানচিত্র এবং দুটি পিস্তল পাওয়া যায়। কাজেই শাভেস্‌কে গুপ্তচর হিসেবে গ্রেপ্তার না করার কী কারণ থাকতে পারে? সঙ্গে ছিল পরিচয়পত্র। কিন্তু গুপ্তচরের পরিচয়পত্র জাল হওয়াটাই স্বাভাবিক!

সীমান্তরক্ষীদের যে-দপ্তরে বসে দীর্ঘক্ষণ তর্কাতর্কি চলছিল, তার দেওয়ালে টাঙানো ছিল সিমোন বলিভারের একটা ঘোড়ায় চড়া ছবি। শাভেস্ আমায় বলেন, —'আমিও কিছুতেই ছাড়তে রাজি নই। ওরাও ছাড়বে না। আমি যত বেশি করে ওদের বোঝানোর চেষ্টা করি ওরা তত কম বুঝতে পারে।' তখন শাভেস্-এর মাথায় এক মতলব এল। তিনি বললেন, — 'দেখুন ক্যাপ্টেন, ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম। এক শতাব্দী আগে আমরা একই সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলাম। আর ওই যে ছবিতে যাঁকে দেখা যাচ্ছে তাঁর নেতৃত্বে লড়াই করতাম। তাহলে আমি কী করে গুপ্তচর হলাম?' এমন যুক্তি শুনে ক্যাপ্টেন তো পুরোপুরি স্তম্ভিত। তিনি বৃহত্তর কলম্বিয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাষণ শুরু করে দিলেন। দু-জনে মিলে আরুকার পানশালায় বসে সারারাত ধরে দুই দেশেরই মদ পান করলেন। পরের দিন সকালে ক্যাপ্টেন শাভেস্‌কে ফিরিয়ে দিলেন ঐতিহাসিক গবেষণার যাবতীয় যন্ত্রপাতি। তখনও মদের নেশা কাটেনি। অথচ বিদায় জানাবার জন্যে আরুকা নদীর সেতুর একেবারে মাঝখানটায় যেতে কিন্তু কারো ভুল হয়নি। কারণ আরুকা নদীই দুই দেশের সীমানা নির্ধারণ করে বয়ে চলেছে।

'এই সময়েই আমরা বুঝতে পারছিলাম ভেনেজুয়েলায় কিছু একটা গোলমাল রয়েছে',— বললেন শাভেস্। তেরোজন পদাতিক সৈন্যের একটা দলকে ওরিয়েন্তে প্রদেশের গেরিলাদের নিকাশের জন্যে পাঠানো হল। দলটির নেতা হিসেবে শাভেস্‌কেও যেতে হয়। বৃষ্টিস্নাত এক সন্ধ্যায় সামরিকবাহিনীর জনৈক গোয়েন্দা ফৌজি ব্যারাকে আশ্রয় নেয়। তার সঙ্গে ছিল একজন রক্ষী এবং কয়েকজন অস্থিসার সন্দেহজনক গেরিলা। রাত প্রায় দশটা নাগাদ ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পাশের ঘর থেকে চাপা গোঙানির শব্দ শুনতে পেলেন। শাভেস্ বললেন, —'উঁকি দিয়ে দেখি, সৈন্যরা কম্বল জড়িয়ে সন্দেহজনক গেরিলাদের পেটাচ্ছে যাতে শরীরে কোনো দাগ না থাকে।' তিনি সেই কর্নেলকে তক্ষুনি ব্যারাক ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে মিশেছিল একই সঙ্গে ঘৃণা ও ক্রোধ। শাভেস্ আরো বললেন,— 'পরের দিন ওরা আমাকে কোর্টমার্শালের হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুদিন আমার ওপর কড়া নজর রাখা ছাড়া আর কিছুই হয়নি।'

কয়েকদিন বাদেই তাঁকে আরেকটা বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল। গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমণে আহত কয়েকজন সৈন্যবোঝাই একটা হেলিকপ্টার শাভেস্-এর ফৌজি ব্যারাকের আঙিনায় নামে। একাধিক গুলিতে আহত একটি ভীত তরুণ সৈন্যকে শাভেস্ হেলিকপ্টার থেকে বের করে আনলেন। তরুণটি করুণভাবে মিনতি জানিয়ে বলল,—'স্যার, দেখবেন আমি যেন মরে না যাই।' শাভেস্ তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে গাড়িতে তুলে দিলেন। সাতজন সৈন্য অবশ্য মারা গেছিল। সেদিন রাতে শাভেস্-এর হঠাৎ মনে হল, —'আমি এখানে কী করছি? কৃষকরা সৈন্যের পোশাক পরে কৃষক গেরিলাদের খুন করছে। পাশাপাশি কৃষক গেরিলারা হত্যা করছে সেইসব কৃষকদের যারা রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। তার মানে, কৃষকরাই নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করছে।' কারাকাসকামী বিমানে এইসব কথা বলতে বলতেই শাভেস্ আমায় জানালেন,—'এটা ছিল আমার প্রথম অস্তিত্বের সংকট।'

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পর তিনি স্থিরনিশ্চিত হলেন যে এই খুনোখুনি বন্ধ করার জন্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। অন্তত তাঁর কপালে সেইরকমই লেখা আছে। তেইশ বছর বয়সে তিনি তাই করলেন। ভেনেজুয়েলার জনগণের বলিভারবাদী সৈন্যদল তৈরি হল। পাঁচজন অন্য সৈন্য এবং রাষ্ট্রীয় সামরিকবাহিনীর সাব-লেফটেন্যান্ট উগো শাভেস্ নিজে ছিলেন এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা। আমি জানতে চাইলাম, —'এই দলের লক্ষ্য কী?' শাভেস্ উত্তরে জানালেন, —'একেবারে সহজ। একটা পরিণতিতে পৌঁছোনোই ছিল আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এক বছর পরে তিনি বিমানবাহিনীর প্যারাট্রুপ অফিসার পদে উন্নীত হলেন। একটা সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান হিসেবে মারাকায়েতে তাঁকে কাজে যোগ দিতে হল। সেই সঙ্গে অভ্যুত্থানের ছক কাটার কাজ শুরু হয়ে গেল। জনগণকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে তিনি অভ্যুত্থানের নকশা প্রণয়নের কাজে হাত লাগালেন।

উনিশশো বিরাশির সতেরোই ডিসেম্বর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় পালটিয়ে গেল শাভেস্-এর জীবনের গতিবিধি। তিনি তখন বিমানবাহিনীর প্যারাশুট রেজিমেন্টের পাইলট এবং গোয়েন্দাপ্রধান। একদিন বিকেলে ব্যাটেলিয়ানের সব সদস্যের এক সমাবেশে শাভেস্‌কে ভাষণ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হল। অনুষ্ঠান-পরিচালক শাভেস্‌কে খালি হাতে মঞ্চের দিকে এগোতে দেখে প্রশ্ন করলেন,—'ভাষণ কোথায়?' শাভেস্-এর নৈর্ব্যক্তিক উত্তর, —'আমি তো কিছু লিখিনি।' তাৎক্ষণিক বক্তৃতাতেই মাতিয়ে দিলেন শাভেস্। সিমোন বলিভার আর হোসে মার্তি[২৪]-র রচনায় উদ্বুদ্ধ শাভেস্-এর ভাষণে মিশে গিয়েছিল কিছু ব্যক্তিগত অভিমত। তাঁর মতে স্বাধীনতার দুশো বছর বাদেও লাতিন আমেরিকায় অবিচার বিরাজমান।

শ্রোতারা বাক্‌রুদ্ধ হয়ে শাভেস্-এর ভাষণ শুনলেও ভীষণ বিরক্ত হলেন অনুষ্ঠান পরিচালক। মন্তব্য করলেন,—'শাভেস্ তুমি তো রাজনীতিবিদ হয়ে যাচ্ছ।' জবাবে শাভেস্-এর জনৈক সহকর্মী বললেন, —'স্যার, আপনি ভুল করছেন। শাভেস্ রাজনীতিবিদ নয়, ও হল নতুন প্রজন্মের নায়ক। আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকেরা ওর কথা মন দিয়ে শুনলে পালাবার পথ পাবে না।'

এই ঘটনার পর দুজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে দশ কিলোমিটার দূরের সাম দেল গুয়েরে-তে গিয়ে শাভেস্ উচ্চারণ করলেন সেই বিখ্যাত হলফনামা যা অনেকদিন আগে রোমের মাউন্ট আভেনতিন-এ ঘোষণা করেছিলেন সিমোন বলিভার। 'অবিশ্যি আমরা একটু পালটিয়ে নিই',—শাভেস্ আমায় বললেন। 'স্প্যানিশ ঔপনিবেশিকদের ইচ্ছাপূরণের জন্যে যে শেকল পরিয়ে আমাদের নির্যাতন করা হত তা আমরা ভেঙে ফেলেছি। বলিভার-এর এই প্রত্যয়পূর্ণ ঘোষণা থেকেএকটু সরে গিয়ে আমরা শপথ নিয়ে বললাম, —ক্ষমতাশালীদের ইচ্ছাপূরণের জন্যে যে শেকল পরিয়ে আমাদের নির্যাতন করা হয়, তা যতক্ষণ না আমরা ভাঙতে পারছি ততক্ষণ জনগণের মুক্তি নেই।'

এরপর থেকে সামরিকবাহিনীর যে-অফিসারই শাভেস্-এর গোপন আন্দোলনে যোগ দিতেন তাঁকেই এই অঙ্গীকার করতে হত। কয়েক বছর ধরে ভেনেজুয়েলার সামরিকবাহিনীর অফিসাররা গোপন সম্মেলনের আয়োজন করতেন। পুরোনো সে-সব দিনের কথা বলতে গিয়ে শাভেস্ বললেন, —'গোপন জায়গায় আমরা দু-দিনব্যাপী সম্মেলনের আয়োজন করতাম। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমরা রীতিমতো দলিল তৈরি করতাম। বিশ্বস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত সেইসব দলিল। দশ বছরে আমরা পাঁচটা সম্মেলনের আয়োজন করতে সক্ষম হই।'

নেপোলিয়ান বলেছিলেন, — 'ক্ষণিকের উদ্দীপনায় একজন সেনানায়ক একটা যুদ্ধের উদ্দেশ্য নির্ণয় করে নিতে পারে।' এই উদ্ধৃতিটি শাভেস্-এর খুব প্রিয়। এর ভিত্তিতে শাভেস্ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমত ঐতিহাসিক সময়, দ্বিতীয়ত কৌশলগত মুহূর্ত এবং তৃতীয়ত যথার্থ ক্ষণ-নির্ধারণ, যে-কোনো যুদ্ধের জন্যে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত। তবে ষড়যন্ত্রকারীদের অসতর্কতার সুবাদে শাভেস্-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে। শাভেস্ নিজেই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন,—'কৌশলগত মুহূর্ত-র ব্যাপারে আমরা নিজেরাই স্তম্ভিত।' উনিশশো উননব্বই-এর সাতাশে ফেব্রুয়ারির বিদ্রোহ যা 'কারাকাসো' নামেই বেশি পরিচিত, সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শাভেস্ এমন মন্তব্য করেন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কার্লোস আন্দ্রেস প্রেস্ নির্বাচিত হওয়ার মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে একটা বিদ্রোহ ঘটানোর কথা মাথায় আনাও সম্ভব নয়। 'সাতাশে ফেব্রুয়ারি সন্ধেবেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছিলাম। আসলে ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার জন্যে নিয়মিত ক্লাসে যেতে হত। তিউরা-র ফৌজি ব্যারাকের কাছে গাড়িতে পেট্রোল ভরার জন্যে আমায় থামতে হল।' কারাকাসে বিমান অবতরণের কয়েক মিনিট আগে শাভেস্ আমাকে এই বিবরণী শোনাচ্ছিলেন। 'আমি দেখলাম সৈন্যরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসছে। একজন কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলাম, সৈন্যরা কোথায় যাচ্ছে? এমনকী সামরিক শিক্ষা না পাওয়া সেই সব কর্মীরাও বেরিয়ে আসছে যারা সাধারণভাবে ব্যারাক দেখভালের কাজকর্মে নিযুক্ত। নিজেদের হাতের রাইফেল দেখেই তারা বিব্রত ও শঙ্কিত। কর্নেলকে আবার প্রশ্ন করলাম, সৈন্যরা কোথায় যাচ্ছে? এবার জবাবে জানা গেল ওরা রাস্তাগুলোকে রক্ষা করতে যাচ্ছে। গোলমাল থামাতে সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কর্নেল বললেন যে তিনি নির্দেশ মেনে চলবেন। আমি বললাম, কর্নেল, একটু ভেবে দেখুন, এর ফলাফল কী হতে পারে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানালেন, —

শাভেস্, শোনো, ভালো করে শোনো, এটা আমার নির্দেশ। এর মধ্যে কোনো পছন্দ-অপছন্দের সুযোগ নেই। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।'

শাভেস্ স্মরণ করলেন যে সেই রাতেই তিনি হামে আক্রান্ত হন। সঙ্গে ধুম জ্বর। গাড়ি স্টার্ট করার মুহূর্তে তাঁর নজরে আসে একটি অল্পবয়সি সৈন্য মাথায় তেরছাভাবে টুপি পরে, হাতের রাইফেলটাকে এলোমেলোভাবে দোলাতে দোলাতে রাস্তায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো গোলাগুলি ছুঁড়ছে। শাভেস্ বললেন, —'আমি তাকে থামতে বলে কাছে ডাকলাম। উত্তেজিত অবস্থায় দারুণ ঘামতে ঘামতে সে গাড়িতে চড়ল। একেবারে অল্প বয়স, বড়োজোর আঠারো। জিজ্ঞেস করলাম, — কোথায় যাচ্ছিলে? সে বলল, — আমার ব্রিগেড হারিয়ে ফেলেছি। ওই ট্রাকটা করে ওরা রওনা দিয়েছে। স্যার, ওদের কাছে যাওয়ার জন্যে একটু সাহায্য করুন। একটু জোরে গাড়ি চালিয়ে ট্রাকটাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, — তোমরা কোথায় যাচ্ছ? কোনো উত্তর নেই। সকলেই চুপ। নেতাগোছের লোকটি বলল,—কেউই জানে না আমরা কোথায় চলেছি।'

দম নেওয়ার জন্যে শাভেস্ থামলেন। সেই ভয়ংকর রাত্রির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে তাঁর কথা প্রায় চিৎকারের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে গলা বন্ধ হবার জোগাড়। 'একবার ভেবে দেখুন কতগুলো আতঙ্কগ্রস্ত সৈনিকের হাতে একটা করে রাইফেল আর পাঁচশো রাউন্ড গুলি ধরিয়ে রাস্তায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো কিছুকে নড়তে দেখলেই ওরা ভয়ে গুলি চালাচ্ছিল। রাস্তায়, গলিতে, শহরের সর্বত্র, এমনকী গরিবদের মহল্লায় গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছিল। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হল এই বীভৎস বিপর্যয়ে। আমাদের কাজ শুরু করার জন্যে এই মুহূর্তটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।' একটানা বলে নিয়ে শাভেস্ থামলেন। এরপরই শুরু হল তিন বছর পরের ঘটানো অভ্যুত্থানের কাজ। যদিও তা ব্যর্থ। ভোর তিনটে নাগাদ বিমানটি কারাকাসে অবতরণ করল। জানলা দিয়ে আলোর সমুদ্র দেখতে দেখতে মনে হল কারাকাস এক অবিস্মরণীয় শহর। ক্যারিবিয়ান সংস্কৃতি-রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি আমায় জড়িয়ে ধরে বিদায় নিলেন। নিরাপত্তার বলয়ে প্রবেশ করে রাষ্ট্রপতির এগিয়ে চলা দেখতে দেখতে আমার মনে হল আমি একই সঙ্গে দু-জন মানুষের সঙ্গী হয়ে বিমানযাত্রাটা সম্পন্ন করলাম। একগুঁয়ে হয়ে কাজ করার জন্যে একজনের ভাগ্যে জুটেছে দেশকে বাঁচানোর স্বপ্ন। অন্যজন স্বপ্নদর্শী মানুষ, যিনি অন্য কোনো বিদ্রোহের শিকার হয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে হারিয়ে যেতে পারেন।

প্রয়োজনীয় তথ্য

* ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচনে উগো শাভেস্ ফ্রাস, ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পরে আগস্ট মাসে এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটি প্রথমে ফ্রান্সের প্রখ্যাত পত্রিকা 'Le Monde diplmatique'-এ প্রকাশিত হয়। পরে নিবন্ধটি 'Le Monde diplmatique'-এ, ও অন্যান্য ভাষার সংস্করণেও প্রকাশিত হয়।

(১) Carlos Andrés Pérez দু-দফায়, ১৯৭৪-১৯৭৯ এবং ১৯৮৯-১৯৯৩, ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি।

(২) বেরেট—স্প্যানিশ কৃষকেরা সাধারণত এই বিশেষ ধরনের বিশাল টুপি মাথায় পরেন।

(৩) ক্রেয়োল—ইয়োরোপিয় এবং আফ্রিকিদের মিশ্রণে বংশোদ্ভুত।

(৪) Rafael Caldera Rodriguez, ১৯৯৪-১৯৯৯, ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি।

(৫) Andrés Pastrana Arango, ১৯৯৮-২০০২, কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি।

(৬) Rómulo Ernesto Betancourt Bello, ১৯৪৫-১৯৪৮, ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি।

(৭) Isaías Medina Angarita, ১৯৪১-১৯৪৫, ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি।

(৮) Juan Vicente Gómez, ১৯৩১-১৯৩৫ ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি।

(৯) Rómulo Gallegos, ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ নভেম্বর ১৯৪৮, ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি।

(১০) Marcos Pérez Jiménez, ১৯৫২-১৯৫৮, ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি।

(১১) আক্ষরিক অর্থে স্প্যানিশ 'সেরেনাদে' বা ইংরেজি 'সেরিনেইড্' (serenade) শব্দের কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই। লাতিন Ser nus থেকে ইতালিয় serenata হয়ে ফরাসি serenade হওয়ার পর আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে দুই আমেরিকা মহাদেশের সর্বত্র, বিশেষত স্প্যানিশ ভাষাভাষী দক্ষিণাংশে ছড়িয়ে পড়ার পর শব্দটার আভিধানিক অর্থ হয়ে দাঁড়াল, — 'প্রধানত কোনো মহিলার বাসভবনে জানালার নীচের উন্মুক্ত স্থানে তার প্রণয়ী কর্তৃক রাত্রিবেলায় সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রেম নিবেদন।' স্প্যানিশ ভাষাভাষী আমেরিকায় এটি অত্যন্ত সাদামাটা ঘটনা। একেবারে আধুনিক উদাহরণ—মেক্সিকো। সে-দেশে এভাবে প্রেম নিবেদনের নাম, — 'লাস সেরেনাতাস'। প্রতিদিন গোধূলিবেলায় মেক্সিকোর গ্রাম-গঞ্জ-শহরের কেন্দ্রস্থল বা প্লাজায় গাইয়ে-বাজিয়েরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। অর্থের বিনিময়ে এরা প্রেমিকের নির্দেশে নির্দিষ্ট প্রেমিকার বাতায়নতলে বসে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রেমিকমাত্রেই গান-বাজনায় দক্ষ হওয়া সম্ভব নয়, অতএব এই ব্যবস্থা। বাংলার সমাজজীবন তথা সংস্কৃতিতে এমন বিষয় বিরল। সুতরাং প্রতিশব্দ আসবে কোত্থেকে? 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' বা 'সান্ধ্যসঙ্গীত' শব্দ দুটি মন্দ নয়, কাজ চালিয়ে নেওয়া গেলেও প্রেম-নিবেদন সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে প্রার্থনা বা উপাসনা ধরনের শব্দবন্ধদুটি বড্ড বেমানান। সুতরাং 'সেরেনাদে' শব্দের একমাত্র বাংলা প্রতিশব্দ 'সেরেনাদে' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

(১২) Simón Bolívar (জন্ম : ১৭৮৩, মৃত্যু : ১৮৩০) লাতিন আমেরিকার সব চেয়ে শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বর্ণময় এই স্বাধীনতা সংগ্রামী সমগ্র লাতিন আমেরিকার El Liberator নামেই পরিচিত।

(১৩) Salvador Allende চিলির রাষ্ট্রপতি (৪ নভেম্বর ১৯৭০ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩)। সামরিক জুনটা ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ তাঁকে হত্যা করে।

(১৪) José Julián Martí Pérez কিউবার প্রখ্যাত কবি-লেখক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা। জন্ম : ২৮ জানুয়ারি ১৮৫৩। মৃত্যু : ১৯ মে ১৮৯৫।

গতানুগতিক প্রেমের গল্প অথবা পিকাসোর ছবি

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

তিলোত্তমার জন্যে অসিযুদ্ধ

পালিশ-করা, ঝাঁ-চকচকে নীল আকাশের নীচে কাছি-দড়ি দিয়ে ঘেরা চতুষ্কোণ যুদ্ধক্ষেত্র। দু-জন মরদের মধ্যে অসিযুদ্ধ শুরু হবে সেখানে আর কিছুক্ষণ বাদে। বিশেষভাবে তৈরি যুদ্ধক্ষেত্রে তারা লড়াই করবে একজন নারীর জন্যে। যার নাম তিলোত্তমা। যে-নারীর নাম তিলোত্তমা তাকে যে কী অপরূপ দেখতে সেটা বলার নিশ্চয়ই অপেক্ষা রাখে না। এই নামের সুন্দরী আমাদের পৃথিবীতে আগে ছিল। এখনো আছে। তিলতিল সৌন্দর্যের কণা দিয়ে তৈরি এই নারী। তার দেহবর্ণ, অনন্তকাল ধরে ধূসর বালুতটে নিঃসঙ্গতাবোধ নিয়ে আক্রোশে আছড়ে পড়া ফেনিল সমুদ্রের মতো। তার শরীর সম্ভবত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য। মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি। কপাল কোনো প্রকৃত কবির মনে চকিতে ভেসে-আসা কবিতাপঙ্‌ক্তির মতো সংক্ষিপ্ত উদ্ভাস। বড়ো এবং গভীর দুই চোখে গোধূলি-আকাশের রহস্য। ঠোঁটদুটির রক্তাভ পুষ্টতা দেখলে চেরিফলও লজ্জা পাবে। নাক এক টুকরো চাঁদের রেখা। গ্রীবা স্পষ্ট ও ঋজু। ডালিমফলের মতো পুরুষ্টু, রসালো ও লোভনীয় দুই আশ্চর্য স্তন। নাভি চিতলমাছের মতো সমৃদ্ধ ও মসৃণ। দীর্ঘাঙ্গী এই রূপসীকে দেখে অতি-সংযমী পুরুষও কামভাবে জর্জরিত হতে হতে নিশ্চিত নিজেকে তছনছ করে ফেলবে।

সেই তিলোত্তমার জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত যুদ্ধক্ষেত্রে মরণখেলায় মেতে উঠতে চলেছে যে দুই মরদ তাদের নাম, আপনাদের অনেকের কাছেই পরিচিত, — মধু আর কৈটভ। মধু সমুদ্রের ধারে বিশাল জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গের জানলায় তিলোত্তমাকে দেখে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যায় এবং চোখের সামনে উদ্ভাসিত দিগন্তরেখাকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে, যে-কোনো মূল্যে এই নারীর সঙ্গলাভ করবে, তাকে ভালোবাসবে; এবং যে কোনো ভালোবাসার অনিবার্য পরিণতি মিলনে লিপ্ত হবে এই নারীর সঙ্গে।

কৈটভের সঙ্গে তিলোত্তমার দ্যাখা হওয়ার গল্পটা একটু অন্যরকম। প্রতিদিন কাক-ভোরে সমুদ্রের ধারে অবাধ বালুতটে দৌড়োদৌড়ি করা কৈটভের অভ্যাস। একদিন অতি ভোরে আকাশ ছিল বেশ মেঘাচ্ছন্ন। সূর্য পুব আকাশে উদিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, এ-ব্যাপারে কৈটভ প্রায় নিশ্চিত ছিল। তথাপি বালুতটে কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করার পর কৈটভের মনে হয়েছিল, অকস্মাৎ, কোনো ভূমিকা না করেই উদিত সূর্য যেন ঝিলিক মারল তার চোখে। কৈটভ যারপরনাই বিহ্বল ও বিস্মিত। আকাশে ঘন মেঘ। ঠান্ডা এবং জোলো বাতাস বইছিল। বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস ছিল আবহাওয়ায়। তাহলে সূর্যের রশ্মি ঝিলিক মারছে তার চোখে কোথা থেকে? সে সমুদ্রসৈকত থেকে বেশ কিছুটা দূরে জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকা থমথমে ও গম্ভীর দুর্গের দিকে ভালোভাবে তাকাল। ওদিকেই তো পুব-আকাশ। ওদিক থেকেই তো ধেয়ে আসছে সূর্যের বর্ণচ্ছটা! কপালে হাতের তেলো রেখে চোখ মেলে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে কৈটভ এক বিষম চমক খেল। সে অস্পষ্টভাবে দেখছিল এক নারীর মুখ ও

অবয়বের কিছুটা। সেই নারীর সৌন্দর্যের আভা দূর থেকে তার কাছে উদিত সূর্যের বর্ণচ্ছটা বলে মনে হয়েছিল। কৈটভ কিন্তু মধু-র মতো স্বভাবের নয়। সে নারীকে কামনা করে না। শুধু পুজো করতে চায়। দুর্গের প্রাকারে কাকভোরে তিলোত্তমাকে অস্পষ্টভাবে দেখে তার হাত দুটি এমনিতেই প্রণামের ভঙ্গিতে কপালে উঠে এসেছিল। সমুদ্রের ঢেউয়ে অবিরাম লুটোপুটি খেতে থাকা হাঙরের পাল-কে সাক্ষী রেখে কৈটভ সেই পবিত্র ভোরে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, এই সূর্য-সমৃদ্ধ নারীকে সে যে-কোনো মূল্যে বিবাহ করবে। কিন্তু তার সঙ্গে বিছানার আমিষ উল্লাসে যাবে না কোনোদিন। তার বাড়িটি হবে বস্তুত এক গম্ভীর মন্দির। আর সেই নির্জন মন্দিরে সে প্রতিষ্ঠা করবে ওই নারীকে। তাকে এবং তার অভূতপূর্ব রূপরাশিকে পুজো করবে দিনগুলিতে এবং রাতগুলিতেও।

সুতরাং আবার আমাদের পৃথিবীতে রচিত হল আরো একটা ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। যা এর আগে বহুবার, সম্ভবত অযুত ও নিযুতবার যুগপৎ সফল এবং ব্যর্থ লেখকদের দ্বারা রচিত হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠক, আপনি অনুগ্রহ করে ধৈর্য হারাবেন না। আমার এই গল্পটি সূচনাপর্বে ত্রিকোণ প্রেমের গল্প বলে মনে হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তা নয়। প্রতিটি ত্রিকোণ-প্রেম জাতীয় গল্পের আদি থাকে, মধ্য থাকে, অন্তও থাকে। অতীত থাকে, বর্তমান থাকে এবং ভবিষ্যৎও থাকে। আমি, সূর্যকরোজ্জ্বল একজন লেখক হিসেবে দাবি করছি যে, আমার এই গল্পটি আদৌ গল্পের নয়, ত্রিকোণ-প্রেমেরও নয়, মধু-কৈটভেরও নয়। অতীতের নয়, বর্তমানেরও নয়। ভবিষ্যতের হলেও হতে পারে। তবে সেটা ধীশক্তিসম্পন্ন পাঠকই একমাত্র বিচার করবেন। কেননা আমার এই কাহিনী ত্রিকোণ প্রেমের সম্ভাবনাহীন সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে অনন্তের অসম্ভব সম্ভাবনার দিকে ভেসে যেতে পারে। শুধুমাত্র এই কাহিনী তিনটি চরিত্রকে (তিলোত্তমা, মধু ও কৈটভ) ঘিরেই আবর্তিত হবে না। আসবে বরফ সাহেবের কথা। একটি বানরের কথাও আসবে, যাকে পিকাসো এঁকেছিলেন সেই ১৯৫৪ সালে, 'নারী ও বানর' ছবিতে। সুতরাং আমার এই গল্পটি ক্রমশ হয়ে উঠবে শেষহীন এক আলোছায়াময় তাঁত। যা পাঠ করার পর হয়তো পাঠকের মনে একটাই অনিবার্য কবিতাপঙ্‌ক্তি ঝলসে উঠবে; যা হল — 'অনন্ত কুয়োর জলে চাঁদ পড়ে আছে'...

বরফ-সাহেবের কথা

এই শহরের সব থেকে অভিজাত এলাকায় বাস বরফ-সাহেবের। তাঁর নাম বরফ-সাহেব হবার যথেষ্ট কারণ আছে। লোকটির উচ্চতা ছ-ফুট তিন ইঞ্চি। ওজন একশো বাইশ কেজি। তাকে দেখে সচল এবং বেঢপ এক মাংসস্তূপ বলে মনে হতে পারে। সব সময়ই তার পরনে থাকে ঢোলা জোব্বা ও আলখাল্লা। কপালে কালো ফেট্টি। মাথার দীর্ঘ এবং ঝাঁকড়া চুল বিনুনি করে বাঁধা। হঠাৎ তার পিঠের দিকে তাকালে মনে হতে পারে, কুচকুচে কালো এক সাপ পিঠে বেখেয়ালে শুয়ে আছে। এই লোকটির শরীরে শুধু মাংস আর মাংস। সে, কথা বললে মনে হয় সিংহের গর্জন। কিন্তু বরফ-সাহেব নাম হবার কারণ হল তার সর্বদা ঘোর রক্তবর্ণ হয়ে থাকা চোখদুটি। চোখ তো নয় যেন অগ্নিগোলক। সেই চোখে সমন্বয়ে ভয়ংকর ছায়া ফেলে কুটিল হিংস্রতা, উথালপাতাল যৌনতা, অন্তহীন লোভ, সুতীব্র জিঘাংসা এবং অপার মেধাহীনতা।

যে-কোনো মানুষ যদি সেই চোখের দিকে তাকায় তাহলে ভয়ে তার গা-হাত-পা ঠান্ডা বরফ হয়ে যাবে। তাই এই শহরের অধিবাসীদের মুখে মুখে প্রচলিত তার নাম—বরফ-সাহেব। যে-কোনো পবিত্র এবং মধুগন্ধ শিশু, বরফ-সাহেবের চোখের দিকে তাকালে নিজের অজান্তেই নিঃসাড়ে হিসি করে ফেলবে। এ-কথাও চালু আছে যে, বেশ কিছু পদ্মগন্ধা কিশোরীর প্রথম রজোদর্শন হয়েছিল বরফ-সাহেবের রক্তবর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে। এই শহরে এরকম গল্প চালু আছে বলেই যে সব কিশোরী বয়ঃসন্ধিকালের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে তাদের চিন্তিত মা কিংবা ঠাকুমারা তাদের টানতে টানতে নিয়ে আসে বরফ-সাহেবের সামনে। তার চোখের দিকে তাকালেই ভীত কিশোরীদের গোপন রজ নিঃসৃত হতে থাকে এবং তারা অচিরেই রজস্বলা হিসেবে প্রমাণিত হয়।

বরফ-সাহেব বিষয়ে এত কথা জানানোর কারণ একটাই যে তিনি এই শহরের জটিল অপরাধজগতের অ-বিতর্কিত এবং অবিসংবাদী নায়ক কিংবা নিয়ন্ত্রক। চোর-ডাকাত-ছিনতাইকারী-ধর্ষক-খুনি সবাই বরফ-সাহেবের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। এই শহরের প্রমোটাররা এবং বেআইনি জমি-দখলকারীরাও বরফ-সাহেবের অঙ্গুলি-হেলনে ওঠাবসা করতে অভ্যস্ত। যদি কোনো নির্জন টানেলে পাতাল রেলের লাইনের ধারে অচেনা যুবকের বিকৃত মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে জানতে হবে বরফ-সাহেবের পরিকল্পনামতোই হতভাগ্য যুবকটিকে পৃথিবীর মায়া অকালে কাটাতে হয়েছে। অকস্মাৎ কোনো রমণীয় প্রভাতে সমুদ্রসৈকতে যদি সম্পূর্ণ নগ্ন কোনো যুবতীর প্রাণহীন দেহ পাওয়া যায় এবং তার জানুতে ও যোনিতে ক্ষত ও রক্তচিহ্ন থাকে, তাহলে বুঝতে হবে আসুরিক কামনা চরিতার্থ করার মুহূর্তে ওই অপরিণামদর্শী যুবতী বরফ-সাহেবকে বাধা দিয়ে তার বিরক্তি উৎপাদন করেছিল।

বরফ-সাহেব ছিলেন। আছেন। থাকবেন। এমনকী সুরা, নারী, বিচিত্রানুষ্ঠান, ক্রীড়া-উৎসব এবং অন্যান্য যাবতীয় উৎসব বিষয়ে যা কিছু স্পনসরশিপের নিত্য আয়োজন তার অন্তরালেও থাকে বরফ-সাহেবের নিয়ন্ত্রণ।

আর পাঠক, এবার আপনাকে আমি সেই গোপন তথ্য জানাই যা জানামাত্র আপনি হয় আনন্দিত হবেন কিংবা বিস্মিত হবেন অথবা চমকে উঠবেন।... যে-তিলোত্তমা নারীটির কথা আমি কিছু আগে আপনাদের বলেছি সে হল প্রকৃতপ্রস্তাবে এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ বরফ-সাহেবেরই রক্ষিতা।... নাহ্, নিজের ইচ্ছায় তিলোত্তমা এই পাষণ্ডের কাছে ধরা দেয়নি। বস্তুত বরফ-সাহেব তাকে লুঠ করে এনেছেন যখন তিলোত্তমা সবেমাত্র কিশোরী তখন। প্রথাসিদ্ধভাবে বরফ-সাহেবের ভয়ংকর চোখের দিকে তাকিয়েই লুণ্ঠিতা তিলোত্তমার প্রথম রজোদর্শন হয়। তারপর থেকে প্রতি রাতে তিলোত্তমাকে বিলাসবহুল দুর্গে বরফ-সাহেবের অঙ্কশায়িনী হতে হয়। সারাদিন অজস্র দাসী তিলোত্তমার দেখভাল করে এবং তাকে পাহারা দেয়। দুর্গের চারধারেও সশস্ত্র পাহারা থাকে। তা সত্ত্বেও, 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' এই প্রবাদবাক্য অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের দুই মরদ মধু ও কৈটভ তিলোত্তমাতে মজে যায়। ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের কাহিনীও অন্যদিকে বেঁকে যায়। তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করে বরফ-সাহেবের চেনা ছক পালটে যায়। তার শয়তানি মস্তিষ্কে উদ্ভাসিত হয় আর এক নতুন ছক।

উদ্বেগহীন একটা দিন। আবহাওয়া সরস্বতী পুজোর দিন স্কুল-বালিকাদের শ্যাম্পু করা চুলের মতো ঝরঝরে। বরফ-সাহেব বসে আছেন তাঁর গদিতে। বাজার-এলাকার মাঝখানে এক বড়োসড়ো বাড়ির (চারতলা উঁচু) তিন-তলাতে এই গদি। এটি বরফ-সাহেবের মূল বাসস্থান। আর সমুদ্রের ধারে যে গম্ভীর এবং রহস্যময় দুর্গ সেটির মালিকানাও বরফ-সাহেবেরই। সেই দুর্গে বন্দী আছে তিলোত্তমা। গভীর নিশীথে তিনি সেই দুর্গে যান। সারাদিন ধরে কতরকম অবৈধ এবং দু-নম্বরি কাজ-কারবার তাঁর। কত ক্লান্তি জমে দেহে। কত শ্রান্তি জমে মনে। রাতের গভীরে দুর্গের গোপনে বরফ-সাহেব স্বর্ণভৃঙ্গারে মদ্যপান করেন। তিলোত্তমাকে হুকুম দেন নাচতে। নগ্ন নৃত্য। রীতিমতো স্ট্রিপটিজ পদ্ধতি। যা বরফ-সাহেব দ্যাখেন প্রায়ই নিজের গদিতে বসে ডিভিডি প্লেয়ারে। বিদেশের, বিশেষত প্যারিসের নাইটক্লাবগুলির রানিং ভিডিয়ো-শো ক্যাসেট-বন্দী হয়ে চলে আসে সাগর পেরিয়ে বরফ-সাহেবের হাতে। এক-একটা ক্যাসেটের মূল্য আটশো থেকে হাজার ইউরো। অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা। এরকম কত ক্যাসেট আছে তাঁর। পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরী এবং নর্তকীদের নগ্ন শরীর দেখতে দেখতে বরফ-সাহেবের আজকাল ক্লান্তি আসে। হাই ওঠে। তবে কিনা এইসব নিষিদ্ধ ক্যাসেট দেখেই বরফ-সাহেব শিখেছেন কীভাবে স্ট্রিপটিজ পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে নারী কিংবা নর্তকী একটা একটা করে বসন পরিত্যাগ করে। শেষে আকাঁড়া নগ্নতা নিয়ে হাজির হয় কামাতুর পুরুষের সামনে। তিলোত্তমাকে সেই পদ্ধতি তিনি ধৈর্য ধরে নিজ হাতে শিখিয়েছেন। এখন তিলোত্তমা এই পদ্ধতিতে খুবই দক্ষ। প্রতি রাতে তার মনিবকে আনন্দদান করতে তার পরিশ্রমের ঘাটতি নেই। পরিণামে, দুর্গের অভ্যন্তরে অগুন্তি লোকলস্করের কাছে সে পেয়ে থাকে ক্লিওপেট্রার সম্মান।

ঝরঝরে সকালে বরফ-সাহেব আনমনে বসেছিলেন। তাঁর সামনে সুদৃশ্য সেন্টার-টেবিলে রাখা আছে এক গ্লাস সবুজ পানীয়। আর একটি প্লেটে কাবুল থেকে আনানো স্পেশাল কাজুবাদাম। সবুজ পানীয়টি দেখে অনেকেই ভাবতে পারেন বিশেষ কোনো মদ। কিন্তু আসলে ওটি কাঁচা নিমপাতার রস।

এমন সময় বরফ-সাহেবের মোবাইল বেজে উঠল। এখন আবার কে বিরক্ত করছে?

— কোন শুয়োরের বাচ্চা বে? বরফ-সাহেব জানতে চাইলেন।

— বস্ আমি।

— শুয়োরের বাচ্চা, নামটা বল্?

— আমি কাল্লু।

— হ্যাঁ কাল্লু? কী খবর?

— তোমার প্ল্যানটা ক্লিক করেছে বস্।

— হ্যাঁ রে শুয়োরের বাচ্চা, কোন প্ল্যানটা? খানকি মাগির যেমন চৌষট্টি কলা আমারও তেমনই চৌষট্টি রকম কাজ-কারবার।

— মধু রাজি হয়েছে।

— মধু? কোন মধু?

— যে তিলোত্তমাকে লাইন মারে।

— ওহ্, সেই শুয়োরের বাচ্চা? রাজি হয়েছে?

— রাজি হয়েছে। ও লড়বে কৈটভের সঙ্গে।

— ব্রাভো। আর কৈটভ কী বলছে?

— সেও রাজি হয়েছে। লড়বে মধুর সঙ্গে।

— বা রে শুয়োরের বাচ্চা? তাহলে লড়িয়ে দে দুজনকে।

— সারা শহর পোস্টারে ভরিয়ে দিতে হবে বস্।

— পোস্টার তো দেবে স্পনসররা। শুধু মিডিয়াকে ডেকে একটা প্রেস কনফারেন্স করব। টাইটেল কী হবে জানিস?

— শুনছি বস্।

— এ ডুয়েল ফর তিলোত্তমা, দ্য প্যারাগন অব বিউটি... গালা শো। শো-টা করতে কত টাকার স্পনসরশিপ পাব জানিস?

— কত বস্?

— তা শুয়োরের বাচ্চা, অ্যামাউন্টটা প্রায় এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এ-ছাড়া টিকিট বিক্রি দশ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। এত বড়ো একটা সোর্ড-ফাইটিং হবে। সেই অকেশান কেউ ছাড়বে? মিডিয়াকে দিয়ে যা হাইপ তুলব স্পনসরশিপ অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। মোবাইল কোম্পানি, তেল কোম্পানি, চাল এবং ডালের মিল, টিভি কোম্পানি, জুয়েলারি হাউস, এরা তো সব উঁচিয়ে আছে প্রোগ্রামটাকে স্পনসর করতে। একটা নতুন টিভি চ্যানেলের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। তারা লাইভ-টেলিকাস্ট করবে মধু আর কৈটভের সোর্ড-ফাইটিং কিংবা বলা যায় ডুয়েলের।

— দারুণ জমবে বস্! শুধু একটা সাজেশান ছিল...

— কী বলবি?

— তিলোত্তমাকে যদি স্পটে রাখা যেত। ধরো... ফাইটিং যেখানে চলছে তার থেকে কিছুটা দূরে তিলোত্তমা সিংহাসনে বসে থাকবেন। তাঁকে ঘিরে থাকবে সিকিউরিটিরা। কেউ কাছাকাছি যেতে পারবে না। সবাই দূর থেকে দেখবে। মধু আর কৈটভও জানবে তিলোত্তমা আছে একটু দূরে। ফাইটিং-এ ইনস্পিরেশন পাবে ওরা...

— চোপ শুয়োরের বাচ্চা? তুই তিলোত্তমাকে বাজারের মেয়ে বানাতে চাস?

— নাহ্ বস্, আমি তা বলিনি...

— ওদের ডুয়েল যেখানে হবে তার কাছাকাছি তিলোত্তমার একটা ছবি ডিসপ্লে করা যেতে পারে। গুড আইডিয়া...

— হ্যাঁ বস্, আমি তাই বলছিলাম।... মধু আর কৈটভকে যুদ্ধে রাজি করানোর জন্য আমার টাকাটা?

— হ্যাঁ রে শুয়োরের বাচ্চা পাবি। কুড়ি হাজার টাকার চেক নিয়ে যাবি আমার অফিস থেকে।

ফোন কেটে দিলেন বরফ-সাহেব। কাল্লুর মতো তাঁর অনেক শাগরেদ এই শহরের নানাপ্রান্তে ছড়ানো আছে। তাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট 'অ্যাসাইনমেন্ট' আছে। প্রতি অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে

দেদার টাকা ছড়াতে পারেন বরফ-সাহেব। আর তাই তিনি অবলীলায় তাদের বারবার শুয়োরের বাচ্চা সম্বোধন করে থাকেন। কেউ রাগ করে না।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তিলোত্তমাকে মধু আর কৈটভ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিয়ম করে 'লাইন' মারছে সে-খবর শাগরেদ-মারফত বরফ-সাহেবের কানে পৌঁছেছে। এটাও তিনি জানেন, দুর্গের প্রাকার থেকে তিলোত্তমা তাদের যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছেন তিনি। তারপর ঠিক করেছেন এটাকে একটা 'ইভেন্টে' পরিণত করে, মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে, স্পনসরশিপের মাধ্যমে প্রচুর টাকা আয় করার সম্ভাবনা আছে। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। অভিনব অসিযুদ্ধে মেতেছে তিলোত্তমার জন্যে উন্মাদ দুই মরদ। ব্যাপারটাকে একটা 'গালা শো'-তে রূপ দেওয়া গেছে! এক নারীর জন্যে দু-জনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ; — সিনেমার পরদায় নয়, বাস্তবে। লাইভ শো। লাইভ টেলিকাস্ট। সেটা দেখতে দর্শক সমাগম তো হবেই। ইনডোর স্টেডিয়াম লোকে লোকারণ্য। বিভিন্ন চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে দিতে বরফ-সাহেব ক্লান্ত। মিডিয়ার একটা প্রশ্নের জবাব বরফ-সাহেব দিয়েছেন যথেষ্ট হেঁয়ালির সঙ্গে।

মিডিয়া জানতে চেয়েছিল — শেষপর্যন্ত কী হবে? কে পাবে তিলোত্তমাকে? মধু না কৈটভ? আপনার কী মনে হয়? বরফ-সাহেব বলেছেন — সেটা জানা কিংবা ঘোষণা করা কী কারোর পক্ষে সম্ভব?

— তবুও?... একটা হাঞ্চ?...

— আমার মনে হয় দু-জনেরই চান্স ফিফটি ফিফটি। মধুর ক্ষেত্রে যেমন তা সত্যি। কৈটভের ক্ষেত্রেও তাই।

এরকম অস্পষ্ট উত্তর একটা দিয়েছেন বটে বরফ-সাহেব। কিন্তু তিনি আসল সত্যিটা তো জানেন। তিনি জানেন, এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে কেউ জিতবে না। দু-জনেই মারা যাবে। বরফ-সাহেবের নির্দেশ অনুসারে মধু আর কৈটভের অসি বা তলোয়ারের ডগায় প্রলেপ দেওয়া আছে এমন এক মারাত্মক বিষের যা শরীরে রক্তের সঙ্গে মিশলে মৃত্যু অনিবার্য। যদিও সেই বিষের ক্রিয়া শ্লথ। মৃত্যু আসবে অকস্মাৎ নয়। ধীরে ধীরে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ যখন, তখন দু-জনেই দু-জনকে আঘাত করবে। এবং তার ফলে দু-জনেই দু-জনের মৃত্যুকে নিশ্চিত করবে।

অলিন্দে পিকাশোর বানর

বিশাল, ফাঁকা এবং বিলাসদ্রব্যে সাজানো ঘরে একা বসেছিল তিলোত্তমা তার মহার্ঘ্য যৌবন এবং রূপরাশি নিয়ে। প্রশস্ত বাতায়ন উন্মুক্ত। বাইরে মৃদুমন্দ হাওয়া। সেই হাওয়াই তার কানে বয়ে আনছে জনতার চিৎকার, হর্ষধ্বনি, উল্লাস। তিলোত্তমা জানে, তাকে পাবার জন্যে মরণযুদ্ধে মেতেছে তার দুই প্রেমিক। দু-জনকেই সে সমান ভালোবাসে। কিংবা একেবারেই ভালোবাসে না। কিন্তু দু-জনের কোনো একজনকে সে চায়। জয়ী মরদের সাহায্যে সে এই দুর্গ থেকে পালাতে চায়। এই বন্দী-জীবন সে মেনে নিতে পারছে না। তাকে পালাতেই হবে।

দুর্গের সজাগ এবং সদাসতর্ক প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে বানরটি কখন যে বাতায়নের লাগোয়া অলিন্দে এসে পড়েছে তা তিলোত্তমা বুঝতে পারেনি। একা একা বসে সে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিল। আর ভাবছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধে কে জিতবে? মধু? না কৈটভ? দু-জনের

কাউকেই সে চেনে না। শুধু দুর্গের প্রাকার থেকে দেখেছে। দূর থেকে দেখে কিছু বোঝা যায়? মধুকে লেগেছে মধুর মতো। কৈটভকেও তাই। মানুষের স্বর শুনে তিলোত্তমা চমকে উঠল। কে যেন তার নাম ধরে ডাকল। কে?

— তিলোত্তমা? ও তিলোত্তমা?

কে ডাকে? বাতায়নের কাছে উঠে এল সে। ঝুঁকে দেখল অলিন্দে একটা বানর। প্রভাতের মেঘলা আকাশের মতো তার দেহবর্ণ। নরম আর পরিষ্কার লোমে ভরতি শরীর। কুতকুতে দুই বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। আর ঠোঁটদুটো লাল টুকটুকে।

— বানর, তুমি আমাকে ডাকছ?

— হ্যাঁ ডাকছি। এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?

— নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছি।

— ভেবে কী লাভ? নিজের ভাগ্য নিজে তৈরি করে নিতে হয়।

— হে বানর, তুমি একী বলছ?... আমি জানতাম ভাগ্য পূর্ব-নির্ধারিত।

— ওটা ফেটালিস্টদের কথা। আমি ফেটালিস্ট নই।

— তুমি তাহলে কী?

— আমি একজিসটেনসিয়ালিস্ট।

— তার মানে কী?

— মানে যারা, কমিটমেন্টে কিংবা সংকল্পে বিশ্বাস করে। কোনো কিছু পূর্ব-নির্ধারিত এটা মনে করে না। মনে করে ব্যক্তি তার আপন জীবনের কিংবা ভাগ্যের রূপকার।

— ধুর্, অতসব আমি বুঝি না। আমি মুখ্যু মেয়ে। পড়তে জানি না। লিখতে জানি না।

— যারা বেশি পড়তে ও লিখতে পারে তারা সবাই নিরেট বোকা।

— হি হি হি হি... বানরের কথা শুনে তিলোত্তমা হাসতে থাকে। আর বানর মুগ্ধতা-ভরা দুই চোখে দ্যাখে তিলোত্তমার হাসির সঙ্গে বাতাসে ঝরে পড়ছে কত অমূল্য মুক্তো।

— দাঁড়াও বানর, তোমার মুখটা বড়ো শুকনো লাগছে। তোমায় কিছু খেতে দি।...

তিলোত্তমা ঘরের ভেতরে তাকায়। শ্বেতপাথরের টেবিলে ঝকঝকে স্টিলের বাসনে কত খাদ্যদ্রব্য। তিলোত্তমার যদি প্রয়োজন হয় তাই ভেবে রাখা আছে। আজ সকাল থেকে তিলোত্তমা সেসব স্পর্শ করেনি। খাবারে তার মন নেই। তার মন বড়ো উচাটন হয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে সে ভাবছে মধু আর কৈটভের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা। কে জিতবে? কে হবে তার রক্ষাকর্তা? যুদ্ধে যে জিতবে সে পাবে তিলোত্তমাকে। আরো অনেক কিছু পাবে। একটা 'স্করপিও' গাড়ি পাবে। আর পাবে দশ লাখ টাকার চেক। কার কপালে সেই সৌভাগ্য নাচছে?

ঝুড়িতে অনেক ফল। আপেল, চেরি, নাসপাতি, আঙুর। যেন সেজান-অঙ্কিত দুর্লভ স্টিললাইফ। একছড়া আঙুর তুলে নিল তিলোত্তমা।

— ও বানর, আঙুর খাও।

— তাই দাও... বানর তার লোমশ হাত বাড়াল। বড়ো বড়ো তীক্ষ্ণ নখ। সেই নখের মৃদু আঁচড় পেল তিলোত্তমা নিজের সোনার বর্ণ হাতে। প্রচণ্ড শিহরন জাগল তিলোত্তমার শরীরে। তার যোনিমূল কেঁপে উঠল। সে অনুভব করল গোপন যোনিপ্রদেশ ধীরে ধীরে সিক্ত হয়ে

উঠছে। একী অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা? এই বানর কে? তার সামান্য স্পর্শে তিলোত্তমার শরীর জুড়ে এত উথালপাথাল আলোড়ন কেন?

— বানর তুমি কে?

— আমি এক সামান্য বানর।

— তুমি কী জন্যে এসেছ?

— তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

— আমাকে নিয়ে যাবে? কোথায়?

— যেখানে মুক্তি আছে, স্বাধীনতা আছে, অবাধ যৌনতা আছে। হিংসা নেই। অসূয়াও নেই।

— এরকম দেশ বা জায়গা কী আছে?

— আমাদের মনের মধ্যেই পছন্দের দেশ।

— বানর তুমি কি জানো?

— কী?

— আমাকে বাজি রেখে এই শহরে ডুয়েল লড়াই চলছে?

— জানি।

— মধু আর কৈটভ লড়ছে। ওরা দু-জনেই আমাকে ভালোবাসে।

— জানি। কিন্তু কেউই তোমাকে পাবে না।

— সেকি?...

— হ্যাঁ।... বরফ-সাহেবের সৌজন্যে সবই পূর্ব-নির্ধারিত। এর বেশি কিছু বলব না।

— বানর তুমি কী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা?

— I, Tiresias, old man with wrinkled dugs / Perceived the Scene, and foretold the rest...

— কিছুই বুঝলাম না বানর।...

— না বোঝারই কথা। ... তুমি তো আর এলিয়ট সাহেবকে পড়োনি।... আবার বলছি তিলোত্তমা, তুমি কী আমার সঙ্গে যাবে?

— মধু কিংবা কৈটভ?

— ওদের আশা তুমি ছেড়ে দাও।... এ-যুগের নারায়ণ বরফ-সাহেবের কূটবুদ্ধিই ওদের দু-জনের মৃত্যুর কারণ হবে।

— কিন্তু আমি কীভাবে যাব? দুর্গের অন্দরে পাহারা। দুর্গের বাইরেও পাহারা।

— সবাই তোমার পাহারায় নিযুক্ত আছে ঠিকই। কিন্তু কেউই প্রকৃত পাহারা দেবার মতো অবস্থায় নেই।

— মানে?

— এই প্রাসাদে যত দাসী আছে মন্ত্রবলে আমি তাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।

— আর বাইরে রক্ষীরা?

— তাদেরও মন্ত্রবলে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।...

— তাহলে আমি এখন দুর্গ থেকে পালিয়ে যেতে পারি?

— সে কথাই তো বোঝাতে চাইছি।

— তাহলে চলো বানর, আমি তোমার সঙ্গেই পালিয়ে যাই।

পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া—

তারপর বানর আর তিলোত্তমা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছোল যেখানে বরফ-সাহেবের হাত পৌঁছোবে না। যেখানে রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু নেই। শকুনের উল্লাস নেই। ঈগলের বিশাল পাখার ঝাপট নেই। সভাপতিদের নিয়ন্ত্রণ নেই। মৌলবাদীদের আলখাল্লা নেই। এই দেশে শুধু আনন্দ, অবাধ আনন্দ। যে-আনন্দ কবির কিংবা চিত্রকরের। যে-আনন্দে ফুল ফোটে। আকাশে ওঠে রামধনু। শিশুরা অকারণ হাততালি দিয়ে ওঠে।

তিলোত্তমা বলল — আহ্, কী সুন্দর দেশ। এখানে হাওয়ায় হাওয়ায় ঘাসে ঘাসে মুক্তির স্বাদ পাচ্ছি। এখানেই আমি থাকব। বানর বলল — হ্যাঁ। এখানে আমাদের জন্যে আছে একটা শান্ত নদী। সেই নদীর পাড়ে একটা মাটির বাড়ি। সেই বাড়িকে ঘিরে আছে এক অপূর্ব গোলাপবাগ। একশো এক রকমের গোলাপ ফোটে সেখানে। সারাদিন আমরা অজস্র গোলাপকে চোখের সামনে ফুটতে দেখব। আবার অনেক গোলাপকে মৃত্যুর হিম বিষণ্ণতা নিয়ে ঝরে পড়তেও দেখব গভীর ঘাসের বিছানায়।

— আর কী কী আছে গো সেখানে?

— আর আছে লাল টিলা। তার ওপর গড়িয়ে পড়ছে আলখাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ। গড়িয়ে পড়ছে উসকোখুসকো ভেড়ার পাল...

আকাশ ধনুকের মতো নেমে এসেছে মেদিনীর বুকে, সেখানে জ্যা-চিহ্ন দিগন্তরেখা। মুক্তির অনাবিল আনন্দে তিলোত্তমা সেই দিগন্তরেখার দিকে ছুটে যেতে লাগল। তার পেছনে ছুটছিল বানরও। অনেক সময় ধরে দীর্ঘস্থায়ী হল সেই ছোটাছুটি, হুটোপাটি, লুটোপুটি।

তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে তিলোত্তমা শুয়ে পড়ল উন্মুখ ঘাসের বিছানায়। একে একে শরীরের সব প্রচ্ছদ খসিয়ে ফেলল সে। তারপর অদ্ভুত আবেশঘন গলায় বলল— আইসো বানর, হে অমিতবিক্রম কথাকার, হে রামধনুর সুহৃদ, আমাতে প্রবিষ্ট হও। ... আমাকে সেই তৃপ্তি, সেই আনন্দ দাও যা বিক্ষুব্ধ বজ্র-বিদ্যুতের অথবা ভূমিকম্প-আন্দোলিত বসুন্ধরার অথবা সুনামি-বাহিত জলরাশির!

ক্রমাগত বিড়বিড় করছিল তিলোত্তমা। বলছিল — বানর, তুমি আমাকে সেই আনন্দ দাও যা একবার পেলে বৃক্ষ কোনোদিন ফসিল হয় না, আর নারী জরা, কুৎসিত বার্ধক্য থেকে অনেক অনেক দূরে থাকে ...

দু-রকম জীবন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নদীর ধারটা আগে কত ফাঁকা ছিল, এখন প্রচুর বাড়িঘর উঠে গেছে। অনেক দোকানপাট, ছোটোখাটো উটকো ধরনের মন্দির। পুরোনো আমলের শিবমন্দিরটা আবার খানিকটা জীর্ণ হয়ে গেছে, সংস্কার হয়নি অনেকদিন। কাক ও অন্যান্য পাখিরা নিয়ে আসে বট-অশ্বত্থের বীজ, মন্দির-টন্দিরে তারা দিয়ে যায় বিষ্ঠার উপহার।

মন্দিরের ঠিক পেছনেই যে-ঘাটটা, তার সিঁড়িগুলোতে বড়ো বড়ো ফাটল, পাশেই তৈরি হয়েছে একটা নতুন ঘাট। ভাটার সময় নরম মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায় বিসর্জন দেওয়া কোনো কোনো ঠাকুরের খড়ের কাঠামো। সেগুলো দেখে কোনটা কী ঠাকুর, তা আর চেনা যায় না। শুধু কালীমূর্তি নয়, বিসর্জনের পর লক্ষ্মী, সরস্বতীও নগ্ন।

একটি ন-দশ বছরের ফ্রক পরা বালিকা প্রায় প্রতিদিনই আসত ওই পুরোনো ঘাটে। কাছেই জনার্দন পূজারী লেনে তার বাড়ি। ওঃ, কী ডাকাবুকোই না ছিল সে-মেয়েটা। সে যে মেয়ে, অর্থাৎ ছেলেদের থেকে আলাদা। এটা কিছুতেই মানতে চাইত না। সব ব্যাপারে তার ছেলেদের সমান হওয়া চাই। ঘাটের পইঠা থেকে দড়াম দড়াম করে লাফিয়ে পড়ত জলে। অন্য ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সাঁতার কাটতে কাটতে চলে যেত অনেকদূর, যেখান দিয়ে লঞ্চ যায়, একবার তার চাকার টানে পড়লেই তো শেষ! আবার ডুব দিয়ে মাটি তোলা!

কী যেন নাম ছিল মেয়েটার? অনি। এখনো মনে আছে অনেকের। ফুলওয়ালা, তেলেভাজার দোকানদার, তারা জানত, বস্তির মেয়ে নয়, বাবুদের বাড়ির মেয়ে, কিন্তু কাঙালি চেহারার সমবয়েসি ছেলেদের সঙ্গেও সে পাল্লা দিত সব ব্যাপারে।

ন-দশ বছরেই ডাগর চেহারা, একটু একটু স্তনের আভাস এসেছে বুকে, কিন্তু তার একটুও হায়া বোধ নেই। ভিজে গায়ে ওঠার সময়েও বুকের সামনে দু-হাত জোড়া করত না।

এক-একদিন জলে অনেকক্ষণ ধরে দাপাদাপি করলে তাকে ডাকতে আসত বাড়ি থেকে। এক বুড়ি। সে খুবই রাগারাগি আর গালমন্দ করত, কিন্তু সে একেবারে ফোকলা বলে কিছুই বোঝা যেত না তার কথা। অনি জল থেকে উঠে এসে সেই বুড়ির হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে দৌড় দিত বাড়ির দিকে।

এক দু-বছর পরে, আর একটু ঢ্যাঙা হলে এরকম মফস্‌সল শহরের মেয়েদের শাড়ি পরতে হয়। ছেলেরা তখনো হাফপ্যান্ট পরে। অনি ফ্রকের ওপর একটা শাড়ি জড়িয়েই আসত। ঘাটে পৌঁছেই এক টানে শাড়িটা খুলে ফেলে ঝাঁপ দিত নদীতে। জলের নেশা ছিল মেয়েটার। বাড়িতে স্নানের জায়গা ছিল নিশ্চয়ই। তবু ঝড়-বৃষ্টির দিনেও তার গঙ্গায় আসা চাই।

আর একটু বড়ো হলে, শরীরের অগ্রগতির জন্য তাকে ফ্রক ছাড়তেই হল। তার অস্তিত্বে যৌবন বাজনা বাজাতে শুরু করেছে। স্কুলে যায় সালোয়ার-কামিজ-ওড়না পরে। শাড়িও পরে। শিবরাত্রির দিন লালপাড় শাদা শাড়ি পরে পল্লির অন্য মেয়েদের সঙ্গে পুজো দিতে আসত এই মন্দিরে। সামনের বড়ো চাতালটায় মাঝরাত্তির পর্যন্ত সবার সঙ্গে সে শুনেছিল পালাকীর্তন। অমন দস্যি মেয়ে তখন খুব শান্ত।

চোদ্দো বছর বয়েস পূর্ণ হবার আগেই অনিরা চলে গেল এই পাড়া ছেড়ে।

কীসব যেন শরিকি গন্ডগোলে তাদের বাড়ির অংশ বিক্রি হয়ে গেল। পুরোনো আমলের যৌথ পরিবার হঠাৎই একদিন দু-তিন টুকরো হয়ে যায়। এ-পাড়া ছেড়ে শুধু নয়, অনিরা মফস্‌সল ছেড়ে চলে গেল খাস কলকাতায়, ঢাকুরিয়া ব্রিজের পাশে। সেখানে কোনো নদী নেই। দক্ষিণ কলকাতার মধ্যবিত্ত মানুষরা গঙ্গায় স্নান করতেও যায় না। শুধুমাত্র বছরে দু-একবার ট্রেন ধরতে যাবার সময় হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে চকিতে গঙ্গাদর্শন হয়।

সেই শিবমন্দিরের ঘাটের কেউ আর অনিকে কোনোদিন দেখেনি।

আজ সকাল থেকে মাঝে মাঝেই ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে। শরৎকালের বৃষ্টি, অকস্মাৎ আসে, বেশিক্ষণ থাকে না, আকাশ নীল হয়ে যায়, আবার ম্যাজিকের মতন মেঘ ঘনায়।

সকাল এগারোটা। তেত্রিশ-চৌতিরিশ বছরের এক তরুণী ধীর পায়ে হাঁটছে নদীর ধার দিয়ে। তার সবুজাভ শাড়ির সঙ্গে মানানসই ব্লাউজ ও পায়ের চটি দেখেই বোঝা যায়, সে শহুরে মেয়ে। ঘাড় পর্যন্ত চুল, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। মন্দিরের পাশের ফুলওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে সে একসময় জিজ্ঞেস করল, — কী গো গজাদা, আমায় চিনতে পারো?

তিরিশ বছর ধরে গজানন এই একই জায়গায় ফুল-বেলপাতা বিক্রি করে যাচ্ছে। তার অবস্থার কোনো উন্নতিও নেই, অবনতিও নেই। শুধু সময়ের নিয়মে তার শরীরে নানান ভাঁজ পড়েছে।

গজানন ফাঁকা চোখে চেয়ে আছে দেখে মেয়েটি আবার বলল, — আমি অনি। অনি। আমাকে মনে নেই?

অনি নামে এক দুরন্ত বালিকার কথা গজাননের ঠিকই মনে আছে, কিন্তু তার সঙ্গে এই বড়োলোক বড়োলোক চেহারার তরুণীকে সে কী করে মেলাবে? বড়োলোক হলে গায়ের রংও ফরসা হয়ে যায়। সেই অনি ছিল প্রায় শ্যামলা রঙের। এই রমণী যদি সেই অনিও হয়, তাহলেও তাকে চেনার কী দরকার গজাননের।

তেলেভাজার দোকানদার বীরু আর নেই, তার ছেলে ভজন এখন সেই দোকান চালায়। সে প্রায় অনিরই সমবয়েসি, কুড়ি-বাইশ বছর আগে সেও অনির সঙ্গে সাঁতার কেটেছে। ভজনও চিনতে পারল না।

ধনুকের মতন ভুরু কামানো, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, এরকম মহিলারা একা কোনো দোকান থেকে আলুর চপ, ফুলুরি কেনে না। বাড়িতে খায় হয়তো। ভজন যে শুধু চেহারাটা মেলাতে পারল না তাই-ই নয়, অনি নামটাও তার মনে নেই।

অনি এখন অনিন্দিতা। মফস্‌সল ছেড়ে শহরে চলে গিয়েও সে ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার তেজ ছাড়েনি। না সাঁতারে, না পড়াশুনোয়। কো-এডুকেশান স্কুল, ক্লাসে প্রথম বছরে থার্ড হয় অনিন্দিতা, পরের বছর থেকে একেবারে ফার্স্ট। কেমিস্ট্রিতে পি.এইচ.ডি. করার পর অনিন্দিতা এখন সায়েন্স কলেজে অধ্যাপনা করে। এতগুলো বছরের মধ্যে চলে গেছেন বাবা-মা দু-জনেই। তার স্বামী বিদেশ-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার এবং ক্যালকাটা ক্লাবের উচ্চাকাঙ্ক্ষী সদস্য। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এগারো তলার ওপরে ফ্ল্যাট। নানা রকম সাফল্যের দিক থেকে তারা সমাজের উচ্চকোটির মানুষ।

ঠাকুমা এতদিন বেঁচে ছিলেন। থাকতেন জ্যাঠতুতো ভাইদের সংসারে। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এতকাল পরে তার জন্মস্থানে ফিরে এসেছে অনিন্দিতা। না এলেও পারত। সে-এখন অন্য জগতের মানুষ। ঠাকুমা সম্পর্কেও এমন কিছু মায়ার টান ছিল না। ছোটোবেলায় বাবা-কাকা-জ্যাঠাদের নানা রকম রেষারেষির কথা মনে পড়লেই তার বিরক্ত লাগে।

তবু সে এসেছে, হয়তো এখানকার গঙ্গার কথা ভেবেই।

কাল চুকে গেছে শ্রাদ্ধশান্তি, জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই ও তাদের বউরা এখন তার সঙ্গে খাতির করে কথা বলে। তার সাজসজ্জার রুচি দেখেও তারা মুগ্ধ। রিটার্ন অব দ্য প্রডিগাল সান-এর মতন, প্রডিগাল ডটার।

আজই ফিরে যাবে অনিন্দিতা, সকালবেলা ইচ্ছে করেই অন্য কারুকে সঙ্গে না নিয়ে সে এসেছে ঘাটের দিকে।

অনেক কিছুই মিলছে না স্মৃতির সঙ্গে। প্রিয় জায়গাগুলো কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে দেখায়। নদীটা বদলায়নি বটে, কিন্তু পুরোনো ঘাটটা বেশ নোংরা আর নতুন ঘাটটায় বড্ড ভিড়।

এই গঙ্গায় স্নান করার একটুও ইচ্ছে জাগল না অনিন্দিতার। বরং একটু যেন বিকর্ষণই বোধ করল।

যে দু-একজন মানুষকে চিনতে পারছে অনিন্দিতা, তারা তাকে চিনতে পারছে না। সবাই ভুলে গেছে। এরা সব স্থাণু, সেই তুলনায় অনিন্দিতা আরো কত মানুষের সঙ্গে মিশেছে।

নেমে গেল ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

যথেষ্ট হয়েছে। আর ঘোরাঘুরি করা যাবে না। এবার ফিরতে হবে। ও-বাড়ি থেকে তুলে নিতে হবে ব্যাগটা।

ভিজতে রাজি নয় অনিন্দিতা। তার পায়ের জুতোজোড়া বেশ দামি, এ-জুতো একবার ভিজে গেলে শেপটাই নষ্ট হয়ে যায়।

একটা সাইকেল রিকশা আসছে, খালি, চালকটি চেয়ে আছে তারই দিকে। অনিন্দিতা হাতছানি দিয়ে ডাকতে সে যেন অদ্ভুত ব্যবহার করল, পট করে ঘুরিয়ে নিল মুখটা। এ-আচরণ বেশ অস্বাভাবিক। কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভারদের এরকম মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া দেখার অভ্যেস আছে। কিন্তু মফস্‌সলের সাইকেল রিকশা চালকদের মধ্যেও সে অসভ্যতা সংক্রামিত হয়েছে নাকি? তাও খালি রিকশা, এখনো সেটা চলেও যায়নি, একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটির মুখ কী চেনা চেনা? কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও তো এখানে সাইকেল রিকশার চল ছিল, তাদের কেউ হতে পারে। তাকে চিনতে পেরেছে? তাহলে মুখ ফিরিয়ে নেবে কেন?

অনিন্দিতা অপেক্ষা করতে লাগল, লোকটি কী আর এদিকে মুখ ফেরাবে না? আর একটি খালি রিকশা চলে গেল। অনিন্দিতা তাকে ডাকল না।

হ্যাঁ, লোকটি ফিরিয়েছে মুখ, কিন্তু অনিন্দিতা চিনতে পারছে না। বেশি বয়স্ক কেউ নয়।

অনিন্দিতা আবার হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, — এই, এদিকে এসো।

এবার সে এল।

চাতালটুকু দৌড়ে পেরিয়ে গিয়ে অনিন্দিতা রিকশায় চড়ে বসেই বলল, — একটু আগে তোমাকে ডাকলাম, তুমি এলে না কেন? দেখতে পাওনি?

জোয়ান বয়েসি চালকটি কোনো উত্তর না দিয়ে আর একবার চাইল অনিন্দিতার মুখের দিকে। হ্যাঁ, আরো বেশি চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু কিন্তু ভুল হচ্ছে কী?

অনিন্দিতা জিজ্ঞেস করল, — তুমি আমায় চেনো? আমি অনেক বছর আগে এখানে থাকতাম।

লোকটি বলল, — হ্যাঁ। একজনের সঙ্গে যেন একটু একটু মিল আছে। অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে।

এবার অনিন্দিতা গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বলল — রতন!

ফুলওয়ালা একই আছে, তেলেভাজার দোকানদারের ছেলে এখন সে-দোকান চালায়, মন্দিরের পুরুতমশাইও একই ব্যক্তি রয়েছেন, কিন্তু রতনের তো রিকশা চালাবার কথা নয়। সে ভটচায্যি পাড়ার ছেলে, ইস্কুলেও পড়ত। পড়াশুনোয় তেমন মন ছিল না। ক্লাস সেভেনে রতন ফেল করেছিল, এ-পাড়ার সবাই জানত।

অনিন্দিতা বলল, — আমি অনি।

রতন দু-বার মাথা নাড়ল। বাল্যকালে সে কয়েকবার অনির দুরন্তপনায় তিতিবিরক্ত হয়ে তার চুল ধরে টেনেছে, কিন্তু এখন এই মহিলাকে কি সে ডাকনামে ডাকতে পারে? আপনির বদলে সম্বোধন করতে পারে তুই? মাঝখানে যে অনেকখানি সামাজিক ব্যবধান।

সরাসরি সম্বোধন না করে রতন জিজ্ঞেস করল, — কোথায় যাওয়া হবে?

অনিন্দিতা বলল, — আগে একবার বাড়ি যাব। সেখান থেকে স্টেশনে পৌঁছে দিবি?

রতন বলল, — হ্যাঁ, দেবো না কেন?

— তুই রিকশা চালাচ্ছিস?

— হ্যাঁ।

কেন, এ-প্রশ্ন করা যায় না। কতরকম বিপর্যয়ই তো মানুষের পরিবারে অথবা জীবনে ঘটে। জীবিকার প্রতিযোগিতাও কঠিন। তবু ভটচায্যি বাড়ির ছেলে রিকশাওয়ালা হয়ে গেছে, এটা সহজে মেনে নেওয়া যায় না।

— কতদিন রিকশা চালাচ্ছিস রে?

— তা হয়ে গেল বছর পাঁচেক।

— তার আগে কী করতি?

— দশকর্ম ভাণ্ডারে কাজ করতাম। দোকানটা উঠে গেল।

— দশকর্ম ভাণ্ডার। সেই ষষ্ঠীতলায়? দোকানটা আর নেই বুঝি? তোর বাবা পুরুত ছিলেন না? তুই পুজো-টুজো করতে শিখিসনি?

— না। আমার দিদি মুসলমান বিয়ে করেছে। আমাদের ফ্যামিলিতে আর কেউ পুজো করতে পারবেও না।

— ও, সে-রকম নিয়ম আছে বুঝি। এই রিকশাটা তোর নিজের?

— এখনো নিজের না। ব্যাঙ্কের টাকায় কেনা।

রেলগেটে থেমে গেল রিকশা।

রতন আর একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। দু-জনে চোখাচোখি হল কয়েক পলকের জন্য। একটি এগারো বছরের মেয়ে দেখছে একটি তেরো বছরের কিশোরকে। স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে।

ওদের মনের মধ্যে শুধু সেদিনকার স্মৃতিকথা। অথচ এখনকার বাস্তব অন্যরকম।

অনিন্দিতা একটু হাসল।

এই নস্টালজিয়া ট্রেনে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে যাবে। এই রতনের সঙ্গে তেমন কিছু ভাবও ছিল না। গুন্ডাদের মতন স্বভাব ছিল ওর, কয়েকবার অনিকে মেরেওছে। ঠাকুর ভাসানের সময় ওরা অনেকে গিয়ে ডাকের সাজ খুলে নিয়ে আসত, অসুরের হাতের টিনের তলোয়ার, কার্তিকের পেছনের ময়ূরের পালক। রতন আবার সে-সব কেড়ে নিত অন্যদের কাছ থেকে।

শুধু একটা দিনের কথা অনিন্দিতার বিশেষভাবে মনে আছে। সে যখন এখান থেকে একেবারে চলে যায়, তার দু-তিন মাস আগের ব্যাপার।

ঘাট থেকে খানিকটা দূরে থেমে ছিল একটা লঞ্চ। সারাদিন। সাঁতার কাটতে আসা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছিল, কে আগে লঞ্চটা ছুঁয়ে আবার ফিরে আসতে পারে। শুধু একবার নয়। পাঁচবার।

অনিকে হারানো শক্ত, তার প্রধান প্রতিযোগী এই রতন।

প্রথমবার অন্যদের পেছনে ফেলে অনি আর রতন প্রায় পাশাপাশি যাচ্ছে। অনিই আগে পৌঁছে যাবে। অনির একটা সুবিধে ছিল, সে ডুবসাঁতারটা অন্যদের থেকে ভালো পারে। শেষের দিকটায় সে ডুবসাঁতার দিয়ে দ্রুত পৌঁছে যায়। অনি ডুব দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রতনও। দু-জনের মধ্যে সামান্য ব্যবধান। জলের মধ্যেই অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে লঞ্চের গা। ছুঁয়ে দিয়েই অনি ভুস করে মাথা তুলবে।

ঠিক তখনই রতন একেবারে কাছ ঘেঁষে এসে অনির বুক ছুঁয়ে দিল। সেই বুকে সদ্য কিশোরীর স্তনোদ্গম। রতন শুধু ছুঁয়েই দিল না, ডলে দিল বেশ জোরে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল অনি, তারপর সাঁতার বন্ধ করে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিল রতনকে।

রতন সরে গেল এবং সেবারে প্রথম হল।

অনি যদি রতনের এই অসভ্যতার কথা বলে দিত অন্যদের, তা হলে সে মার খেয়ে ছাতু হত। বিশেষত সে-সময় ক্যাপটেন হরিদা নামে এক ভদ্রলোক প্রায়ই ছোটো ছেলেমেয়েদের সাঁতারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ঘাটে আসতেন। তিনিই কমপিটিশনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ক্যাপ্টেন হরিদা হয়তো রতনকে আর কখনো ঘাটে আসতে দিতেনই না।

কিন্তু অনি কারুকে কিছু বলেনি। নালিশ করে তো ছিঁচকাঁদুনে মেয়েরা। সে ওসবের ধার ধারে না। সে পাড়ে উঠে শুধু রতনের দিকে রক্তচোখে তাকিয়েছিল। পরে সে কোনো-না-কোনোভাবে রতনের ওপর শোধ নিতই। এই ধরনের ব্যাপারকে যে অসভ্যতা বলে, সে-জ্ঞান ততদিনে হয়েছে অনির।

শোধ নেওয়া আর হয়নি। কয়েকদিন রতন তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিল। তারপরই তো অনিদের এ-অঞ্চল ছেড়েই চলে যেতে হল।

কিন্তু সে-ঘটনা অনি ভুলবে কী করে? মেয়েদের শরীরে প্রথম কোনো পুরুষের স্পর্শের দিনটার কথা কোনো মেয়েই সারাজীবনেও ভোলে না। ছেলেরাও কী মনে রাখে? সেইজন্যই কী রিকশাচালক রতন বহুবছর আগেকার সেই স্মৃতিতে অপরাধবোধে প্রথমে মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল?

সেইদিন ওই কাণ্ডটা করে রতন তাকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছিল বলে খুবই রাগ হয়েছিল অনির। কিন্তু পরে সে অনিন্দিতা হবার পর বুঝতে পেরেছিল, বুকে সেই প্রথম পরপুরুষের স্পর্শে একরকম মাদকতাও ছিল। পরে অন্য কেউ যখন তার স্তন ছোঁয়ার অধিকার পায়, তখনো অনিন্দিতার মনে পড়ত সেই প্রথম মাদকতার কথা।

এ এমনই এক ব্যাপার, যা এতদিন পরে দেখা হলেও উল্লেখ করা যায় না।

একটা মালগাড়ি চলে যাবার পর গেট খুলে গেল।

বাস, ট্রাক, রিকশা, ভ্যানগাড়ির ভ্যাঁ-ভোঁ, প্যাঁ-পোঁতে কান পাতা দায়। লাইনের ওপর দিয়ে যেতে এখন একটু ভয় ভয় করল অনিন্দিতার। রিকশাটা এমন লাফাচ্ছে, উলটে যাবে না তো? একজন অধ্যাপিকার এরকম মনে হতেই তো পারে। কিশোরী, ডানপিটে অনি ট্রেন আসতে দেখেও বিপজ্জনকভাবে এঁকেবেঁকে এই জায়গাটা দৌড়ে পার হয়ে যেত।

অনিন্দিতা জিজ্ঞেস করল, — তুই কোথায় এখন থাকিস রে রতন? সেই একই বাড়িতে?

রতন বলল, — সে-বাড়ি তো নেই। ভেঙে রাস্তা বেরিয়েছে, চিনিকলের দিকে গেছে।

— চিনিকল হয়েছে বুঝি? এখন কোথায় থাকিস তা হলে? কোন পাড়ায়?

— জুটমিলের পাশে।

— নিজের বাড়ি করেছিস?

— নিজের বাড়ি না ছাই। আমার বাপ প্রচুর ধার করে গিয়েছিল। ঘটি-বাটিও চাটি হয়ে গেছে। এখন থাকি বউয়ের বাবার সঙ্গে।

— বিয়ে করেছিস? অবশ্য তা তো হবেই। আমারও বিয়ে হয়েছে রে রতন। তোর ছেলেমেয়ে?

— দুটো। মেয়ে বড়ো, ছেলেটা দু-বছর সবেমাত্র।

— আমার এখনো..... তুই একদিন আসবি আমার বাড়িতে?

— নাঃ! আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, একদিনও ছুটি নেই। আমি কলকেতায় যাই না। ভালো লাগে না।

ভালো লাগার মতন কী-ই বা আছে।

একটুক্ষণ চুপ করে রইল অনিন্দিতা।

ভুরু কুঁচকে সে ভাবল, ঠিক মতন বিচার করলে, রতনই তো তার প্রথম প্রেমিক। বাল্য প্রেমিকরা তো এরকমই হয়। ভাবালুতা ভরা কথা-টথা না বলে প্রথমেই গায়ে হাত দেয়। শরীর থেকে হৃদয়ের দিকে যাত্রা।

কৈশোর ছাড়াবার পরই সত্যিকারের প্রেমের উপলব্ধি হয়। আজ শরীরটাকে মনে হয় লজ্জার বিষয়। হৃদয়ের মিল খোঁজাটাই প্রধান হয়ে পড়ে। পরস্পরের প্রতি দয়াভিক্ষা। এমনকী আত্মহত্যাতেও প্রেমের সার্থকতা।

যাক গে, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তবে, রতন রিকশা চালিয়ে তাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, সে ট্রেনে চাপবে, এটা যেন ঠিক নয়।

অনিন্দিতা বলল, — রতন, কী মজার ব্যাপার, আমি সেই অনি, আর তুই আমাকে রিকশা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস, এটা কেমন যেন, কীরকম অদ্ভুত না? রতন, আমার খুব তাড়া নেই, তুই

আমাকে একবার তোর বাড়িতে নিয়ে যাবি না? তোর বউকে দেখব না? অবশ্য, এখন যদি তোর রোজগারের সময় হয় .....

রতন বলল, — একটার সময় বাড়ি যাই খেতে। আগে একবার জয়ানন্দ প্রাইমারি ইস্কুলের দুটো মেয়েকে তুলে নিতে হয়।

অনিন্দিতা বলল, — একটা বাজতে পঁয়তিরিশ মিনিট। তুই আমাকে তোর বাড়িতে নিয়ে চল্, তারপর ডিউটি সেরে ফিরে আয়। এতে কোনো অসুবিধা আছে?

রতন বলল, — না। আমার বউ কী কথা বলবে? সে তো লেখাপড়া তেমন শেখেনি!

অনিন্দিতা বলল, — সবসময়ই তো লেখাপড়া জানা মানুষদের মধ্যে থাকি। আমার ঠাকুমা কী লেখাপড়া জানতেন? অথচ কী সুন্দর কথা বলতেন!

জুটমিলের পাশে অ্যাসবেস্টাসের চালের সারি সারি কোয়ার্টার। জুটমিল অনেকদিন বন্ধ। সেখানকারই এক বেকার শ্রমিক রতনের শ্বশুর।

রতনের স্ত্রী নাম শোভা। সে তো অনি কিংবা অনিন্দিতা বলে কারুকে আগে দেখেনি। এরকম একজন উঁচু মহলের মহিলাকে সহসা ভেতরে আসতে দেখে সে বেশ সন্ত্রস্ত। তবে, এইরকম সাজপোশাক করা কিছু কিছু শখের সমাজসেবিকাও দেখা যায় মাঝে মাঝে।

রতন তার স্ত্রীর কাছে অনিন্দিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই আবার বেরিয়ে গেল কাজে।

আধ-মাথা ঘোমটা দেওয়া শোভা অনিন্দিতার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই সে বলল, — থাক, থাক।

চেয়ার নেই। একটা তক্তপোশের ওপরেই বসতে হল অনিন্দিতাকে। বাইরে চটি খুলে রাখতে ভুলে গেছে।

রতন রিকশা চালালেও তার মেয়েকে স্কুলে পাঠায়। ছেলেটি মায়ের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে একটা আঙুল।

শিক্ষিত, উঁচু সমাজের অভ্যেসে অনিন্দিতা বলল, — অ্যাই, মুখে আঙুল দেয় না। ওতে পেটের অসুখ হয়। কী নাম তোমার। কাছে এসো।

তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনিন্দিতা ভাবল,—এর জন্য চকলেট কিংবা লজেন্সের পয়সা দেওয়া কী উচিত? বড়োলোকি মনে হবে না তো?

বউটি বেশ গোলগাল, ঠান্ডা মতন। কপালে বড়ো সিঁদুরের টিপ, হাতে লাল রুলি। ফ্যালফ্যাল করে দেখছে অনিন্দিতাকে।

অনিন্দিতা জিজ্ঞেস করল, — তোমার বাবা-মা এখানেই থাকেন?

— মা নেই। বাবা। আমাদের বাড়ি ছিল বনগাঁয়।

— ও, বনগাঁয়? সেখানে যাও মাঝে মাঝে?

— না, যাওয়া হয় না। কেউ নাই।

এসব একেবারেই অবান্তর, তুচ্ছ কথা। কিন্তু একেবারে তো চুপ করে বসে থাকা যায় না। সে ভেবেছিল, রতনের বউয়ের সঙ্গে ভাব করবে। কিন্তু তা সহজ নয়। তফাতটা বড্ড বেশি।

অনিন্দিতা চাইছে মাঝে মাঝে অনি হয়ে যেতে। পারছে না। দু-এক পলকের জন্য নিজেকে দেখছে গঙ্গায় সাঁতার দিতে, আবার সে ফিরে আসছে অনিন্দিতায়। আর বেশিক্ষণ দেরি করা

যাবে না। এখন রতন ফিরে এলেই হয়। এখান থেকে বেরিয়ে সে অন্য রিকশা নেবে। পরের ট্রেন ক-টায়?

অনিন্দিতার স্বামী সুপ্রকাশ দিল্লি গেছে। আজই তার ফেরার কথা। প্রায়ই তাকে অফিসের কাজে বাইরের নানা শহরে যেতে হয়। দিল্লি থেকে সে একবারও ফোন করেনি, অনিন্দিতাও তাকে জানায়নি এখানে আসার কথা। বাড়ি ফিরে এসে সুপ্রকাশ অনিন্দিতাকে না দেখতে পেলে কিছুই ভাববে না। সেসব দিন আর নেই।

এখন দু-জনেই খুব ঠান্ডা মাথায় বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়ে আলোচনা করে। ঝগড়াঝাঁটির প্রশ্ন নেই, সভ্য সমাজে মিউচুয়াল ডিভোর্সই বাঞ্ছনীয়। এক বিছানায় শোওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, যদিও একই ফ্ল্যাটে থাকছে দু-জনে। সুপ্রকাশের অফিসের পার্টিতে এখনো দু-জনে একসঙ্গে যায়। দিল্লিতে সুপ্রকাশের এক বান্ধবীর কথা তার কানে তুলে দিয়েছে কয়েকজন শুভার্থী, কিন্তু অনিন্দিতা সে-কথা একবারও উল্লেখ করেনি স্বামীর কাছে। ঈর্ষা কিংবা নৈতিকতার মতন তুচ্ছ কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে সাধারণ মানুষেরা, অনিন্দিতাদের সমাজে সে কারণ হতে হবে আরো অনেক গভীর। মনের অমিল।

বাড়ি বিক্রি না হলে, অনিরা এখানেই থেকে যেত? দুরন্তপনা কী কমত অনির। পড়াশুনোয় মন আসত? জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো বোনদের মধ্যে একজনমাত্র কলেজ পর্যন্ত পৌঁছেছে। বিয়ের পর সে চলে গেছে পাটনায়। অনির কী হত? লেখাপড়া না শিখলে তারও বিয়ে হত ..... এই রতনেরই মতন কারুর সঙ্গে! হয়তো রতনের থেকে তার স্বামীর অবস্থা আর একটু ভালো হত। অনির বদলে একসময় সে অনিন্দিতা হত বটে, কিন্তু সে কোন অনিন্দিতা?

কিংবা তার প্রথম প্রেমিক, গুন্ডামতন রতনটাও যদি তাকে ফুসলে বাড়ির বার করে আনত? যে-রকম অবাধ্য স্বভাব ছিল অনির, বাবা-মাকে অগ্রাহ্য করে, প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই হয়তো তেমন একটা ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার ঝুঁকি নিয়ে ফেলত অনি। কেমন হত সে-জীবন?

শোভার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে জল এসে গেল তার। এ-চোখের জলে অনি, অন্য একটা জীবনের জন্য হাহাকার টের পেল বুকের মধ্যে।

একটু পরেই সে আবার হয়ে গেল অনিন্দিতা। পাখা নেই, এ-ঘরে আর বসে থাকা যাচ্ছে না। হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে তক্তপোশটার ওপরে রেখে বলল,
— ছেলেটার জন্য কিছু কিনে-টিনে দিয়ো।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—রতন দেরি করছে। আমি এবার যাই!

বাইরের সিঁড়িতে পা দিয়ে তার মনে পড়ে গেল, লেডিজ ক্লাবের কিটি পার্টি আছে চারটের সময়। তাকে তো ফিরতেই হবে আগে আগে।

Price : Rs. 60
Vol. : 27 No. : 3

BIVAV
July 2006 - September 2006
Special Autumn Issue
ISSN 0970-1885

Reg. No. : 30017/76
98th Issue

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল

(একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা

- পুরোনো কলকাতার সচিত্র ইতিবৃত্ত
- ইউরোপের অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পীদের পেইন্টিং ও জলরঙের দুর্লভ কাজ
- উড ক্রাফট ও লিথোগ্রাফ
- ভাস্কর্য
- অস্ত্রশস্ত্র ও ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্র সামগ্রী
- পাণ্ডুলিপি, সচিত্র প্রতিলিপি, বই,দলিল, মানচিত্র, মুদ্রা ও মেডেল
- ডাকটিকিট
- কালীঘাটের পট
- আধুনিক ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন

পার্সিয়ান পাণ্ডুলিপি

- সচিত্র পার্সিয়ান পাণ্ডুলিপি
- আবুল ফজলকৃত 'নল দময়ন্তী' উপাখ্যানের সচিত্র পার্সিয়ান অনুবাদ
- দারাশুকো কৃত অ্যারিস্টটলের অনুবাদ

ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন

- টিপু সুলতানের নোটবই
- টিপু সুলতানের তরবারিসহ মোগলযুগের সম্রাটদের ব্যবহৃত নানা সামগ্রী

এ ছাড়া ঐতিহাসিক অজস্র নিদর্শন রয়েছে বিভিন্ন গ্যালারিতে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রাঙ্গণে ধ্বনি ও আলোকসহ প্রদর্শনী
কলকাতার কাহিনী প্রদর্শনীর সময় অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬.১৫টা থেকে ৭টা (বাংলা)। ৭.১৫টা থেকে ৮টা (ইংরাজী)।
মার্চ থেকে জুন সন্ধ্যা ৬.৪৫ টা থেকে ৭.৩০টা (বাংলা) ৭.৪৫টা থেকে ৮.৩০টা (ইংরাজী)।

১, কুইন্স ওয়ে, কলকাতা - ৭০০ ০৭১, ফোন ঃ ২২২৩-১৮৯০-৯১/৫১৪২
ফ্যাক্স ঃ ৯১-৩৩-২২২৩-৫১৪২
E-mail : victomem@cal2.vsnl.net.in
Website : www.victoriamemorial-cal.org